## পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২ প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—মদন ধর, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪ প্রকাশক— ঐ, ঐ

৫ সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

৬ পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা—

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু (মৃত), ৭৩ এল মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, (মৃত) ১/১/১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায় (মৃত) ফ্ল্যাট ৮, ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত), ৪৮৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯/এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২ বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুহেলিকা' ৫২, সরকার লেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত) পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯/১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত), ৫৯বি গড়চা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা ২০। ২২। শান্তা বসু, ১৩ এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন্দ্র রায়, ১০/৭

নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রিট কলকাতা-১৩। ২৬। ধ্রুবেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লি। ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, ২৪, গল্ফ রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বসু (মৃত), ২০০এন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গড়চা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২০৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা ৪০। ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি. সি. রোড জলপাইগুড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত), ১৯। ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯। ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, সি, ২৬, গ্রেহাম্স লেন, কলকাতা ৪০। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ভবন, নয়াদিল্লি। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, (মৃত) ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, (মৃত), ১।এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১।১, ব্লক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট-বি সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৬। বিশ্ব মুন্সী, ১।৩, গড়চা ফার্স্ট লেন কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১৬, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত (মৃত), ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৯। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২।

আমি রঞ্জন ধর এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

স্বাঃ রঞ্জন ধর

৩০. ৩. ৯০

# পরিচয়

৬২ বর্ষ ৬-৮ সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ ১৯৯৩, মাঘ—চৈত্র ১৩৯৯

প্রবন্ধ :



আলোচনা :



গল্প :



কবিতা :



সাক্ষাৎকার :

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য শুভ বসু

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৮-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# মৌলবাদ

রমাকান্ত চক্রবর্তী

## এক

"Fundamentalism" শব্দটির বাংলা তৎসম প্রতিশব্দ "মৌলবাদ"। ইংরাজি শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ শতকের প্রটেস্টান্ট ধর্মান্দোলনের একটি ধারা, যেখানে শাস্ত্রের মৌলিক যাথার্থ্য, যিশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের তত্ত্ব, কুমারী জননীর গর্ভে তাঁর জন্মলাভের তত্ত্ব, খ্রিস্টের শারীরিক পুনরুত্থানের তত্ত্ব, এবং তাঁর মাধ্যমে ঐশ্বরিক সাযুজ্যলাভের তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে।[১] এখন সাধারণ ভাবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদ সমার্থক। প্রচলিত ধর্মের মূলানুসন্ধানও এক ধরনের মৌলবাদ, যা ইরাস্‌মাস্‌-এর, কিংবা রামমোহন রায়ের রচনাবলীতে পরিস্ফুট। এই মৌলবাদ সাধারণতঃ ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিত রচনা করে। ইসলামে ওয়াহাবী আন্দোলনেও ইসলামের মূলানুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাম্প্রদায়িক মৌলবাদে তত্ত্বানুসন্ধান গৌণ, সাম্প্রদায়িক বরিষ্ঠতায় অন্ধবিশ্বাস মুখ্য। অন্ধ বিশ্বাসে যুক্তিতর্কের, ইতিহাসের স্থান নেই। সেখানে উদারতা অপ্রাসঙ্গিক।

প্রকৃতির বিচারে ধর্মবিশ্বাস মাত্রই মৌলিক। ধর্মীয় মৌলিকতার ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক মাত্রা আছে। সে কারণে ধর্মীয় বিভিন্নতা সম্ভাব্য। হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, কারণ এসব ধর্মের শাস্ত্র বিধানাবলী বিভিন্ন। ধর্মে ঈশ্বর কোথাও সাকার, কোথাও নিরাকার। হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট হ'ল এই যে, এই ধর্মে ঈশ্বর একই সময়ে সাকার এবং

নিরাকার, সগুণ এবং নির্গুণ। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ধ্যানধারণাও মৌলবাদী হয়। শাস্ত্রের বিভিন্ন ভাষ্য মৌলবাদকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের সভ্যতা কালক্রমে যতোই জটিল হয়, ততোই ধর্মবিশ্বাস পল্লবিত হয় এবং ততোই নানা ধরণের মৌলবাদী সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়।

বিচ্ছিন্ন মানুষ মানসিক শান্তির জন্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক গুরুর পদকমলে আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণে ধর্মীয় মৌলবাদ পুষ্ট হয়, কারণ তাতে বুদ্ধি এবং যুক্তি থাকে না। রামঠাকুর এই আত্মসমর্পণকে বলছেন পাতিব্রত্য; অর্থাৎ গুরু স্ত্রীপুরুষ শিশু শিক্ষা নির্বিশেষে সকলেরই 'পতি'। হয়তো এইরূপ 'পাতিব্রত্য' কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থার ব্যঞ্জনা বহন করে। কিন্তু কথাটির মধ্যে যে মধ্যকালীন সামাজিক মানসিকতা প্রকাশ পায়, তাই সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের ভিত্তি। গুরুবাদ মৌলবাদ ভিন্ন নয়। আবার গুরুরও গুরু আছেন; গুরু একটি বিশিষ্ট পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। সেই ঐতিহ্য, সেই পারম্পরীণ ধর্মমতই মৌলবাদ। খ্রিষ্টান ধর্মে এবং ইসলাম ধর্মে যথাক্রমে বাইবেল এবং কোরান দুইটি বিশিষ্ট পারম্পরীণ ধর্মমতের মৌল গ্রন্থ। খ্রীষ্টান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম যথাক্রমে বাইবেলে এবং কোরানে সুস্পষ্ট ভাবে গ্রথিত এবং বিবৃত হয়ে থাকার জন্য, এই দুইটি ধর্ম প্রশংসনীয়ভাবে সুসংগঠিত, সংহত। এই রূপ ধর্মে গুরুদের এবং পুরোহিতদের পরম্পরা সুনির্দিষ্ট, সুনিবদ্ধ। অতএব এইরূপ ধর্মবিশ্বাসে মৌলবাদ সীমাহীনভাবে পল্লবিত হতে পারে না; এখানে মৌল ধর্মগ্রন্থই 'প্রমাণ', এবং প্রধান। গুরুর, অথবা প্রধান পুরোহিতের প্রমাণ-ব্যাখ্যা দুরতিক্রম্য, খ্রিস্টান ধর্মে, ইসলামে যে মৌলবাদ দেখি, তার উৎস যথাক্রমে বাইবেল এবং কোরান, এবং বাইবেল ও কোরানের গুরুদত্ত, সম্প্রদত্ত, পুরোহিতদত্ত ভাষ্য। এই ভাষ্য অনুসারেই ইওরোপে তথাকথিত ডাইনিদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে; এই ভাষ্য অনুসারেই কিছুকাল আগে বাংলা দেশে জীবন্ত তরুণীকে মাটিতে পুতে রেখে তার মাথায় ইঁট ছোড়া হয়েছে।

এক সময়ে খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলাম সাম্রাজ্যস্থাপনের এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলপ্রসূ ভাবাদর্শরূপে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত হয়েছিল। খ্রিস্টিয় এবং ইসলামী মৌলবাদে যেহেতু সমন্বয়ের মানসিকতা প্রথমাবধি প্রবল থাকে, তাই মৌলবাদের ধ্বজা তুলে, তারই নামে সাম্রাজ্যবিস্তার করা হয়, এবং ধর্মান্তরিত করা হয়। 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য,' 'খ্রিস্টান রাজ্য,' 'ইসলাম

নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র,' প্রাচীনতর মিশরীয় 'সূর্যোপাসকদের রাষ্ট্র', 'ইহুদী রাষ্ট্র' প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভিত্তি মৌলবাদ। ধর্মের নামে আসে ঐক্য, আসে রাজনৈতিক ক্ষমতা, আসে দুর্বল বর্গসমূহের উপরে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব। ধর্মের মৌল বিধানের প্রসঙ্গ তুলে মানুষের কণ্ঠরোধ করে রাখার অজস্র ঘটনা আছে। আধুনিক ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদেরও একটি খ্রিস্টান মাত্রা ছিল; সেই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থিত খ্রিস্টান পুরোহিতগণ সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশগুলোতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের সুযোগ পেয়েছেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল্—কথিত 'সিভিল্ সোসাইটি', 'নাগরিক সমাজ' সম্ভবতঃ আভ্যন্তর শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু তাতেও ধর্মের, এবং ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব হ্রাস পেল কী না, এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

'সভ্য' ধর্মবিশ্বাসে কালক্রমে বিশেষ আর্থ-সামাজিক বর্গের আধিবিদ্যক চিন্তাধারা মৌলতা অর্জন করে; ক্রমশঃ তার সঙ্গে সংযুক্ত হয় সামাজিক ব্যবহারতত্ত্ব এবং ধর্মীয় কৃত্য। কখনও বা প্রতিস্পর্ধী আধ্যাত্মিকতার কিংবা অধিবিদ্যার সংপ্রশ্নে ধর্মীয় মৌলতার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। কিন্তু জনজাতীয় অথবা উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাস, কৌম-ভিত্তিক ধর্ম, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার উর্ধে উঠতে পারে না। তার সঙ্গে জনজাতীয় উৎপাদন পদ্ধতির, বাস্তুসংস্থানের, কৌম ঐতিহ্যের, এবং ব্যক্তি জীবনে অনুভূত প্রয়োজন সমূহের সুনিবিড় সংযোগ থাকে। 'সভ্য' ধর্ম প্রথমে এই সীমাবদ্ধ কৌম ধর্মকে দুর্বল করে, এবং ক্রমশঃ উন্মূলিত করে। কোথাও কোথাও (যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে) এইরূপ প্রক্রিয়াতে সাংস্কৃতিক উপযোজনও দেখা যায়, অর্থাৎ 'সভ্য' ধর্মেও কোন কোন গ্রাহ্য জনজাতীয়, অথবা 'Pagan' উপাদান গ্রহণ করা হয়। উপযোজন দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকলেও 'সভ্য' ধর্মের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য কালক্রমে প্রস্তরীভূত অবস্থায় একটি মৌলরূপ ধারণ করে।

প্রস্তরীভূত মৌলবাদে ভূত বর্তমান ভবিষ্য একসূত্রে গ্রথিত। তাতে কালের মাত্রা ঐতিহ্য, ইতিহাস নয়। কিন্তু সে কারণেই তাতে ভূতকালের প্রাধান্য থাকে। মৌলবাদে বর্তমান এবং ভবিষ্য অতীত দ্বারা সর্বদা অন্বিত। আধুনিক যুগ দ্রুত পরিবর্তনের যুগ। মৌলবাদী চিন্তায় পরিবর্তনের কোন তাৎপর্য নেই। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে, বাস্তব অবস্থার অভিঘাতে, জীবনসংগ্রামে বিপর্যয়ের মুহূর্তে দুর্বল মানুষের কাছে 'গৌরবোজ্জ্বল' অতীতে

উদ্ভাবিত এবং প্রস্তরীভূত ধর্মবিশ্বাসের হাতছানি দুরতিক্রমা হয়ে ওঠে। ধর্মের সরণি দিয়ে মৌলবাদী যেমন নিজে মূলে ফিরে যায়, তেমনি অন্যদেরও তাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কার্ল মার্কস ধর্মে নির্যাতিতের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেয়েছিলেন; হয়তো ধর্মীয় মৌলবাদেও তা শ্রবণীয়। পৃথিবীতে ইউটোপিয়া স্থাপনের চিন্তাও ধর্মীয় মৌলবাদের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

যখন এক 'সত্য' মৌলবাদ অপর 'সত্য' মৌলবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন নররক্তস্রোত প্রবাহিত হয়। খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যযুগীয় "ধর্মযুদ্ধ" দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মৌলবাদের দুর্নিবার পরিণাম। মৌলবাদ যেখানে দাঙ্গাও সেখানে। একই ধর্মের একাধিক মৌলবাদী তন্ত্র থাকতে পারে। তাও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণ হয়। খ্রিস্টান ধর্মের, ইসলামের এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে এ ধরণের সংঘর্ষের বহু বিবরণ আছে।

সব সভ্য ধর্মে নীতিবিষয়ক উপদেশনা আছে। তাতে সুনীতির, দুর্নীতির, পাপের, পুণ্যের বিশদ বিবরণ থাকে, দৃষ্টান্ত থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্ম এবং সভ্যতা সমার্থক। সব সভ্য ধর্মে ঈশ্বর সভ্যতার প্রতীক। কিন্তু ধর্মের মৌলবাদী তন্ত্রে সুনীতি বিষয়ক উপদেশনা দেখা যায় না। সেখানে মৌলবাদে বিশ্বাসী মানুষই মানুষ; অবিশ্বাসীরা অমানুষ, অর্ধমানুষ। খ্রিস্টান ধর্মে Pagan, Infidel, ইসলাম ধর্মে 'কাফের,' হিন্দুধর্মে 'পাষণ্ড, নাস্তিক', বৌদ্ধ ধর্মে 'মার' অথবা 'মার'-প্রভাবিত মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য নয়; তারা আলাদা, এবং শত্রু। এইরূপ বিভাজনের ফলে সভ্য ধর্মের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং সেই দুর্বলতা দাঙ্গাহাঙ্গামাতে রূপান্তরিত হয়। অতএব মৌলবাদ সভ্যতার বিরোধী। মৌলবাদ দ্বারা মানব সভ্যতা কালে কালে ধর্ষিত হয়েছে, পীড়িত হয়েছে, ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। ঈশ্বরের বিপরীত হলেন শয়তান, ইবলিশ, দানব রাক্ষস, এবং মার। মৌলবাদে সর্বত্র বিধর্মী এবং নাস্তিকরা এঁদের অনুচর, এবং এই কারণে বধ্য, ধ্বংসনীয়। এই কারণেই মৌলবাদের সঙ্গে মৌলবাদের সংঘর্ষে অপরিমেয় নররক্তক্ষরণ হয়।

## দুই

পূর্বাকারে বিবৃত ধর্মীয় মৌলবাদের এসব লক্ষণ, অধুনা "হিন্দুত্ব" প্রচারে প্রকটিত হলেও, হিন্দুধর্মে কিন্তু তা বিশেষ ভাবে দেখা যায় নি। হিন্দু ধর্মের

সুদীর্ঘ ইতিহাসে "বাইবেল," "কোরান," "তালমুদ"-তুল্য কোন ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়নি। হিন্দু-ধর্মের ক্ষেত্রে মুশা, মুহম্মদ, বুদ্ধ, মহাবীর-তুল্য কোন 'প্রফেট্' অদ্যাবধি আবির্ভূত হননি। সে কারণে হিন্দু ধর্মের সুনির্দিষ্ট কোন একটি বিশেষ "শাস্ত্র" দেখা যায় না। সেখানে বেদ চারটি, মহাকাব্য দুটি, পুরাণ আঠারটি; সেখানে বহু উপনিষৎ, বহু শ্রৌতসূত্র, বহু গৃহ্যসূত্র, বহু ধর্মশাস্ত্র, বহু নীতিসার, বহু সংহিতা। অন্ততঃ এই কারণে 'মৌল হিন্দুত্ব', 'হিন্দু মৌলবাদ' অভাবনীয়। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত। চিন্তার প্রাতিস্বিকতা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য হিন্দুধর্মের প্রাণবস্তু; তার জন্যই হিন্দুধর্ম এখনও জীবনবান্। হিন্দুধর্ম যে মৌলবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তার দ্বিতীয় যুক্তি হিন্দুধর্ম বিশ্বাসে সংখ্যাতীত দেবদেবীর অস্তিত্ব। দেবদেবীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বহুরকমের ধর্মবিশ্বাস হিন্দুধর্মে স্থান পেয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক উইলিয়াম ক্রুক্ হিন্দুধর্মকে 'জনপ্রিয় মানব ধর্ম'-রূপে বিচার করেছিলেন।[২] এই বিষয় সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ।[৩] তাঁর মতে হিন্দুধর্মের "নিগম" বৈদিক, কিন্তু "আগম" পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক। হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং ক্রিয়াকাণ্ডে নিগমাগমের সংমিশ্রণ সুস্পষ্ট। তাঁর মতে হিন্দুদের পূজাপদ্ধতি কোন প্রাচীন দ্রাবিড় ধর্ম থেকে ধার করা হয়েছে; এই মতের ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। প্রাগার্য এবং দ্রাবিড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে মান্যতা দেওয়ার পরে প্রাগার্য এবং দ্রাবিড় দেবদেবীরা হিন্দুধর্মে স্থান লাভ করলেন। এ ব্যাপারে দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি-কথিত "ব্রাহ্মণ্য উপযোজন পদ্ধতি" অনুসৃত হয়েছিল।[৪] এইরূপ উপযোজনের ফলে বৈদিক আর্যদের প্রধান দেবদেবী, যথা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সোম, উষ, পূষণ, অশ্বিদ্বয়, পর্জন্য ক্রমশঃ গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন। হিন্দুধর্মে প্রাধান্য অর্জন করলেন বিষ্ণু, শিব, উমা, গণেশ এবং সূর্য। এই দেবতাদের উপাসকগণ কালক্রমে "স্মার্ত পঞ্চোপাসক" রূপে পরিচিত হয়েছিলেন।[৫]

"ব্রাহ্মণ্য" উপযোজনের সামাজিক ভিত্তি ছিল বর্ণভেদ। চতুর্বর্ণ উপাসিত বিভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব যখন স্বীকার করা হ'ল, তখন চতুর্বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় আচার এবং কৃত্য স্বীকৃত হ'ল, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় আচার এবং কৃত্য হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত হ'ল। বর্ণভেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মভেদ অধুনা হিন্দুধর্মের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ঐতিহ্য রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।[৬]

হিন্দুধর্মে আর্য-অনার্য উপাদানের যে মিশ্রণ হয়েছে, এবং অদ্যাবধি যে মিশ্রণ হচ্ছে, তারফলেই হিন্দুধর্মের সহনশীলতার আদর্শ দেখা যায়।

তিন

অথচ, হিন্দুধর্মেও মৌলবাদী প্রবণতা ছিল। ঋগ্বেদে আর্যদের যুদ্ধের বিবরণ সমূহে ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনা অনুভব করা যায়। আর্যরা ভারতে এসে প্রচলিত ধর্মসমূহের ধ্বংস কামনা করেন। যে হিরণ্যগর্ভ দেবতা তাঁদের ঐতিহ্য অনুসারে সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাঁকে অবহেলা করে অন্য কোন দেবতাকে তাঁরা হবিঃ দিয়ে উপাসনা করতে চাননি।[৭]

ক্রমশঃ "বেদানুকূল" ব্রাহ্মণসমূহে, শ্রৌতগৃহ্যসূত্রাদিতে, একটি আর্য-বৈদিক বিধি পরিকল্পিত হ'ল। প্রধান উপনিষৎ সমূহে যখন কর্মকাণ্ডবিরোধী ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন বেদবাদীগণ তাও মেনে নিলেন, কারণ উপনিষদে স্পষ্টভাবে বৈদিক আর্যসামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা ছিল না।

সময়ের পরিবর্তনে সমাজের, রাষ্ট্রব্যবস্থার, এবং অর্থনীতির পরিবর্তন হ'ল। বর্ণপ্রথার মধ্যে নূতন নূতন পেশার এবং শ্রেণীর উৎপত্তি হয়; শ্রেণীর প্রাধান্যের এবং অপ্রাধান্যের বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈষয়িক প্রেক্ষিতের এই পরিবর্তন যে বৌদ্ধ, আজীবিক, জৈন শ্রমণ ধর্মের উদ্ভবের কারণ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৮] শ্রমণ ধর্ম বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করল, বর্ণপ্রথাকে অস্বীকার করল, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতাকে অগ্রাহ্য করল; সংস্কৃত ভাষার গুরুত্বকে মেনে নিতে পারল না। শ্রমণধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশে যে ধর্মসংকট দেখা গেল, তাতে নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, হেতুবাদী, সুখবাদী, সংশয়বাদী, দৃষ্টবাদী চার্বাকের সমর্থকদেরও ভূমিকা ছিল।[৯]

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থের মতে এই ধর্মসংকটকালে বেদের প্রামাণ্যতার তত্ত্ব প্রচারিত হ'তে থাকে।[*ক] "ব্যাসে আছে" বলা হ'তে থাকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে। জৈমিনীর পূর্বমীমাংসাতে বৈদিক লক্ষণান্বিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং মৌলত্ব সিদ্ধান্তিত হ'ল। সাংখ্য এবং বৈশেষিক প্রস্থানেও নাস্তিকতার, এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডবিরোধিতার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু চার্বাক দর্শনকে অবহেলা করা হলেও সুগভীর তাৎপর্যবহ সাংখ্য এবং বৈশেষিক মতকে ব্রাহ্মণদের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নি। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ—প্রকৃতি শৈবতান্ত্রিকতার প্রতীক হলেন। উদয়নাচার্য বৈশেষিক

দর্শনের সঙ্গে ন্যায়দর্শন মিশিয়ে শুধু যে মিশ্র ন্যায়বৈশেষিক দর্শন সৃষ্টি করলেন, তাই নয়, তার সঙ্গে পূর্বমীমাংসারও ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখালেন।[৯খ] পরে এমন ধারণার সৃষ্টি হ'ল যে, পূর্বমীমাংসার পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাকপন্থীগণ নিষ্প্রভ অবস্থায় দূরবর্তী স্থানে পলায়ন করলেন।[১০] প্রাচীন ভারতে "ফিউডাল" সমাজ, অর্থনীতি, এবং রাষ্ট্র যতোই দৃঢ়মূল হ'ল ততোই বেদবাদী ব্রাহ্মণদের, এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের, সামন্তদের বৈদিক মৌলবাদ প্রবল হয়ে উঠল।

অথচ দার্শনিক স্তরে বেদের প্রামাণ্যতা যজ্ঞধূমপূত শিষ্টবর্গীয় হিন্দুরা মেনে নিলেও, নিম্নবর্গীয় স্তরে বহুলীভূত লোকধর্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। বেদকে মাথায় রেখে ব্রাহ্মণেরাও সর্পপূজন, হনুমান পূজন, বৃক্ষ পূজন, যক্ষগন্ধর্ব পূজন, ভূমিপূজন এবং গোপূজন সমর্থন করেন। সাহিত্যিক প্রমাণে শ্রমণ ধর্মেও এসব লোকধর্মের মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। বোধিসত্ত্ব ষাঁড়, সাপ হয়েও জন্মগ্রহণ করেন। জৈন কথা সংগ্রহে বিবিধ লোকধর্মের বিবরণ আছে। পূর্বমীমাংসা দ্বারা এসব লোকবিশ্বাসকে উচ্চস্তরে স্থাপন করা যেত না; বেদবাদ্ ধর্মবিশ্বাস সেখানে আদৌ স্বীকৃতি লাভ করেনি। অথচ, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উপযোজনকেও নস্যাৎ করা অসম্ভব ছিল। উপযোজনা পৌরাণিক সাহিত্যেও গুরুত্বপূর্ণ।

মনে হয়, সর্বাত্মক উপযোজনের স্বার্থে উত্তরমীমাংসা রূপে, ঐতিহ্যসম্মত বিশ্বাস অনুসারে, ব্যাস-প্রণীত 'ব্রহ্মসূত্র' প্রচারিত হয়। বেদান্ত অর্থ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদের সার বস্তু বেদান্তে উপলভ্য। এই মত, অথবা এই বিশ্বাস বৈদান্তিক মত, বৈদান্তিক বিশ্বাস। কর্ম অর্থ কাম্য কর্ম; কাম্য কর্ম বৈদিক। কিন্তু বৈদিক কাম্য কর্মই একমাত্র কাম্য কর্ম ছিল না; বহু অবৈদিক কাম্য কর্ম ছিল। অতএব, জ্ঞানের প্রাধান্য বেদান্তে বিঘোষিত হ'ল। ভগবদ্গীতাও "বেদান্ত শব্দের গৌণ অর্থ।"[১০ক] বৈদান্তিক মতে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"কে এমন এক স্তরে নিয়ে আসা হ'ল, যেখানে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, কালাতীত, তুরীয়, অথচ সর্ববস্তুর এবং সর্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত বিরাট সত্তা। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী বিষ্ঠা এবং চন্দনের মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন না। তাঁর বিচারে জাতিবর্ণভেদ অর্থহীন, এমন কী পাপপুণ্যের বিচারও অর্থহীন। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য এইরূপ তত্ত্বের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সম্ভবতঃ এ কারণেই বেদান্তদর্শনের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছিলেন:[১১]

> ভারতের জাতীয় জীবনের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, বেদান্তই জাতীয় প্রাণের মূলাধার, বেদান্তই জাতির আত্মা। বেদান্তই জাতির জীবন···ভারতীয় ধর্ম বেদান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

বৈদান্তিক জ্ঞানের মহিমা যতোই না কেন কীর্তিত হোক, তার মধ্যেও মৌলবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আচার্য বাদরি থেকে বলদেব বিদ্যাভূষণ [খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতক]পর্যন্ত বহু দার্শনিক বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শৈব এবং বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বেদান্তের ব্যাখ্যা করলেন। বেদান্ত শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের ভাবাদর্শ হয়ে দাঁড়াল। দার্শনিক স্তরে বেদান্ত হয়ে উঠল পরিশোধিত মৌলবাদ। কিন্তু লোকধর্মের স্তরে, লোকবিশ্বাসে, তর্ককর্কশ বেদান্তের কোন তাৎপর্যই ছিল না। হিন্দু মৌলবাদ উচ্চ সামাজিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে, নিম্ন সামাজিক স্তরে পূর্বেও তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখনও তা নেই। উচ্চস্তরেও যে সর্বদা এবং সর্বত্র বেদান্ত পরিশীলিত হ'ত, তাও বলা যায় না। মধ্যযুগে বাঙলা দেশে সংস্কৃত বিদ্যায় নব্যন্যায়ের এবং স্মৃতির প্রাধান্য ছিল।

## চার

সকল 'বিশ্ব ধর্মে' সুনীতির এবং সদাচারের প্রসঙ্গ আছে। সুনীতির এবং সদাচারের ভিত্তি ছিল পাপপুণ্যের বিচার, মঙ্গলামঙ্গল বোধ। সভ্যতার সঙ্গে সুনীতির এবং সদাচারের সংযোগ ছিল; এসব নৈতিক ধ্যানধারণার সঙ্গে প্রচলিত আর্থসামাজিক অবস্থার সম্পর্কও সম্ভাব্য। মুহম্মদ আরবের উপজাতীয় জীবনধারাকে সংযত করতে চেয়েছিলেন, এবং তার জন্য কতগুলো সভ্য নৈতিক বিধি আরোপ করেছিলেন। তাঁরও আগে যীশুখ্রিষ্ট মানবিক মূল্যবোধ প্রচার করেন এবং 'পেগান' সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সভ্য ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিনের কনফুসিয়াস্ [আবির্ভাবকাল খ্রীস্টপূর্ব ৫৫১] 'প্রফেট' ছিলেন না। তবুও তাঁর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা চিন দেশের সভ্যতাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।[১২]

রাজা রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে[১৩] 'ধর্ম' শব্দের অর্থ করা হয়েছে ন্যায়, স্বভাব, আচার, অহিংসা, প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, স্মরণ, যাগ, ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, শৌচ, শান্তি পূণ্য, ক্ষমা, ধৃতি। এইরূপ ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কোন বর্ণভেদ তত্ত্ব উত্থাপিত

হয়নি। অবশ্য প্রাচীন এবং মধ্যকালীন ভারতে, এবং আধুনিক কালে এসব বিশুদ্ধ নীতি 'ধর্ম'-রূপে কতোটা গ্রাহ্য এবং পালিত হয়েছে, সে প্রশ্ন থেকে যায়। সুনীতি এবং সদাচার বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও কথিত হয়েছে। কিন্তু সুনীতির উপদেশনা কখনও মৌলধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের একাধিক স্তরে এসব নীতি পালিত হয়নি। মুহম্মদের এবং খ্রিস্টের উপদেশ মুসলমানগণ এবং খ্রিস্টানগণ সর্বদা মেনে চলেননি। সত্য নীতির এবং সদাচারের প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও কেবল তার প্রচারের এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কোন 'মৌল' ধর্মীয় আন্দোলন ভারতে কদাচিৎ হয়েছে। বুদ্ধ যে উপদেশ দিলেন, বজ্রযানে, সহজযানে তা লঙ্ঘন করাই 'কৃত্য' রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী সমূহে প্রধান দেবতারা সুনীতি বিরুদ্ধ কর্ম করেছেন। মুহম্মদ-প্রবর্তিত ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ—বিষয়ক ঘটনার প্রেক্ষিতেই আবদুল ওআহাব ওআহাবী আন্দোলন শুরু করেছেন। যাকে 'খ্রিস্টান'-সভ্যতা বলা হয়, তাতেও বহুবিধ দুর্নীতি ছিল।

একারণেই বলতে হয় সভ্যতার যে সব উপাদান ধর্মে ছিল, তাই যখন কোন কালে মানা হয়নি, তখন আর 'ধর্ম ধর্ম' বলে উন্মত্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে কী। ধর্মীয় জীবনে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা নগন্য, এবং তাঁদের প্রভাবও তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। লোকে মন্দিরে মসজিদে গির্জায় যায়, নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করে, এবং কর্মক্ষেত্রে এসে সাধারণতঃ ধর্মের কথা ভুলে যায়। কর্মক্ষেত্রে তাকে নাগরিক আইনকানুন মেনে চলতে হয়, ধর্মীয় বিধান সেখানে সর্বদা মানা যায় না। জীবন ধারণের নিয়ম এবং পদ্ধতি কোন কালেই ধর্মের নিয়মবিধির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মেলেনি। তাই মনে হয়, ধর্মের মৌলবাদী ভাষ্য কখন কখন জনপ্রিয় হলেও সেই জনপ্রিয়তা চিরস্থায়ী হয় না, হ'তে পারে না।

## পাঁচ

আজ ভারতে 'হিন্দু রাষ্ট্র' স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা এ তত্ত্বের প্রচারক তাঁরা কী একবারও ভাবেন, এককালে কেন হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজারা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেলেন। বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তাঁদের টেনে তুলেছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার চর্চায় অভিনিবিষ্ট পণ্ডিতগণ। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তাঁদের নাম, ধাম, এবং 'কাম' ক'জন জানত? প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেই কোন ধারণা

ছিল না। ঐতিহ্যবাহিত স্মৃতি, এবং ঐতিহ্যের আধার রামায়ন-মহাভারত এবং পুরাণ এই ছিল মধ্যকালীন ভারতীয় হিন্দুদের অস্ফুট ইতিহাস চিন্তার দুর্বল ভিত্তি। কেন এই বিস্মরণ? 'হিন্দুরাষ্ট্র' স্থাপনের পূর্বে এ প্রশ্ন ভাবা দরকার। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে উপযোজন থাকলেও, বর্ণজাতিভেদের ফলে বিভক্ত সমাজে কোন সংহতি ছিল না। বৌদ্ধ রাজাদের আমলেও ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় এবং সামাজিক আধিপত্য খর্বিত হয়নি। ধর্মশাস্ত্রে কোথাও সুস্পষ্ট সামাজিক সংহতির তত্ত্ব দেখা যায় না। 'মনুসংহিতা'য় এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণে প্রাথমিক উৎপাদকগণ জারজ সংকররূপে উল্লিখিত হয়েছেন।[১৪] ধর্মে-বর্ণ জাতিভেদ; ধর্মশাস্ত্রে তথৈবচ। রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার কখনও ভাল, কখন অতিশয় মন্দ। তা যে কী সাংঘাতিক, তা প্রাচীন ভারতের একমাত্র ঐতিহাসিক কল্হন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী'-তে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। আমরা আধুনিক হিন্দু মৌলবাদীদের 'রাজতরঙ্গিনী'র প্রাঞ্জল হিন্দী অনুবাদ পড়তে অনুরোধ করি।[১৫] সামরিক শক্তি সম্পন্ন স্বেচ্ছাচারী প্রাচীন ভারতে রাজারা শান্তি চাননি। তখন যে কতো যুদ্ধ হয়েছে, কতো মানুষ মরেছে, তার পূর্ণ হিসাব এখনও করা হয়নি। 'হিন্দু জঙ্গীবাদ' (Hindu Militarism) বস্তু সাঙ্ঘাতিক ছিল। রাজা রাজ্য জয় করতে বেরলেন। কোথাও তিনি জয়ী, কোথাও পরাজিত। তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে এসে হয় একটা যজ্ঞ করলেন, নয়তো ব্রাহ্মণদের ভূমিদান এবং ধেনুদান করলেন। তাতে লাভ হ'ল কার?

একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গৌরবোজ্জ্বল ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা তখন ছিল, ছিল উন্নত দর্শন, উন্নত সাহিত্য, উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই প্রশ্নাতীত গৌরবের চমৎকার বিবরণ রচনা করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ. এল. বেশাম্।[১৬] গৌরবের কথা আর অবিদিত নয়। স্বীকার করি, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে অস্বীকার করা মূর্খতা। এটাও স্বীকার করি যে, আধুনিক ভারত প্রাচীন ভারতের মতো গৌরবোজ্জ্বল নয়। তার তেমন খ্যাতি নেই। কিন্তু আধুনিক ভারতকে গৌরবোজ্জ্বল করার জন্য আমরা কিন্তু প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনতে চাই না। সময়কে কী ভাবে লঙ্ঘন করব? প্রত্নপ্রস্তর যুগে যূথবদ্ধ এবং গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ সুখী ছিল। তাদের সুখ এবং আনন্দ বিভিন্ন গুহা-চিত্রাবলীতে নানান রঙে, অসাধারণ শিল্পিতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সুখের লাগিয়া এ ঘর ভাঙিয়া তবে কী আমরা প্রত্নপ্রস্তর যুগে ফিরে যাব? আধুনিক ভারতকে,

আধুনিক যুগে, আধুনিক নির্মাণকর্মে গৌরবোজ্জ্বল করা কী একেবারেই অসম্ভব? বর্তমান থেকে অতীতে প্রত্যাবর্তনের যুক্তি পাগলের যুক্তি। বর্তমানে যে নিরর্থক, বহু কষ্ট করে অতীতে ফিরলেই সে সার্থক হবে? ব্যক্তি-গত কল্পনায় অতীতে ফেরা যায়; কিন্তু একটা বিশাল দেশকে, বিশাল রাষ্ট্রকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো শক্তিশালী যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

হিন্দু মৌলবাদীরা শ্রীরামের নামকে অতীতে প্রত্যাবর্তনের মন্ত্ররূপে ব্যবহার করছেন। রামচরিত্রনিবন্ধে আমাদের ভক্তি নেই। রামায়ণ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ 'এপিক্', যার প্রভাব কালাতীত। রামায়ণে অবশ্যই ভাল কথা আছে। কিন্তু তা তো আসলে একটি কাব্য। কোথাও কী একটি বিশিষ্ট কাব্যাদর্শ রাষ্ট্রাদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে? যাঁরা এখন শ্রীরামকেই ভারতের "জাতীয় নেতা" রূপে বিচার করেন, তাঁরা নিশ্চয় ধর্মপুত্ররূপে পরিচিত যুধিষ্ঠিরের কথা ভুলে যান। বীরত্বের বিচারে অর্জুনও নিতান্ত ফেলনা ছিলেন না; পাণিনির সময়ে বাসুদেব পূজনের সঙ্গে অর্জুনপূজনও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।[১৭] বাসুদেব কৃষ্ণ এখনও জনপ্রিয়। শ্রীরাম নিশ্চয় তাঁদের প্রতিনিধি নন। তাছাড়া শ্রীরাম সম্পর্কে প্রাচীন কালেও বিভিন্ন ভাবনা ছিল।[১৮] পরবর্তীকালে কৌল-তান্ত্রিকরা রামায়ণেও পঞ্চ মকারাত্মক কৌল-তান্ত্রিক উপাসনা দেখতে পেয়েছেন।[১৯]

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কেবল যোগান দেওয়াই বিধি, যাতে বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ রক্ষা করাই রাজার প্রধান সামাজিক কর্তব্য, সে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন জাতীয়তা, কোন জাতীয় ভাবধারা, কোন জাতীয় জীবন গড়ে উঠতে পারে না। তাতে রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন তাৎপর্য থাকে না, ঐতিহ্য এবং প্রথা দ্বারা আবদ্ধ সামাজিক জীবনই গুরুত্বপূর্ণ হয়। আজ যখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য অর্জন করেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে, তখন আর ঐতিহ্য এবং প্রথাদ্বারা আবদ্ধ সামাজিকতার দুর্লংঘ্য আদর্শ গ্রাহ্য হতে পারে না। বহু যুগ ধরে আমরা ধর্মশাস্ত্রকে মেনে চলেছি। যখন ভারতে ইসলামের অভিঘাত এসে পড়ে, তখনও ধর্মশাস্ত্রে একদিকে ক্রিয়াকাণ্ড সঙ্কলিত হয়, অন্য দিকে শুচি অশুচির প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে, জাতিভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। যখন হিন্দুদের বর্ণজাতি নির্বিশেষে সংহতি অথবা সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, তখনই স্মার্ত মৌলবাদ, সামাজিক ধর্মীয় মৌলবাদ, সর্বস্তরের হিন্দুদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। ইসলামের অভিঘাতেও সে মৌলবাদের বাঁধন

একটুও শিথিল হ'ল না। আমরা কোন যুক্তিতে শ্রীরামের নামাঙ্কিত এইরূপ মৌলবাদ এখন মেনে নেব ?

## ছয়

সব রকমের মৌলবাদে ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হয়। শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু শাস্ত্ররচনার কাল এবং এ কাল একই কাল নয়। বেদপ্রামাণ্যতার তত্ত্ব একটি বিশেষ কালে, বিশেষ প্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হয়; তাকে অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোরাণে পুরাণে বেদে বাইবেলে ত্রিপিটকে যে সব নির্দেশ আছে, যে সব বিধি আছে তা বিশেষ কালের সীমায় আবদ্ধ; ঐতিহাসিক বিচারে, যুক্তিতে শাস্ত্রের কোন কালাতীত গুণ অথবা প্রাজ্ঞতা দেখা যায় না বিশ্বাসে যে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, সে কৃষ্ণ যুক্তিতে, তর্কে উপলব্ধ হন না। কাজেই বিশ্বাস দ্বারা ইতিহাসের বিচার অম্বিত হ'লেও তা যুক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়না, এবং গ্রাহ্য হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যখন বৈষ্ণব পুরাণকেই প্রামাণ্য এবং প্রধান সূত্র বলে মনে করলেন, তখনই তাঁদের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক মতবাদ হয়ে উঠল।

আজ হিন্দু মৌলবাদীগণ আমাদের দেশের ইতিহাসকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে, বিকৃত করছেন। কাগজ দিয়ে বাঁধানো চটি চটি বই মথুরাতে, আগ্রাতে, ইলাহাবাদে, বারাণসীতে, দিল্লীতে বিক্রয় করা হচ্ছে।[20] দু'এক জায়গায় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[21] সুসংবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে 'হিন্দু' ইতিহাস রচিত হচ্ছে, প্রচারিত হচ্ছে। এই ইতিহাসের কতগুলো প্রধান তত্ত্ব এইরূপ :

১. ভারত আর্যদের আদি নিবাসস্থল ছিল। আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে আসেননি। হরপ্পা-সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতি এক এবং অভিন্ন।

২. রামায়ণ-মহাভারত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

৩. হিন্দুধর্ম আর্যধর্ম।

৪. প্রাচীনভারতে "হিন্দু সমাজ"-এর প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা প্রশ্নাতীত।

৫. প্রাচীন ভারতই জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে।

৬. মুসলমান-শাসকদের রাজত্বকালে হিন্দুদের অধিকার হরণ করা হয়; তখন ভারত পরাধীন ছিল।

৭. আকবর কিংবা টিপু সুলতানকে ভাল শাসক বলা হলেও আসলে তাঁরা খুব খারাপ লোক ছিলেন।

৮. বর্ণব্যবস্থায় সমস্ত হিন্দুকে হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়া হয়েছে; হিন্দু সমাজের বাইরে কোন হিন্দু নেই।

৯. ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস আসলে হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস। মুসলমানরা এই ইতিহাসে একটি "বৈদেশিক" উপাদান মাত্র।

১০. যাঁরা মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান নন, তাঁরাই হিন্দু।

আরও বহু তত্ত্বই আছে। সব তত্ত্ব এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই, তবে, হিন্দুমন্দিরকে বাবরি মসজিদে রূপান্তরিত করার তত্ত্ব, তাজমহলের এবং কুতুব মিনারের আভ্যন্তর হিন্দুত্বের তত্ত্ব প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

ধর্মবিশ্বাসের প্রাধান্য দেখাবার জন্য ইসলামের ও খ্রিস্টান ধর্মের সমর্থকগণও ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করেছেন। ইওরোপীয় বিজ্ঞানকে বহু শতাব্দ ধরে যাজকদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। পশ্চিম এশিয়াতে, মধ্য প্রাচ্যে ইওরোপীয় ঐতিহ্যের বিরোধিতা করার জন্য মারাত্মক হ'ত এবং এখনও হয়। আমাদের দেশে পূর্বে মৌলবাদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের মৌলবাদ প্রচারিত হওয়ার কৌশল অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখন সেই কৌশল মৌলবাদীগণ জানেন। সে কারণেই ভারত বিপন্ন। সূত্রাকারে উল্লিখিত প্রধান "ঐতিহাসিক" তত্ত্বাবলীর আলোচনাও এখানে সূত্রাকারেই কর্তব্য।

১. এককালে মাকস্ মুলার বেদবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরপ্রায় গুরু ছিলেন। তাকে "ভট্ট" উপাধিও দেওয়া হয়েছিল, এরূপ কথিত আছে। অধুনা হিন্দু মৌলবাদীগণ তাঁর বাপান্ত করেন, কারণ তিনি আর্যদের বহিরাগত জনগোষ্ঠী রূপে বিচার করেছিলেন। আর্যদের সঙ্গে স্থানীয় ভারতীয়দের সংঘর্ষের তত্ত্ব তাঁরা মানেন না। প্রত্নতত্ত্বের এবং ভাষাতত্ত্বের, বিশেষ ভাবে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাতত্ত্বের প্রমাণও তাঁদের বিচারে গ্রাহ্য নয়।

২. মৌলবাদী বিচারে ধর্মীয় বিশ্বাসের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত। রাম যে ছিলেন, এটা লোকবিশ্বাস, অতএব এটাই ইতিহাস।

৩. হিন্দুধর্মের বহুবিধ উপাদান থাকতে পারে। কিন্তু মৌলবাদী মতে সব উপাদানই যখন "হিন্দু", এবং হিন্দু ধর্ম যখন বেদপ্রামাণ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তখন হিন্দুধর্ম মৌলিক বিচারে আর্য ধর্ম, কারণ বেদ আর্য 'হিন্দু'দের

ধর্মগ্রন্থ। ইতু ভাদু শীতলা পঞ্চানন্দ প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর বেদপ্রামাণ্যতা মৌলবাদীগণ কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান।

৪. প্রাচীন ভারতে সমাজ ব্যবস্থা হিন্দু ছিল, এটাও মৌলবাদী মত; কিন্তু এই মত প্রশ্নাতীত ঐতিহাসিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।[২১ক]

৫. হিন্দু মৌলবাদীরা অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচার সাধারণতঃ করতে চান না; যদিও বা তাঁরা তা করেন, তবে তাতে "হিন্দু"-সভ্যতার উৎকর্ষ প্রমাণ করাই তাঁদের লক্ষ্য হয়। বিশেষভাবে চিন ও জাপান, এবং ইওরোপের কোন কোন দেশ যে 'অসভ্য' ছিল, এটা উনিশ শতকের শেষদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণারূপে প্রসিদ্ধ ছিল। দক্ষিণপূর্ব এসিয়ার দেশগুলো "হিন্দু উপনিবেশ" রূপে বিবেচিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে চিনের, মধ্য এবং পশ্চিম এসিয়ার, গ্রীসের, রোমের যে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল, মৌলবাদী বিচারে তা তাৎপর্যহীন।

৬ মৌলবাদী বিচারে ইসলাম বিদেশী ধর্ম। এই বিচারে মুসলমানগণ প্রথমে মুসলমান, তারপরে 'ভারতীয়' হলেও হ'তে পারেন। যথেষ্ট জোরাল ভাষায় এই 'ঐতিহাসিক সত্য' উদ্ঘাটিত করেছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। [দ্রষ্টব্য: R. C. Majumdar, "Impact of Islam on Hinduism", Horst Kruger ed Kunwar Mohammad Ashraf: An Indian Scholar and Revolntionary, 1903-1962, Delhi, People's Publishing House, 1969, pp. 264-270: পরবর্তী প্রবন্ধ, Hiren Mnkhrice রচিত "Hiadu-Muslim Unity", pp. 271-73 দ্রষ্টব্য। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হিরেন মুখার্জি রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত যোগ্যতার সঙ্গে খণ্ডন করতে পারলেন না, এটা দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়।] ইসলাম বিদেশী ধর্ম হওয়ার জন্য ভারতে প্রচলিত ধর্ম তার সঙ্গে মিলতে পারেনি। অতএব ধর্মের নামে ইসলামের অনুগামীগণ হিন্দুদের উপরে কেবল অত্যাচারই করেছে, কারণ বিধর্মীদের দমন করাই ইসলামের প্রধান নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে দুইটি তথ্য বিচার্য। প্রথমতঃ, হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের, হানাহানির যেমন প্রচুর তথ্য আছে, হিন্দু-মুসলমান-সৌভ্রাতৃত্বের, মৈত্রীর প্রমাণও তার তুলনায় নিতান্ত কম নয়। মৌলবাদী বিচারে এসব প্রমাণ ধরা হয় না। দ্বিতীয়তঃ মৌলবাদী বিচারে হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈনদের কলহ, শৈবদের সঙ্গে

বৈষ্ণবদের তুমুল বিবাদ (বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে), বামাচারী তান্ত্রিকদের সঙ্গে বেদবাদী-ব্রাহ্মণদের এবং বৈষ্ণবদের বিবাদ. অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বৈদান্তিক মতপার্থক্য গুরুত্বহীন। মুসলমানদের শাসনকালে ভারতের সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছিল, মৌলবাদীরা তাও স্বীকার করেন না। হিন্দুরা যে অভিজাত মুসলমানদের কাছ থেকে সভ্য ব্যবহার শিখেছিল, একথা শুধু সাম্প্রতিক কালে দিল্লীর প্রধান ইমাম-ই বলেননি; এ কথা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যাঁর ব্রাহ্মণত্ব, এবং বিদগ্ধতা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মৌলবাদী বিচারে এসব অপপ্রচার। আকবরের কোন গুণের কিংবা কৃতিত্বের বিচার নেই, কঠোর বিচার আছে তাঁর মদ্যপানাসক্তির। হিন্দু রাজারাণীরা বুঝি মদ্যপান করতেন না? তাঁদের যৌনাচারিত্র্যের বিবরণ দিয়েছেন কালিদাস, বাণভট্ট কল্হণ।[২৩] কোন মৌলবাদী তত্ত্বেই স্বাধিকার-প্রমত্ত স্বৈরাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। হিন্দু স্বৈরাচার কোন অর্থে ইসলামি কিংবা খ্রিস্টান স্বৈরাচারের তুলনায় ভাল ছিল—এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর হিন্দু মৌলবাদীগণ দিতে পারেন না। সব মৌলবাদই যখন প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, আর্য সামাজিক ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তখন তাতে প্রাচীন স্বৈরাচারই আদর্শ রূপে মান্যতা পেয়ে থাকে। সেই প্রাচীন স্বৈরাচারী আদর্শকেই আধুনিক মৌলবাদীগণ একনায়কত্ব মূলক রাষ্ট্রদর্শে রূপান্তরিত করেন, এজন্যই শিবসেনাপতি বাল থাকরে হিটলারের ভক্ত হয়ে পড়েছেন।

পূর্বে একাধিবার বলা হয়েছে যে, মৌলবাদীদের বিচারধারায় সময় গুরুত্বহীন। তাই খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে পলাশির যুদ্ধকাল ১৭৫৭ পর্যন্ত সময় হিন্দু মৌলবাদীগণ গুরুত্বহীন মনে করেন, কারণ এই সাতশত বৎসরে ভারতে মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান, অর্থাৎ বৈদেশিক উপাদান, এমন উপাদান যা হিন্দুধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আপস করেনি। অতএব যে কালে এই উপাদানের প্রাধান্য ছিল, সে কালকেই ভারতের ইতিহাসের বাইরে রাখার কথা বলা হচ্ছে। তার সঙ্গে, লোককে দেখাবার জন্য, ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কেও যুক্ত করা হয়; অর্থাৎ হিন্দু মৌলবাদীরা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকেও "হিন্দু" ইতিহাসে স্থান দিতে চান না। তার অর্থ, ভারতের ইতিহাস থেকে প্রায় হাজার বৎসর বাদ পড়ল এটা কী ইতিহাস, নাকী ইতিহাসের আদ্যশ্রাদ্ধ? যাঁরা এরকম ভাবেন, তাঁদের কানে ইতিহাসের বার্তা-কী ভাবে পৌঁছাবে? তাঁরা যে চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে

রাখেন। এই অজ্ঞানতিমিরান্ধদের কার সাধ্য এটা বোঝায় যে, ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিগত হাজার বৎসরের গুরুত্ব অশেষ?

ভারতের ইতিহাসে ইসলামের অতুলনীয় অবদানের প্রসঙ্গ না হয় তোলা হ'ল না। কিন্তু সেই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থাতে সমন্বয়মূলক যে ব্যাপক ভক্তি আন্দোলন হয়েছিল, মৌলবাদী বিচারে বোধ হয় তাও অপ্রাসঙ্গিক, কারণ ভক্তিতে যে মানবিক মূল্যবোধ এবং সমন্বয় দেখা যায়, তা মৌলবাদবিরোধী। মুসলমানি শাসনকালে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের, বিশেষ ভাবে হিন্দীর যে উন্নতি হয়েছিল, মৌলবাদী বিচারে তাও মূল্যহীন। মৌলবাদ সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা মানে না, সাংস্কৃতিক সংযোগের ইতিহাসও তাতে গ্রাহ্য নয়।

অধুনা হিন্দু মৌলবাদ জাতীয়তাবাদের পোষাক পরেছে। উনিশ শতকে স্মার্ত এবং সংস্কৃত মৌলবাদীদের ব্রিটিশ-ভক্তির বিবরণ অজ্ঞাত নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামি মৌলবাদীদের মতো হিন্দু মৌলবাদীরাও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত শক্ত করেছে। তাঁদের কীর্তিকলাপের বিবরণ সুদীর্ঘ এবং যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।[২৪] তার আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবুও একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ্য। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো'-আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কোন ভূমিকা ছিল না; কারণ এক সময়ে এই সঙ্ঘের কোন কোন নেতার সঙ্গে মহাত্মাগান্ধীর সংযোগ থাকলেও তা আদর্শের এবং কর্মপন্থার বিচারে ছিল অরাজনৈতিক। হিন্দু মহাসভার প্রখ্যাত নেতা, 'প্রাচীন' বিপ্লবী বীর সাভারকার এই বৃহৎ এবং ব্যাপক আন্দোলনকে "পাপ" বলেছিলেন, "পাপ" বলেছিলেন শাসনতন্ত্র প্রণেতা আম্বেদকার।[২৫]

## সাত

হিন্দু, মুসলমান মৌলবাদীদের শ্রেণীচরিত্র এখন আর অজ্ঞাত নয়। মৌলবাদের তত্ত্ব-কর্তাদের এক স্তর; তাঁদের সমর্থকদের বিবিধ স্তর; মৌলবাদ যাঁদের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাঁদের প্রধানতঃ নিম্নবর্গীয় বললে বোধ হয় ভুল হয় না। মৌলবাদ তত্ত্ব-উদ্ভাবকগণের আদর্শ সম্পর্কে স্বকীয় ধ্যানধারণা দুর্লক্ষ্য নয়; শশধর তর্কচূড়ামণি যখন বেদ প্রামাণ্যতার তত্ত্ব প্রচার করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি-জানা সহুরে বাবুদের উন্মার্গগামিতাকে কছুটা নিয়ন্ত্রিত করা। দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করেও সৈয়দ আহমদ খান্

মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ যে জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাতেও তো সন্দেহ নেই। কিন্তু মৌলবাদ যখন সমর্থকদের বিবিধ সামাজিক স্তরে গ্রাহ্য হয়, তখনই তা বিবিধ সামাজিক স্তরের একটি সুস্পষ্ট ভাবাদর্শ হয়ে যায়, এবং বিবিধ সামাজিক স্তরে তার বিবিধ ব্যাখ্যা হতে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের "হিন্দু" অধুনা বেশ কিছু শ্রমজীবী সাধুসন্তদের স্তরে যেমন রামের এবং হনুমানের ভজন পূজন, তেমনি ব্রাহ্মণের প্রাধান্যসূচক বর্ণপ্রথার পুনঃস্থাপনও বটে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, ভারতীয় জনতা দল ঠিক ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের তত্ত্ব প্রচার করেনি, বরঞ্চ হিন্দু সমাজ-সংস্কারের কথাও গ্রাহ্য বিবেচনা করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক অদ্বৈতবাদ এই দুই সংগঠনের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সমর্থকদের বিবিধ সামাজিক স্তরে কখনও দেওয়ালের, কখনও ভবানীর, কখনও হনুমানের প্রাধান্য যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। অথচ ধর্মক্ষেত্রে একীকরণের প্রক্রিয়া দুর্লক্ষ্য নয়।

এসব লক্ষণ এখানে সামান্যভাবে বলা হ'ল। যাঁরা করসেবায় যোগদান করেন, বাবরি মসজিদ ভাঙেন, অথবা পাকিস্তানে বাংলাদেশে যাঁরা হিন্দু-মন্দির ভাঙেন, সে সব মহাত্মাদের আর্থসামাজিক পরিচিতি এখনও গবেষিত হয়েছে কী না, তা জানা নেই। কিন্তু ধ্বংসের মাধ্যমে ধর্মীয় একীকরণও যেমন হয় না, তেমনি দূরীভূত হয় না শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদ। 'হিন্দুত্ব'-সামগ্রিকভাবে একতাবাচক; করসেবায় সব হিন্দুর সমান অধিকার। কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ, কোন হিন্দু রাজপুত, কেউ বা ভূমিহার, কিংবা যাদব, কিংবা নমশূদ্র। এঁদের প্রত্যেকেরই আলাদা ধর্মীয় কৃত্য, আলাদা সংস্কার, আলাদা সমাজ। রাম নামে এসব সত্য, সত্য এই দুরগনের বিভিন্নতা। ব্রাহ্মণেরা এবং শূদ্রারা কখনই নিম্নবর্গীয় জীবনধারার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করে না। কিছুটা সাংস্কৃতিক উপযোজন উভয়তঃ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন একাধিক নিম্নবর্গীয় ধর্মসম্প্রদায় এখনও আছে, যেখানে ব্রাহ্মণদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।[২৬] শিষ্টবর্গ এসব ধর্মসম্প্রদায়কে সব সময়ে ঘৃণা করেছে, অবহেলা করেছে। "হিন্দুত্ববাদী"-গণ, রামভক্তবৃন্দ, হনুমানদাসগণ এবং গোরক্ষ পূজারীগণ এসব নিম্নবর্গীয় ধর্ম সম্পর্কে এখন নীরব হ'লেও, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেলে তাদের যে উচ্ছেদ করবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার কারণ, হিন্দু-মুসলিম—খ্রিস্টান মৌলবাদে প্রথমাবধি একটা আভিজাত্যের ব্যঞ্জনা

দেখা যায়, যা অনভিজাত ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে বেদপ্রামাণ্যতার সুপ্রাচীন তত্ত্ব সেই 'আর্য' আভিজাত্যকেই প্রকাশ করে। বল্লাল সেন তাঁর 'দান সাগর' গ্রন্থে শৈবশাক্ত ধর্মকেও বেদবাহ্য 'পাষণ্ড'-মত রূপে বিচার করেছেন।[২৭] এ বিচারে 'সংস্কৃতকরণ'-এর প্রক্রিয়া ফলতঃ মৌলবাদে রূপান্তরিত হয়।

অতএব, অন্ততঃ আমাদের দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ শুধু যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগকে বর্তমানে প্রস্থাপিত করতে চায়, তাই নয়; আমাদের দেশে ধর্মীয় সামাজিক আভিজাত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এবং আভিজাত্যের ধর্মীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে অনভিজাত মানুষদের অভিজাতদের পায়ের তলায় রাখতে চায়। সর্বত্র এবং সর্বকালে ধর্মীয় মৌলবাদের এটাই আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথাই সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে, মৌলবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে।

## সূত্রনির্দেশ

১. **Webster's Seventh New Collegiate Dictionary.** [ Calcutta ed. 1969 ] p. 338। 'Fundamentalism' শব্দটির ব্যাখ্যা, Games Hastings ( ed ) **Encyclopaedia of Religion And Ethics**—এ দেখা গেল না।

২. Games Hastings ( ed. ) **Encyclopaedia of Religion and Ethics**, vol. IV ( Edinburgh, 1981 )। pp. 686—714 ; G. L. Brockington, **A Short History of Hinduism** ( Bombay, 1992 ) pp 1—28 ; H. H. Risley, "Introduction" **In Tribe and Castes of Bengal** 2 vols. ( Calcutta, reprint, 1991 ), vol I, pp. I—XCCIII ; Charles Leslie, ed, **Anthropology of Folk Religion** ( New york, 1960 )—এ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, Mckim Marriott, "Little Communities in an Indigenous Civilization", pp. 169—218 ; আরও দ্রষ্টব্য, William Crooke, **The Popular Religion and Folklore of Northern India**, 2 vols. ( Westminster, 1896 )

৩. S. K. Chatterji, 'Race-Movements and Prehistoric Culture", দ্রষ্টব্য, **The History And Culture of Indian People' The Vedic Age**, ed. R. C Majumdar and A. D. Pusalker [ London, 1957 ), pp. 141—168

৪. Damodar Dharmananda Kosambi : **An Introduction to the study of Indian History** ( Bombay, 1975 ) ; H. H, Risley, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, pp XV-XVIII ; Verrier Elwin, **Myths of Middle India** ( Bombay, 1969 ), Introduction. pp. IX-XVI

৫. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পঞ্চোপাসনা' [ কলিকাতা ১৩৬০ ], পৃ ১-১৫

৬. Milton Singer, "The Great Tradition of Hinduism in the City of Madras", দ্রষ্টব্য, Charles Leslie ed. **Anthropology of Folk Religion**, পূর্বোক্ত, pp. 105—168

৭, "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা' [ আর্যসমাজ, হাওড়া ১৩৮৮ ] পৃ ১২৩-১২৪

৮. R. S Sharma, **Material Culture and Social Formations in Ancient India** ( Delhi, 1933 ), Ch. VII, pp 117—134

৯. দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, 'শ্রীগোপালবসু মল্লিক ফেলোশিপ-প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ড, [ কলিকাতা ১৯২২ ], পৃ. ১৮ ; এবং, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, 'চার্বাক দর্শন' ( কলিকাতা ১৯৮২ ), "চার্বাকমত," পৃ, ১৩-৩৩

৯ক. দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, উপরে উক্ত।

৯খ. গৌরীনাথ সম্পাদিত, 'উদয়নাচার্যকৃত কিরণাবলী', দুই খণ্ড, [ কলিকাতা ১৯৯০ ] দ্রষ্টব্য।

১০. কৃষ্ণমিশ্র যতি, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্', অনিলচন্দ্র বসু সম্পাদিত [ কলিকাতা ১৯৭৯ ], পৃ, ১৪৬-১৪৮

১০ক. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', প্রথমভাগ [ কলিকাতা. ১২৬৫ ], পৃ. ৭

১১. তদেব, পৃ. ৪৮

১২. কনফুসিয়াস্-এর চিন্তায় ধর্মের প্রভাবের স্বল্পতা দর্শনে Max Weber এর মন্তব্য :

"In a sense of the absence of all metaphysics and almost all residues of religious anchorage, Confucianism is ratio-nalist to such a far-going extent that it stands at the extreme boundary of what one might possibly call a "religious ethic" Gerth, H H, and Mills, C. Wright, **From Max Weber : Essays in Sociology** ; New York. 1946) p. 293.

১৩. রাধাকান্ত দেব, 'শব্দকল্পদ্রুম', দ্বিতীয় খণ্ড (দিল্লী, ১৯৮৮), পৃ. ৩৮৩-৩৮৫

১৪. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, 'মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য', চার খণ্ড [পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, তারিখ নেই ], ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩০, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮৯ ৫৫৬, ৫৭৬, ৬৩০ ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১৬, ৭১৭, ৮২৩, ৮৩৮, ৮৬২, ৮৭৮, ৯৭৭ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯৮১, ৯৮৮, ৯৮৯ ১০০৩, ১০১৬-১৭, ১০২৪, ১০২৭-২৮, ১০৬৯ ; 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত [কলিকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, ৪র্থ সং ১৯২৫ ), পৃ. ৩৩-৩৪ ; সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি' ( বসুমতী প্রেস, তারিখ নেই ), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬-৭।

১৫. 'রাজতরঙ্গিণী', পণ্ডিত রামতেজশাস্ত্রী দ্বারা হিন্দী ভাষায় অনূদিত, এবং সম্পাদিত, [কাশী, পণ্ডিত পুস্তকালয়, ১৯৬০ ]। হিন্দী অনুবাদ প্রশংসনীয়, প্রাঞ্জল, এবং সর্বত্র মূলানুগ।

১৬. A. L. Basham, The Wonder That was India [ New Grove Press, 1954 ) ; দ্রষ্টব্য, A. L. Basham, The Origin And Development of Classical Hinduism (Oxford University Press, 1989 ) এবং R. N. Dandekar, Insights into Hinduism ( Ajanta Publications, Delhi 1979 )।

১৭. "অষ্টাধ্যায়ী", চতুর্থ অধ্যায়, সূত্র ৮৯ ; "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্" অর্থাৎ বাসুদেব এবং অর্জুনের ভক্ত বোঝাবার জন্য 'বাসুদেব' এবং 'অর্জুন' শব্দের উত্তর 'বুন্' প্রত্যয় করতে হবে। প্রত্যয় সংযুক্ত হলে হবে, "বাসুদেবকঃ", "আর্জুনকঃ"। দ্রষ্টব্য, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পঞ্চোপাসনা', পূর্বে উক্ত' পৃ. ৫১-৫৪

১৮. বিষয়টি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন, 'রাম কথার প্রাক্-ইতিহাস' [ কলিকাতা, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্, ১৯৮৯ ]

১৯. দ্রষ্টব্য : মিহির কিরণ ভট্টাচার্য, 'বৃহৎপূজাপদ্ধতি' [ কলিকাতা ], ভূমিকা ; সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে [ কলিকাতায় অবস্থিত ] পুথির তালিকা প্রস্তুত করার সময়ে রামভদ্র রচিত 'আনন্দ রত্নাকর' নামক পুথি দেখি ; বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার বিবরণমূলক এই পুথিতে এই বিচিত্র তথ্য দেওয়া হয়েছে যে, মন্দোদরীকে নিয়ে বামাচারী পঞ্চ মকারাত্মক সাধনা করার সময়ে রাবণ কৌলাচারের পদ্ধতি অনুসারে তাতে রাম এবং সীতাকেও যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন, এবং তাতে রাম ও সীতা যোগদান করেন। অবশ্যই এই বিবরণ সাম্প্রদায়িক এবং অর্বাচীন।

২০. এ বিষয়ের কয়েকটি গ্রন্থ : বঙ্গভাষায়, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য' [ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলিকাতা ১৯৮৫) ; Proceedings of A National Seminar on the Aryan Problem Held at Bangalore on 21-22 July 1991 ( Published by the Mythic Society, Bangalore, no date ); Sriram Sathe, Facts About

Aryans ( Hyderbad, 1991 ) ; হিন্দী ভাষায়, স্বামী যোকানন্দ সরস্বতী, "ইতিহাসকে কলংকিত পৃষ্ঠ' ২ খণ্ড, ( বৈদিক সাহিত্য প্রকাশন বাজনা, মথুরা, ১৯৮৯ ) ; স্বামী যোকানন্দ সরস্বতী রচিত, রাষ্ট্রদ্রোহী কৌন ?' 'তাজমহলকা বাস্তবিক নির্মাতা কৌন ? ইসলাম কা আধার হিন্দুত্ব, ভারতমে কম্যুনিজম কী ছায়া, মুস্লিমোঁ কা রাষ্ট্রীয় করণ প্রভৃতি গ্রন্থ যথেষ্ট জনপ্রিয় ; সব গ্রন্থই মথুরাতে প্রকাশিত। এসব গ্রন্থ মথুরা ছাড়াও জয়পুর, আগ্রাতে, কানপুরে আলীগড় এবং পাটনাতে বিক্রয় করা হয়।

২১. ২০-সূত্রে উল্লিখিত বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্র।

২১ক. এধরনের সাধারণীকরণ যে অনৈতিহাসিক, তা রমিলা থাপার দেখিয়েছেন ; Romila Thapar, "Imagined Religious Communities : Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity" ( Centre for Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi ).

২২. ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "মুসলমানদিগের ভারত রাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্বপ্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট প্রণালী সংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহাঋণগ্রস্ত…" গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : "কিন্তু ইতিহাস সে কথা বলে না।" সম্পাদক মহাশয় তাঁর প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করেছেন The Cambridge Shorter History of India, এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার—রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ'। মন্তব্য করার দরকার নেই। শুধু এটা বলা দরকার যে, এই গ্রন্থের সম্পাদনার জন্য অন্য আর কোন লোককে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার খুঁজে পাননি। দ্রষ্টব্য: ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'সামাজিক প্রবন্ধ', ভূমিকা ও টীকা সহ সম্পাদনা, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, [ কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা, (আলোচনা) ৭, [ মূল রচনা ], ১৪-১৫।

২৩. কালিদাস রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এ 'মদস্খলিত পদা" রানী ইরাবতী ; 'রঘুবংশম্'-এ অগ্নিবর্ণ ; 'কুমারসম্ভবম্'. অষ্টম সর্গ, শ্লোক ৭৬-৮১ : মদ্যপান সহ হরপার্বতীর যৌন মিলনের বিশদ বিবরণ ; জ্যোতি ভট্টাচার্য, 'পরিপ্রশ্ন' ( কলিকাতা, 1992 ) "বাণভট্টর হর্ষচরিত : সমাজচিত্র", পৃ. ১১-৪৬ ; কল্হণ, 'রাজতরঙ্গিনী,, পূর্বে উক্ত রানীদের সঙ্গে রাজার মদিরাপান, পৃ. ৮৭ ; রাজা ললিতাদিত্যের দৌশ্চারিত্র্য পৃ ১০৩ ; রাজা ললিতাপীড়ের বেশ্যাসক্তি, পৃ. ১২২ ; রাজমাতা বিধবা সুগন্ধার চরিত্রহীনতা, পৃ. ১৪২ ; ক্ষেমগুপ্ত নামক রাজা বৃদ্ধদের শ্মশ্রুতে থুথু দিতেন, তাদের অশ্লীল গালাগালি করতেন, মাথায় তালি বাজাতেন, পৃ. ১৭২ ; রানী দিদ্দার ভয়ানক দৌশ্চারিত্র্য এবং নিষ্ঠুরতা,

ষড়তরঙ্গ, পৃ. ১৮৩ থেকে বিবৃত। সমগ্র 'রাজতরঙ্গিনী' এ ধরনের বিবরণে পূর্ণ।

২৪. এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ অমলেন্দু দে, 'ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা' (কলিকাতা, ১৯৯২,) প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়।

২৫. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Ramji Gopal, Political India (Delhi, Ajanta Publication, 1978)

২৬. দ্রষ্টব্যঃ সুধীর চক্রবর্তী, 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান' (কলিকাতা, ১৯৮৬); সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' (কলিকাতা ১৯৮৫)

২৭. ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বল্লালসেন রচিত 'দানসাগর' (কলিকাতা, ১৯৫৫), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

# সংঘ পরিবারের ফ্যাসিবাদ

সুমিত সরকার

ইউরোপের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে স্বতন্ত্রভাবে সমকালীন ভারতীয় পটভূমিতে ফ্যাসিবাদ বলতে মাত্র কিছুদিন আগেও বোঝাত নির্বিচার ও বহু ব্যবহারে জীর্ণ একটা ধারণা বা বিশেষ এক ধরণের স্বৈরাচারী নিপীড়ন কিম্বা প্রতিক্রিয়াশীল হিংসার বিশেষিত নাম ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য বহন করতো না। ৬ই ডিসেম্বর এবং তারপর যা ঘটে গেছে সেটা অনিবার্যভাবে ত্রাসের সেই সমগ্রতা মনে জাগিয়ে তোলে যা দেশের পথে ঘাটে তাণ্ডব চালিয়েছে, দেশের ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর থেকে যা পেয়েছে অবাধ প্রশ্রয় ও সংগ্রহ করেছে গূঢ় প্রাণশক্তি, যা আত্মীয় স্বজন, সহকর্মী, গতকালের বন্ধু ছিল যারা তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা যায়। সন্দেহ নেই ৬০ বছর আগেকার জার্মানীর সঙ্গে ভারতীয় পরিস্থিতির খুঁটিনাটি মিল আদৌ সম্ভব নয়। ১৯৯২-৯৩ সালের ভারত নানা দিক থেকেই জার্মানী থেকে আলাদা। তবু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ছকটাকে খুঁটিয়ে দেখলে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে যাদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় হলো সংঘ পরিবারের সাম্প্রতিক মরীয়া মারমুখী অগ্রগমনের প্রচেষ্টা—যা স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর এই প্রথম এই উপমহাদেশ ব্যাপকতম সাম্প্রদায়িক হিংসার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে এবং যার সঙ্গে আর কোন কিছুর তুলনা করা যায় না। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ আমাদের প্রজাতন্ত্রের সেকুলার ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিকেই বিপদাপন্ন করেছে। আজকের এই মুহূর্তে নেহরুর একটি পুরানো সতর্কবাণী খুবই সময়োপযোগী মনে হয়। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা প্রকৃতিগত ভাবেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের মতোই সমান খারাপ। মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তুলনায় কম তো নয়ই বরং বেশি হতে পারে। "কিন্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ভারতীয় সমাজের উপর আধিপত্য কায়েম করে ফ্যাসিবাদ চালু করা সম্ভব নয়। হিন্দু সাম্প্র-দায়িকতাবাদই সে কাজটা করতে পারে।" (ফ্রন্টলাইন পত্রিকার, ১ জানুয়ারী, ১৯৯৩ সংখ্যায় উদ্ধৃতি)। তাই ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের দিকটি খুঁটিয়ে

বিশ্লেষণ করলে, যে বিপদ আজ আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তার স্বরূপ আরো ভালো বোঝা যাবে। আর খুবই মাঝেমাঝে যে জিনিসটার ঘাটতি আমাদের সবচেয়ে বেশি বলে পীড়া দেয় অথচ যা খুবই দরকার, সেই আশার যোগান কিছুটা পাওয়া যেতে পারে এই বিশ্লেষণে।

ইতালি ও জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় এসেছিল রাস্তার হিংসাত্মক ঘটনাবলী ( যা উপর থেকে সচেতন মহোদ্যমে সংগঠিত হতো যদিও নিঃসন্দেহে তার পিছনে বিপুল গণসমর্থনও ছিল), পুলিস, আমলাতন্ত্র ও সৈন্য বাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীর অনুপ্রবেশ এবং "মধ্যপন্থী"রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরোক্ষ মদৎ, এই তিনের সংমিশ্রণে। আইন ও সাংবিধানিক নিয়ম নীতি অবজ্ঞাভাবে লঙ্ঘন আর তার পরেই সব রকমের বৈধতার প্রতি সোচ্চার আনুগত্য ঘোষণা, পরস্পর বদলাবদলি করে চলার এই কৌশল নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যায়। একথাটা সব সময়ে খেয়ালে রাখা হয় না যে, হিটলার ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী সম্পূর্ণ সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের আমন্ত্রণে রাইখস্ট্যাগে বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবেই চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। পরের সারা মাস তিনি আইনের প্রতি তাঁর দলের শ্রদ্ধার কথা বারেবার ঘোষণা করেছেন—আর এরই পাশাপাশি গোয়েরিং বার্লিন পুলিস বাহিনীর নাৎসী-করণ পর্ব চুকিয়ে ফেলেছেন, রাস্তার হিংসাত্মক ঘটনাবলীতে ৫০ জন ফ্যাসি বিরোধী মানুষকে খুন করিয়েছেন, এবং কুখ্যাত রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ড ঘটানোর পটভূমি রচনা করেছেন, যার পরেই প্রথমে কমিউনিস্ট এবং শেষে সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধী দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধ্বংস করার সুযোগ এসেছে।

এই সবের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সুনিশ্চিতভাবে এদেশের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদকে মনে করিয়ে দেয়। পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করে, অগ্রণী বিরোধী দল ও তার সঙ্গী সাথীরা নিজেদের বারবার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙে একটা মসজিদ গুঁড়িয়ে দিল, এবং কেন্দ্রিয় সরকার কড়ে আঙুল নাড়িয়েও প্রতিবাদ করা, তাকে রুখে দেওয়ার কোন চেষ্টাই করলো না। তারপর শুরু হয়ে গেল দেশ জোড়া দাঙ্গা, দেখা গেল পুলিসের নগ্ন পক্ষপাতিত্ব যখন আইনের রক্ষক ও অভিভাবকরা স্বয়ং দাঙ্গাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো ইচ্ছামতো এবং যত্রতত্র। তারপর দেখা গেল আশ্চর্য রকমের রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয়

ছলচাতুরীর এক খেলা যা কার্যতঃ ভূমি দখলকারী বর্বরদের অস্থায়ী একটা "মন্দির" বানিয়ে সেখানে "দর্শনের" ব্যবস্থাও করে দিল এমন একটা সময়ে যখন সেখানে টানা কারফিউ চলছে। আসলে কারফিউ চালানো হলো মুসলমানদের আটকাতে, হিন্দুদের বাধা দেওয়ার জন্যে নয়, এবং সেখানে ৪৬২ বছরের পুরানো একটা মসজিদ যাকে এতোকাল "বিতর্কিত কাঠামো" বলা হচ্ছিল, সেটা ভেঙে যেই মন্দির বসানো হয়ে গেল তখন আর তা বিতর্কিত রইলো না, বরং তার সংরক্ষণের ব্যবস্থাটাই জরুরী কাজ হয়ে পড়লো। আর এরই মধ্যে বি. জে. পি. কখনো নরম গলায় দুঃখ প্রকাশ করলো, ক্ষমা চাইলো আবার গরম হয়ে বেশির ভাগ সময়েই নিজের কাজের সমর্থনে জঙ্গী ভাবে যুক্তি খাড়া করতে থাকলো, এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা তাদের ধ্বংস তালিকায় পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রায় বারাণসী ও মথুরার সঙ্গে দিল্লীর জুমা মসজিদের নাম জুড়ে দিয়ে খোলাখুলি ভারতীয় সংবিধান হিন্দু বিরোধী বলে ধিক্কার দিল।

## লক্ষ্যমাত্রার সম্প্রসারণ

এই বিস্তৃততর পরিধি যা এতোকাল বারবার ক্লাসিক্যাল ধরণের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা রূপে আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ছিল তার এলাকা ক্রমেই বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সম্ভাব্য প্রতিবাদের প্রসারমান কেন্দ্রগুলিকে উত্তরোত্তর সন্ত্রস্ত করে তোলার প্রচেষ্টা তীব্রতর করা হয়েছে। এই দিকটাই একটু বিশদ ভাবে এখন বলা দরকার। হিটলারী কায়দার সঙ্গে তুলনা এই দিক থেকেই অত্যন্ত সঠিক: হিটলার প্রথমে ইহুদী ও কমিউনিস্টদের আক্রমণ করতে শুরু করে অচিরে যেখানে যারা বিন্দুমাত্র স্বাধীনচিন্তার সাহস করতো সেইসব সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, লিবারেল ক্যাথলিক প্রভৃতি সকলকে এমন কি কয়েকজন নাৎসীকেও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেন। তাদের নির্বিচারে খুন করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখা যায় নি। বি. জে. পি. খোলাখুলি সন্ত্রাসের পথ নেওয়া অধিকতর সঙ্গত মনে করেছে, মধ্যপ্রদেশের দুটি ঘটনা যার সঙ্গে রামজন্মভূমি আন্দোলনের কোন সম্পর্কই নেই,—যেমন ১৯৯১ সালের শরৎকালে অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমিক নেতা শংকর গুহ নিয়োগীকে খুন করেছে এবং প্রখ্যাত প্রগতিশীল, অবসর প্রাপ্ত সিবিলিয়ন

বি, ভি শর্মাকে প্রকাশ্যে অপমান করতে দ্বিধা করেনি। (মহারাষ্ট্রের শিবসেনা এর আগেই এই সব জঘন্য ধরণের কাজের নজীর সৃষ্টি করেছে, যেমন ৭০'র দশকের বোম্বাইয়ে প্রভূত শক্তিশালী লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নকে তাড়ার জন্যে পথে ঘাটে ব্যাপক হিংসার তাণ্ডব ঘটায়)। সুতরাং ৬ই ডিসেম্বর সাংবাদিকদের উপর আক্রমণকে মোটেই একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা বলা যাবে না। বরং এটা হলো বিকাশমান এই ধরণের ঘটনার একটা নমুনার মতো, যার পিছনে বহু উপাদান ও শক্তির সমাবেশ ঘটে গেছে। হিন্দুদের শক্তিশালী, কায়েমী স্বার্থবাদী যে সব অংশ এতোকাল একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিল, যারা খবরের কাগজ ও সাংবাদিকদের কিছুকাল আগে পর্যন্ত তোয়াজ করতো, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতো; তারাই এবার নীতি বদলেছে। কারণ ফ্যাসিস্তরা সব সময়েই সুযোগ মতো কখনো বোঝানো অর্থাৎ নরম আবার কখনো গরম অর্থাৎ পেটানোর লাইন নিয়ে চলে থাকে।

দিল্লীর কিছু কম প্রচারিত ঘটনা এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক, যার থেকে বোঝা যাবে পথে ঘাটে হিংসাত্মক ঘটনা আর প্রশাসনিক মদৎ কতোটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, বিশেষতঃ সেই রকম একটা শহরে যেখানে ডিসেম্বরের দাঙ্গা ছোট খাটো ঘটনা হিসাবে কিছু জায়গায় সীমিত ছিল মাত্র।[১] অথচ এই সব ঘটনা ঘটছে কেন্দ্রিয় সরকারের নাকের ডগায় যে নাকি আর. এস. এস., বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ করেছে। শান্তি কর্মীরা সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার জন্য কিছু গান ও প্রচার পত্র বিলি করার মতো নিতান্ত নিরীহ গোছের কাজ এবং রাস্তায় পথ নাটিকা করার জন্য বারবার আক্রান্ত হয়েছে। খবর পাওয়ার বেশ পরে পুলিস এসেছে, যাদের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে শোনা যায় সেই সব সংঘ পরিবারের লোকজন বাদ দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তিদের গ্রেপ্তার ও নানা ভাবে হয়রান করতে সুরু করে। এমন কি পি. এন্ হাকসারের ও মতো মানুষের নেতৃত্বে পরিচালিত শান্তি মিছিলকেও পুলিস বাধা দিয়েছে অগ্রসর হতে, আর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র যার নামের প্রথম অংশ 'রাম' শব্দ দিয়ে সুরু পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে গালে চড় মেরে বলে দিয়েছে এহেন নামের সঙ্গে যার যোগ আছে তার পক্ষে এই ধরণের মিছিল করা চরম গুনাহ।

আর বজরং দলের ঠগী বাহিনী খোলাখুলি একথা প্রচার করে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় যারাই সমালোচনা করবে, এদেশে তাদের স্থান নেই,

তাদের পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। আর পূর্ব দিল্লীর সেলিমপুরে কারফিউ কবলিত এলাকায় বেছে বেছে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পুলিস সমস্ত মুসলমান পুরুষদের ধরে এনে জয় শ্রীরাম না বলা পর্যন্ত প্রহার চালিয়েছে এবং অনেক মুসলমান ভদ্রলোকের নারায় মনোভাব দেখে দাড়ি উপড়ে নিতেও দ্বিধা করেনি।

## 'মিথ'কে সাদা সত্য বলে চালানো

এটা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে একটা ব্যাপক ধরণের সম্মতির ভিত্তিতে যদিও সেটা কোন মতেই সর্বজনীন নয়, যেখানে বহু মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে দূরে সরে থাকলেও, এমন কি তাদের আন্তরিক ভাবে ধিক্কার জানালেও, এক ধরণের সাম্প্রদায়িক সহমতের শরিক হয়ে পড়ে যা বহু অনুমিতি, মিথকে সাধারণ জ্ঞানের অংশ এবং সত্য বলে মনে করতে থাকে। হিন্দুদের সংগঠিত বাহিনী ক্রমাগত প্রচারে সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়ে, বহু পরিশ্রমে, ধৈর্যের সঙ্গে ৬০ বছর ধরে যাকে গভীর যত্নে লালন পালন করে কায়েম করতে চেয়েছে, সেটাকে কোন মতেই "হিন্দু চেতনার স্বত" থেকে উদ্ভূত একটা স্বতঃস্ফূর্ত কিম্বা জনমতের "স্বাভাবিক" প্রতিক্রিয়া বলে মনে করার কোন কারণ নেই। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে ১৯৫০ সাল থেকে নানা সংগঠনের মধ্য দিয়ে (যাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনসংঘ / বি. জে. পি এবং ভি. এইচ. পি) কাজ করার সময় তাদের প্রতিটি কার্যকর স্তরে নিজের বাছাই করা লোকদের দিয়ে ধীরে, কোন হৈ চৈ না করে একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুসরণ করে এসেছে, যার শাখাগুলিতে যুবকদের শরীর চর্চার পাশাপাশি একটা 'বৌদ্ধিক' প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও চালু রাখা হয়, যারা বিদ্যালয় স্থাপন করে ব্যক্তিগত সংযোগের ভিত্তিতে তাদের আদর্শের প্রচার চালায়, আলাপ আলোচনায় মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে তাদের বক্তব্যের যথার্থতা। এমন কি খুবই জনপ্রিয় হিন্দি কমিক সিরিজ 'অমর চিত্র কথা' বের করে হিন্দুদের নানা মিথ ও ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিকতা প্রচার করে থাকে। গ্রামশি যাকে বলেছেন আধিপত্য বিস্তারের আনবিক অনুপ্রবেশন, এটা হলো দীর্ঘদিন ধরে চালানো তারই কাছাকাছি একটা প্রক্রিয়া। তারপরেই ঘটে ৮০'র দশকের

গোড়ায় ও মাঝামাঝি ইন্দিরা ও রাজীবের "হিন্দু তাস" খেলার পর্ব, যখন ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী গণহত্যার মধ্য দিয়ে অভূতপূর্ব ব্যাপক হারে ঘটে যায় রাষ্ট্রযন্ত্রের সাম্প্রদায়িকরণ। সমস্ত দোষী ও অপরাধীদের নানাভাবে আড়াল করে রাখার অপচেষ্টার মধ্যদিয়ে সেই প্রবণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাত্রাহীন দুর্নীতি। এগুলি সবই সংঘ পরিবারের রামজনমভূমি আন্দোলনের ব্লিৎসক্রীগ কৌশল চালু করার জমি তৈরী করেছে, যেখানে অগ্রবাহিনীর ভূমিকা নিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। কংগ্রেস সরকারই যে রামায়ণের কাহিনীকে টিভি. সিরিয়ালের মধ্য দিয়ে নকল জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিণত করেছে সেকথা আদৌ ভোলা উচিত নয়। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে প্রশাসনের মদতে চোরের মতো বাবরি মসজিদের ভিতরে রামলালার মূর্তি বসিয়ে আসার পর তার বন্ধ দরজা ১৯৮৬ সালে খুলে দিয়ে পূজার সুযোগ করে দিয়ে যে মারাত্মক ঘটনার সূত্রপাত করা হয়েছে সেটাও এই কংগ্রেস সরকারের কৃতিত্ব। সংঘ পরিবারের war of position এখন একেবারে চোখ ধাঁধানো war of movenent এর সূচনা করেছে, যারা প্রচার জগতের সর্বাধুনিক কলাকৌশল—সংবাদপত্র থেকে রেডিয়ো-টিভি, সমস্ত মাধ্যমেই এমন ব্যাপক আকারে ও বিপুল ব্যয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এই উপমহাদেশে যার সঙ্গে তুলনীয় কিছু ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সব বিষয়ে হিটলারও কিছুটা পথিকৃতের কাজ করে ছিলেন, যিনি তখনকার কালে অপেক্ষাকৃত নতুন কৌশল হিসাবে প্রচারের বাণী মাইকে ও বেতারে ব্যবহার করেছিলেন।[২]

ফ্যাসিবাদ যেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে তার আবির্ভাবের দশ বছর কিম্বা তারও কম সময়ের মধ্যে ইতালি ও জার্মানীতে ক্ষমতায় এসেছিল, সেখানে হিন্দুত্বের ফসল পেকে উঠতে বেশ দীর্ঘ সময় লাগছে। সন্দেহ নেই এই সময়টাই তাকে বাড়তি শক্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে বেশি সুযোগ দিয়েছে যাতে মানুষের বোধ ও ধারণার সঙ্গে সেটা মিশে গিয়ে মানসিক প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত হতে পারে। তবে এখানে একটা আশার দিকও রয়েছে। কারণ কয়েক দশক ধরে মানুষের হৃদয় ও মন জয় করার নিরলস প্রয়াস চালিয়েও তার লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। একথা স্মরণ করা খুবই জরুরী যে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে দেশে প্রতি পাঁচজন ভোট দাতার মধ্যে চারজন বি. জে. পি-র বিরুদ্ধে ভোট দেয় ( তার সর্বভারতীয়

ভোটের হার ছিল ২১.৯ শতাংশ)—এবং যদি এই ভোটকে রামের ভোট বলা হয়, তাহলেও দেখা যাবে, উত্তরপ্রদেশে তার জয়লাভ রাম মন্দির গঠনের পক্ষে নির্বাচকদের অনুমোদন হতে পারে কিন্তু কোন মতেই তাকে বাবরি মসজিদ ভাঙার সপক্ষে মত বলা যাবে না। সংঘ পরিবারের সমর্থনের প্রকৃত ভিত্তি বলতে হিন্দি বলয়ে মুখ্যতঃ নগর ও ছোট সহরের উচ্চবর্ণের ব্যবসাদার-পেশাজীবী পেটি বুর্জোয়া বোঝায়, যাদের সঙ্গে হয়তো বা গ্রামাঞ্চলের উপর তলায় ওঠার জন্য সচল জমিজমার মালিক গোষ্ঠীরাও রয়েছে। এই গণভিত্তির বাইরে বি. জে. পি. র সমর্থন কোথাও কোথাও প্রসারিত হয়ে থাকলেও তার কারণ ছিল মণ্ডল প্রস্তাবে ভয় পেয়ে যাওয়া এবং বিহারের ঘটনায় প্রতিক্রিয়ায় অস্থিতিশীল নির্বাচক মণ্ডলী। এবং আজ হিন্দুদের ফোলানো ফাঁপানো এই কাঠামো টিঁকে থাকার জন্য চায় নিয়ত উত্তেজনার খোরাক, চণ্ডা ধরনের হিস্টিরিয়ার মনোভাব, আর সাম্প্রদায়িক হিংসার মতো কড়া মদের উত্তেজক প্রভাব। তাই সম্ভবতঃ বি. জি. পি. মন্ত্রিসভাগুলির পতন নিয়ে জুয়া খেলা হয়েছে যা ভেঙে দেওয়া না হলে অচিরে বেইজ্জত হয়ে পড়তো। কারণ কিছু দীর্ঘদিন ধরে দেশে স্বাভাবিক প্রশাসনিক অবস্থা চলতে থাকলে প্রমাণ হয়ে যেত কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে বি. জে. পি. শাসনের পার্থক্য তো নেই বরং এটা আরো খারাপ।

আগে ফ্যাসিবাদের এক বিচক্ষণ বিশ্লেষণে তাকে "কেবলমাত্র বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সেবায় নিযুক্ত হাতিয়ার নয়, তাকে একই সঙ্গে পেটি বুর্জোয়া অংশের একটি মিস্টিক ধরনের উদ্বেগ মানসিকতাও বলা হয়।"[৩০] একথা অনস্বীকার্য রামের নামে জিগিরে একটা "মিস্টিক ধরনের মনোভাব" প্রকাশ পেয়েছে এবং যে অকাতর ব্যয়ে তার মহোড়া চলেছে তার থেকে বোঝা যায় এদের টাকা পয়সায় কোন অভাব নেই। কিন্তু ফ্যাসিবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী স্বার্থের সুনির্দিষ্ট যোগসূত্র আছে, সেটাও এখনো ইওরোপে বিতর্কিত বিষয় হয়ে রয়েছে। আর অধিকাংশ ইতিহাসবিদরা পুঁজির বিভিন্ন ধরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাকে জরুরী কাজ বলে মনে করেন। তার সঙ্গে পার্থক্য করা দরকার পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেও। যেমন বোঝা দরকার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ইতালি আর শিল্পোন্নত জার্মানীর মধ্যে পার্থক্য ছিল মৌলিক ধরণের। তা ছাড়া ফ্যাসিবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী স্বার্থের যোগ একান্ত সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটেছিল কিনা, তা নিয়েও বিতর্ক আছে, যেহেতু

"ফ্যাসিবাদ" শব্দটির প্রয়োগের মধ্যদিয়ে সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়। নাকি যোগাযোগ ঘটেছিল পরিস্থিতিগত কারণে, পুঁজিবাদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার তাগিদে।[৪] ভারতীয় পরিস্থিতি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই আলাদা, যেহেতু সম্পত্তিবান শ্রেণীর স্বার্থে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী বিপর্যয়কর কোন আঘাত হানার জন্য আদৌ সচেষ্ট ছিল না বা নয় অথবা দেশে কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশংকাও দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক মন্দার পর জার্মানীতে যেখানে বহু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চোখে "পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য হাতের কাছে পাওয়া শেষ সম্বল" বলে মনে করার অনেক কারণ দেখানো যায়,[৫] অথবা যেখানে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ জনপ্রিয় ধরনের না হলেও, তার বিপরীতধর্মী কিন্তু বিকাশমুখীন একটা চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল. যে কথা ফ্যাসিস্তদের কারাগারে বসে গ্রামশি বাস্তব সম্মত ভাবেই একধরনের "প্যাসিভ রেভোলিউশন" বলে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন, ভারতে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নেই বা ছিল না। এখানে বরং দেখা গেছে নরসিমা রাওয়ের সরকার অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ধরণের নানা পরিবর্তন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই আনতে সচেষ্ট হয়েছেন, যে দৃঢ়তা তাঁর অযোধ্যা নীতিতে প্রকটভাবেই অনুপস্থিত থেকে গেছে। জন সংঘ ও বি. জে. পি. বহু বছর ধরেই স্বয়ম্ভরতা ও পরিকল্পনার নেহরু উত্তরাধিকার বাতিল করার সপক্ষে মত প্রকাশ করে এসেছে, কিন্তু হিন্দুত্বের শক্তিদের প্রচার ও কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিতান্তই কম গুরুত্ব পাওয়ায়, সরকারের নীতি পরিবর্তনে তাদের কোন ভূমিকা ছিল বলে 'বাহবা' দাবি করতে পারবে না। মনমোহন সিংয়ের নয়া অর্থনৈতিক নীতি যে সব ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমর্থন করে (বলা বাহুল্য সমগ্র শ্রেণীভিত্তিতে তাদের সমর্থন পাওয়া যায় নি) তারা একটা হিন্দু দক্ষিণপন্থী শাসনের কঠোর শ্রম বিরোধী নীতি পছন্দ করতে পারে যেহেতু এই ধরনের শাসন পার্লামেন্টে প্রান্তিক ভাবে হলেও বাম ভোটের উপর নির্ভরশীল থাকবে না। অপরপক্ষে যদি হিন্দুত্বের ফ্যাসিবাদী উগ্র অভিযান এখন দৃঢ়পণ বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তাহলে বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির কাছে সাবেকি মধ্যপন্থী বিকল্প অনেক বেশি নির্ভর যোগ্য ও আকর্ষক হয়ে উঠবে, মুখ্যতঃ এই কারণে যে পুঁজিবাদের টিঁকে থাকা ও মুনাফার জন্য দুই যুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন ইতালি ও জার্মানীর তুলনায় বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির কাছে ভারতে ফ্যাসিবাদ ততোটা "দরকারী" হয়ে ওঠেনি।

## আত্মনাশা দোদুল্যমানতা

এই পটভূমিতেই কংগ্রেস এবং বিশেষতঃ তার প্রধানমন্ত্রীর ৬ই ডিসেম্বরের আগে ও পরে দোদুল্যমানতা ; নীতি গ্রহণের অক্ষমতা এতো বিপজ্জনক, এমন কি আত্মহত্যার সামিল হয়ে পড়েছে, যা দলের সংকীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ৬ তারিখের ঠিক পরেই হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের একটা সম্ভবনা অবশ্যই ছিল। বহু উল্লেখিত বামপেয়ী সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় ঘটনার পর কয়েকদিন বি. জে. পি. আত্মরক্ষামূলক একটা নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু নরসিমা রাও, একজন সাংবাদিকের বিচক্ষণ মতের প্রতিফলন হিসাবে বলা যায়, তখন উঠে পড়ে লাগেন "জয়ের মুখ থেকে পরাজয় ছিনিয়ে আনার জন্যে"। নিশীথনের দো-মনা ভাব থেকে নেওয়া ব্যবস্থাগুলিও প্রয়োগ না করা কিম্বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে প্রয়োগ করার জন্য, তাদের সপক্ষে কংগ্রেসের কোন রাজনৈতিক প্রচার না থাকার জন্য, যা শেষ পর্যন্ত মনে হতে থাকে যে, কংগ্রেসও বি. জে. পি.'র মতোই "হিন্দু-তাস" নিয়ে খেলার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নীতির কথা ছেড়েই বলা যায় প্রাথমিক স্তরের বাস্তববাদী রাজনীতিই দাবি করতে পারে যে, এই এই খেলায় যারা দৃঢ় সংকল্প ও গৃহীত নীতিতে অবিচল তারাই কেবল জয়ী হতে পারে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত বড়ো বড়ো দৈনিক পত্রিকাগুলিতে ৬ডিসেম্বরের পর যেখানে বি. জে পি কে পূর্ণ ধিক্কার জানানো হয়েছিল তারাও এখন ঘোলাটে ধরণের মত প্রকাশ করে দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান নিচ্ছে। তাকেই বাতাসে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো বিপজ্জনক ঝড়ের সংকেত বলা যায়।

যে সব নেতারা মনোগত ভাবে নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বি. জি. পি. র থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তাঁরাও যে সুবিধাবাদের এমন এক নিম্ন মানের দিকে আকৃষ্ট হতে পারেন যেখানে বি. জে. পি. র সঙ্গে পার্থক্যটা ঘোলাটে হয়ে আসে। সেটাকেই আমি সমকালের ট্র্যাজেডী বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যার নাম সাম্প্রদায়িকতা-বিদ্ধ সাধারণ বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা, যা দীর্ঘ প্রচেষ্টার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই সাধারণ বুদ্ধির বৈচিত্র্যময় নানা উপাদানের বিশ্লেষণ-সমালোচনা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন, যদি যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন,

ফ্যাসিবাদের এই ভারতীয় সংস্করণের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তো লার কোন তাগিদ থাকে।

ইউরোপে ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ যথেষ্ট ব্যাপক ধরণের অথচ স্থূল জাতীয়তাবাদী, বর্ণবাদী, এবং জার্মানীতে ইহুদীবিরোধী বিদ্বেষ ইত্যাদির সঙ্গে বেশ জড়, মার্জিত গোছের নানা দার্শনিক তত্ত্বের নানা টুকরো জোড়াতালি দিয়ে গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় বুদ্ধিবিত্তাসায় যুক্তিবাদ যাকে বন্ধ্যা অনমনীয়তা বলে সরিয়ে রেখে গত শতকের সস্তা ধরণের কিছু তত্ত্ব ও ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মতবাদ হিসাবে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছে আজকে অবশ্যই তার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বা থাকতে পারে না। কারণ একই ধরণের ধারণা বর্তমানে ইউরোপীয় মননশীলতায় গৃহীত হয়নি। ভারতীয়দের চিন্তার জগতে তার প্রভাব এসে পড়েছে। সংঘপরিবারের মতাদর্শের তাত্ত্বিক নেতারা (যাদের মধ্যে একজন গিরিলাল জৈন অথবা স্বপন দাসগুপ্ত হয়তো পড়ে না) হয়তো বা পোস্ট মডার্নইজমের তত্ত্বের বৈচিত্র্যময় সম্ভবনা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়। সাম্প্রতিক কালে চালু বেশ কিছু অ্যাকাডেমিক ফ্যাশান দেখে বলা যায় যে, হিন্দুত্বের ধারণার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের জন্য কিছুটা কমে এসেছে, যার লক্ষণগুলি স্পষ্ট। সৈয়দের "ওরিয়েন্টালইজ্‌ম্" ঔপনিবেশক ব্যবস্থায় যে ধরণের সমালোচনায় সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তার প্রভাবে একধরণের দেশজ ধ্যান ধারণায় প্রাদুর্ভাব ঘটে, যাকে সংঘপরিবারের যুক্তি থেকে বেশি দূরের নয় বলেই মনে হয়। সংঘ পরিবারের বক্তব্যের মূলকথা হলো হিন্দুত্ব, ইসলাম ও খ্রিষ্টতত্ত্ব থেকে অনেক উন্নত মানের, শ্রেষ্ঠত্ববাদী ধারণায় সূচনা করেছিল। আর একই বক্তব্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বলার চেষ্টা হয়েছে আধুনিক কালের পশ্চিমী অবদান, যথা বিজ্ঞান, গণতন্ত্র অথবা মার্কসবাদের তুলনায় হিন্দুত্বের অবদানগুলি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাদের অনন্যতার মূল ভিত্তি হলো দেশজ উৎসমূল। "জনপ্রিয়" কিংবা "নিম্নবর্গের" দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দেখার প্রবণতার মধ্যে এক ধরণের বিচার বিবেচনাহীন ধারণা প্রাধান্য পেয়ে থাকে বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে বুদ্ধিবিত্তাসা উদ্ভূত যুক্তিবাদকে ঔপনিবেশিক যুগের ক্ষমতাকেন্দ্রিক মননচর্চার ফসল বলে বাতিল করা হয়। সেই যুগ মানসিকতা যেন সব কিছুকেই এমনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ নেই। এই ধারণা র‍্যাডিক্যাল চেতনা সম্পন্ন ইতিহাসবেত্তাদেরও ভুল পথে চালিত করতে পারে।[৬] এই

প্রসঙ্গেই পিওতেরি জেন্টিল যখন ফ্যাসিবাদকে "পজিটিভিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" বলে উল্লেখ করে ছিলেন, অথবা ১৯৩৩ সালে মুসোলিনী যখন "১৮ শতকের বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এবং এনসাইক্লোপেডিস্ট" প্রভৃতির "টেলিওলজিক্যাল" ধারণাকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দেন, তখনকার সময় ও মানসিকতার সঙ্গে বর্তমানকালের তুলনামূলক আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এই ইতালীয় একনায়কের ১৯৩৪ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতার সঙ্গেও বর্তমানের একটা অদ্ভুত প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে যেখানে তিনি "মননশীলতার এবং জাতির পক্ষে বিপজ্জনক এই সব বন্ধ্যা বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য" শেষ করে দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। পরের বছরই হিটলার ন্যুরেমবার্গের নাৎসী সম্মেলনে প্রায় একই ভাবে "চুলচেরা বুদ্ধির" বদলে সাধারণ জার্মানদের—জার্মান লোক—'হৃদয়', 'বিশ্বাস' এবং 'অন্তরের ডাক'কে স্তুতি করে ছিলেন।[7]

"শত্রু" ভাবমূর্তি।

এইটা অবশ্য একটু অন্যরকমের কথা যা হিন্দুদের গণ চেহারায় প্রায় কেন্দ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে (যা ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রেও একই রকম ছিল), যাকে একটা শক্তিশালী ও সম্প্রসারণযোগ্য শত্রু ভাবমূর্তি বলে চিহ্নিত করা যায়। অতীতের নানা বিদ্বেষের ঘটনা থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু উপাদান নিয়ে নতুন কিছু ঘটনার সঙ্গে তাদের মিশেল দিয়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা হয় যেন সেগুলি পুরানো ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তারপর প্রচার মাধ্যমে সর্বাধুনিক কৌশল প্রয়োগ করে দেশময় সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এখানে মুসলমানদের কার্যত: ইহুদীদের সমতুল্য করে দেখানো হয়ে থাকে—অথবা সমকালের শ্বেতকায় বর্ণবাদের দৃষ্টিতে কৃষ্ণাঙ্গদের যেভাবে চিত্রিত করা হয় (বিশেষতঃ সেই সব বিদেশাগত কৃষ্ণাঙ্গরা যারা কোন না কোন কারণে নিম্নমানের প্রাণী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে) সেই ধারণাই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। নাৎসী প্রচারে জার্মানীর ইহুদীদের যে ভাবে সুবিধাভোগী বলে দেখানো হতো, ভারতে মুসলমানদেরও সেই ভাবেই দেখানো হয়, যে অভিযোগ জার্মান ইহুদীদের বুদ্ধিবৃত্তি, পেশাগত দক্ষতা, ব্যবসা বাণিজ্যে চোখে পড়ার মতো অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা নিতান্ত করুণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা কষ্টকর হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতে মুসলমানরা, এলিটত্বের সংজ্ঞা যে ভাবেই দেওয়া হোক না কেন, তাদের

সংখ্যার অনুপাতে এলিটস্তরে প্রায় প্রতিনিধিত্ব বিহীন বলেই মনে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ 'নকলি সেকুলারিস্টদের' 'তোষণনীতি' মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়েছে এই অভিযোগ অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িক আক্রমণের এলাকা প্রসারিত করে এমন পর্যায়ে যায়, যার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি হলো মুলায়ম সিং যাদবকে 'মোল্লা' বলে উল্লেখ করা। "তোষণনীতির" হামেশা দেওয়া দৃষ্টান্তের মধ্যে পড়ে একালে কাশ্মীরে মন্দির ধ্বংসের কোন নিন্দা নকলি সেকুলারিস্টদের মুখে শোনা যায়নি. আর মুসলমান, পুরুষদের বহুবিবাহ বা মুসলমান সমাজের ব্যক্তিগত আইনে অনুমোদিত সেটাও সমালোচনা করা হয় না। মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করা সেটা হিন্দু বা মুসলমান যারই কাজ হোক না কেন অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো এই যুক্তি দেখিয়েই ৬ ডিসেম্বরের ধ্বংসের সাফাই দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। দাঙ্গায় মুসলমানদের যে সব ধর্মস্থান ধ্বংস করা হয়েছে (যেমন ভাগলপুরে) তার কথা অবশ্য কোথাও উল্লেখ করা হয় না। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কাশ্মীরে মন্দির ধ্বংসের কথা যে কোন আলোচনাতেই বিশেষ বিষয় হয়ে উঠেছে. যার মধ্যে নীরব প্রচারের একটা সুপরিকল্পিত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়. যার সঙ্গে বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মগ্লানি, দোষী মানসিকতা চেপে রাখার চেষ্টাও হয়তো থাকতে পারে। মুসলমানদের তাদের অতীতের এবং বর্তমানের আগ্রাসী কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, বহুশ্রুত এই যুক্তি বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদনের পটভূমিতে আশ্চর্য একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ধ্বংস করা মন্দিরগুলি পুনর্নির্মানের জন্য মুসলমানরা উদ্যোগ নিতে চাইলে সেখানে শিবসেনা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, আর ধারাবি অঞ্চলে একদল মুসলমান যেখানে পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল তাদের ছুরিকাহত করা হয়েছে (পাইয়োনীয়ার পত্রিকা, ৯ জানুয়ারী, '৯৩)।

মুসলমান নারী সংক্রান্ত বিলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য রাজীব গান্ধী যখন অযোধ্যার মন্দিরের তালা খুলে দিয়েছিলেন, সংঘ পরিবার সেই অপকীর্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। মুসলমান মৌলবাদীদের তুষ্ট করার নীতির (যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি হয়েছে মুসলমান নারীদের) কথা সব সময়েই উল্লেখ করা হয়, অথচ তার পাশাপাশি হিন্দু-মৌলবাদীদের তোষণের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা হয় না। হিন্দুত্ব মতাদর্শের অনুমিতিগুলিকে এই সিদ্ধান্ত যে ভাবে স্পষ্ট করে তুলে তার বর্ণবাদী চেহারা প্রকাশ করে, সেখানেই রয়েছে এই

প্রশ্নের আসল গুরুত্ব। মুসলমান পুরুষদের বহু বিবাহের বৈধ অধিকারকে প্রায় নিয়মিত ভাবেই উল্লেখ করে বলা হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ; "হম পন্‌চ্‌ হামারে পঁচিশ" যে কথা দ্বিতীয় বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতা (এখন বি. জে. পি সাংসদ) বি. এল. শর্মা বর্তমান লেখকসহ এক গোষ্ঠির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে বেশ জোরালো ভাবেই বলার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ ভারতে নারীর অবস্থা সংক্রান্ত এক রিপোর্টে (১৯৭৫) বহুপত্নীত্বের হার সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব বেশি (যথা ৫·০৬ ও ৪·৩১ শতাংশ)। সুতরাং জন্ম এবং প্রজননের মতো নিছক জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানরা বিপজ্জনক হয়ে উঠ্‌ছে এই কথাটাই বিশ্বাস করতে হবে—যারা এমন কি মরে গিয়েও কবরে যাওয়ার নাম করে এই দেশের পবিত্র জমির একাংশ চিরকালের মতো দখল করে রাখে, যা চিতায় ভস্মীভূত হিন্দুর -মরদেহ কখনো করে না। বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রতিক কালে "বাবর কি আওলাদ" কথাগুলি চালু করার মধ্য দিয়ে বেশ নিপুণভাবে প্রকাশ করে হয়েছে। বাবরের বংশধর, এই পরিচিতিই তার শত্রুতা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট, তার জন্যই প্রভূত ধিক্কার তাদের প্রাপ্য, কোন প্রকৃত তথ্য প্রমাণ হাজির করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, ঠিক যেমন সমস্ত ইহুদীদের উপর ধর্মোন্মাদ খৃষ্টানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার তাদের পূর্বপুরুষদের কাজের জন্য।

সাম্প্রদায়িক হিংসার সরাসরি ক্রূর সমর্থনে হিন্দুত্ব মতাদর্শের নগ্ন চেহারাটা হলো এই ধরণের। এর চেয়ে কিছুটা "নরমপন্থী" অথবা আরো চতুর পরোক্ষ চেহারার হিন্দুত্ব তত্ত্বের কথাও নজরে রাখা দরকার। কারণ তাদের মধ্য দিয়েই হিন্দু রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী তাৎপর্য যথেষ্ট স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। ফ্যাসিবাদ যে সমাজটাকে জয় করতে চায় সেই সমাজ যে সমস্ত আদর্শকে প্রগতিশীল, প্রশংসনীয় বলে মনে করে তার কিছু কিছু উপাদান দিয়ে ধারণাগুলি প্রায়ই আত্মসাৎ করে থাকে। তাই ভার্সাই-উত্তর জার্মানীতে নাৎসীরা নিজেদের কেবল "জাতীয়তাবাদী" বলেই দাবি করে নি, বাইমার প্রজাতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর জোরালো রাজনৈতিক উপস্থিতি মনে রেখেই নিজেদের "সমাজতন্ত্রী" এবং "শ্রমিকদের" প্রতিনিধি হিসেবেও দাবি করে। সংঘ পরিবার একই ভাবে একটা "গণতান্ত্রিক" যুক্তি খাড়া করে নিজেদের প্রকৃত ও অনন্যভাবে "জাতীয়তাবাদী" বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট

হয়েছে। তাদের কথা হলো ভারতে সব সময়েই হিন্দুস্বার্থের প্রাধান্য থাকা উচিত এবং থাকতেই হবে, এবং সেই জন্যই পরে কোন এক সময়ে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলেই ঘোষণা করা উচিত হবে, কারণ সুমারির হিসাব অনুসারে হিন্দুরা ভারতে জনসংখ্যায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় ৮৫ শতাংশ। কিন্তু গণতন্ত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠের শাসন ছাড়াও যুক্তিসঙ্গত ভাবে আরো দুটি বিষয় বজায় রাখতে বাধ্য : সংখ্যালঘুর জীবন ধারা ও বিকল্প পছন্দের অধিকার, এবং এর চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, আজকে যারা রাজনৈতিক অর্থে সংখ্যালঘু তাদের পক্ষেও বৈধভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে শান্তিপূর্ণ ভাবে সরকারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভবনা বজায় থাকবে। এইটা অস্বীকৃত হলে হিটলার, মুসোলিনি (অথবা স্তালিনের) একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের মর্যাদা না দেওয়া অসম্ভব হবে। কারণ তারাও মাঝে মাঝে একটা তালিকা নিয়ে গণভোট ধরণের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে, যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করেছে যা নির্বাচনে রিগিং করে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক তত্ত্ব "চিরস্থায়ী" সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার চূড়ান্ত বিরোধী—কিন্তু সংঘ পরিবারের সংজ্ঞায় যে দল নিজেকে অনন্যভাবে সমস্ত হিন্দুর মুখপাত্র বলে দাবি করতে চায়, সেই বি. জে. পি. নিজেকে এই ভাবেই উপস্থাপিত করতে চায়। এই দাবির মধ্যে নিহিত রয়েছে তার দ্বিতীয় জোরালো বক্তব্য যা সরভাবেই ফ্যাসিবাদকে মনে করিয়ে দেয় সেটা হলো যারাই আর. এস. এস.—বি. জে. পি.—ভি. এইচ পি জোটের নেতৃত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নেবে তারাই হলো প্রকৃত হিন্দু। এই দাবির বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠকে নকলি-সেকুলারদের তোষণনীতি বলে ধিক্কার দিতে হবে। জার্মানীতে হিটলার ও নাৎসীরাও এই ভাবে সমস্ত "বিশুদ্ধ" জার্মাণদের হয়ে কথা বলার দাবি কায়েম করেছিল। আর তার সঙ্গেই কেড়ে নিয়ে ছিল বর্ণগত ভাবে কারা খাঁটি, কোন মতেই যা সম্ভব নয়, সেটি স্থির করার চূড়ান্ত ক্ষমতা।

হিন্দুত্ব "নরম" অথবা "কড়া" যে ধাতেরই হোক না কেন তার যে কোন অংশের জয় মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পক্ষে কোন তাৎপর্য বহন করে সেটা ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে : তাদের জন্য বড়ো জোর বরাদ্দ করা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব, দাঙ্গার যার মধ্যে ঘটে যেতে পারে গণহত্যা তারই নিয়ত আশংকা, এবং তাদেরই প্রতিক্রিয়ায় এই সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম রক্ষণশীল, মৌলবাদী শক্তিসমূহের মাথা চাড়া দেওয়ার

সমূহ সম্ভবনা। মোটামুটি প্রায় একই সময়ে যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলো তারই সমকালে অধ্যাপক মুশির উল-হাসানের উপর বর্বর আক্রমণ মোটেই কাকতালীয় গোছের ঘটনা বা দুর্ঘটনা বলে মনে হয় না—আর উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পুলিস রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত কিম্বা নিষ্ক্রিয় থেকেছে। ৬ ডিসেম্বরের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির জোর বেড়ে গেছে। ভারতে মুসলমানরা মোটেই উপেক্ষা করার মতো সংখ্যালঘু নয়, সেটাও খেয়ালে রাখা দরকার। এই ১২ কোটি মুসলমান ইন্দোনেশিয়ার পরেই কোন রাষ্ট্রে মুসলমান জনগণের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যা। ভারতীয় জনগণের বিপুল আয়তন, বৈচিত্র্য, দুনিয়ার যে কোন দেশের তুলনায় এখানে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণের কাজকে চরম পরস্পর নির্ভর করে তুলেছে। তাই বি. জে. পি দেশের মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতা বোধ গড়ে তুলতে চায় সেটা স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলে এ দেশেও আরো বড়ো মাপের লেবানন কিম্বা যুগোশ্লাভিয়ার মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বহু বাগাড়ম্বরে অন্য যে কোন কারো চেয়ে আমরা বেশি "জাতীয়তাবাদী", সংঘ পরিবারের সেটা প্রমাণ করার নিজস্ব উদ্ভট যে পথ আছে এটি হলো তাদের অন্যতম।

## যৌথ সক্রিয়তার সুযোগ

ধর্মের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের সম্পর্কের মধ্যেই আজকের হিন্দুত্ব ও ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের নাৎসী সংস্করণের একটা মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। নাৎসীরা ধর্মের চেয়ে জাতিসত্তার ভিত্তিতেই পার্থক্য নির্ণয়ে গুরুত্ব দিত। এবং তারা যুব সমাজকে যে নতুন সভ্যতা কায়েম করার ডাক দিত মাঝে মাঝে সেই ডাকে খোলাখুলি খ্রিস্ট বিরোধী সুর শোনা যেত। সংঘ পরিবার সংজ্ঞাগত ভাবেই হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধার কথা প্রচার করতে বাধ্য হয়েছে, যদিও তারা নিজেরাই হিন্দু ঐতিহ্যটাই পুরোপুরি বদলে দিতে চায়। একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে তাদের এই উদ্যোগই তাদের প্রভূত শক্তির উৎস। ঠিক একই সঙ্গে বলা যায় যোগ্য পাল্টা কৌশল নেওয়া গেলে এটাই আবার তাদের প্রধান দুর্বলতায় পরিণত হতে পারে। কারণ হিন্দুত্ব এখন প্রকৃতই বিরাট আকারে হিন্দু বিশ্বাস ও আচার আচরণকে সমজাতীয় ও রূপান্তরিত করতে চাইছে। যা কিছুদিন

আগেও বাবরি মসজিদ ছিল তারই কাছাকাছি মুসলমানদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার ঘটনাকে উৎসাহ দিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনেক নেতা বিবৃতি দিয়েছেন। এই ঘটনাই হলো রূপান্তরের পরিচায়ক। এই এলাকাকে ভ্যাটিকানের মতো স্বতন্ত্র, বিশেষ ধরণের শহরে পরিণত করার জন্য ভি. এইচ. পি. র উদ্যোগে এই বক্তব্যের যে রেশ শোনা যায়, তার মধ্যেই এই উদ্যোগের প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু রাম ও অযোধ্যা নিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ যা দাঁড় করাতে চায় বিরাট ও বিপুল বৈচিত্র্যময় হিন্দু সমাজের সঙ্গে তার কোন রকমের যোগ ছিল না। রাম হিন্দুদের সর্বোচ্চ দেবতা এবং অযোধ্যা পবিত্রতম তীর্থস্থান, এই দাবিতে সকলকে সামিল করতে দেশের আঞ্চলিক, বর্ণ, সম্প্রদায়, স্ত্রী পুরুষ ও শ্রেণীগত সমস্ত পার্থক্য মুছে ফেলতে সকলকে একজোট করার চেষ্টা এর আগেও কেউ করে নি। এটা এক অভিনব ব্যাপার। কোটি কোটি হিন্দু যেটা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করে, এই পটভূমিতে তার ঐতিহাসিক নির্ভুলতা নির্বিশেষে—হিন্দুধর্ম হলো চরম সহনশীল, উদারবোধ-সম্পন্ন একটা ধর্ম। সেটা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে ধ্বংস, হত্যা, রাজনৈতিক ক্ষমতা বেদখলের একটা হাতিয়ার করে তোলার চেষ্টা, সেটাই হলো সবচেয়ে বড়ো এক সমস্যা। আমাদের দেশে ধর্মীয় উদারতার ঐতিহ্য চরম বৈচিত্র্যময় কেবল নয়, তার শিকড়গুলি জনচিত্তের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে যেমন ধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্ব, তেমনই মাঝে মাঝে র‍্যাডিক্যাল ধরণের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে ফেলার প্রবণতা, পৌত্তলিকতা বিরোধিতা, ভক্তি-সুফি 'সন্ত' 'পীর'দের প্রতি গভীর আকর্ষণ, যাদের কিছু বক্তব্য সেই বাউল গানের মধ্যে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর তোমায় খুঁজবো কোথায়, কারণ তোমার পথ ঢেকে রেখেছে মন্দির আর মসজিদে, পুরোহিত আর মোল্লায়—আবার তেমনই রয়েছেন রক্ষণশীল কিন্তু গভীরভাবে সহনশীল রামকৃষ্ণ, যাঁর চোখে হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টানের পার্থক্য হলো 'ওয়াটার', জল আর পাণির মধ্যে পার্থক্যের মতো। এই রকম দিনেই আমাদের মন চলে যায় ৪৫ বছর আগেকার এক মর্মান্তিক ঘটনায়, যখন একজন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ আততায়ীর গুলীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় উচ্চারণ করেছিলেন "হে রাম", আর সেই আততায়ী ছিল সংঘ পরিবারের ঘরাণায় বড়ো হয়ে ওঠা এক যুবক। মহাত্মা গান্ধীর যে রাম ছিলেন ঈশ্বর ও আল্লার মিলিত রূপ, তাঁর সঙ্গে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী রামের ব্যবধান সমুদ্র প্রমাণ।

## সেকুলারইজ্‌মের নানা অর্থ

সেকুলারইজম শব্দের নানা অর্থ আছে এবং হতে পারে, তার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সত্যই বিরাট। সেখানে গভীরভাবে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ থেকে মুক্তমনা নাস্তিকেরও স্থান হতে কোন বাধা নেই।[৮] তাঁদের মধ্যে ঐক্যের সর্বনিম্ন মান হলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ধর্মীয় রাষ্ট্র ধারণার চূড়ান্ত বিরোধিতা। সুতরাং বর্তমানে সংঘ পরিবারের বিরোধিতায়অ-ধর্মীয় সেকুলারিস্টদের দেশের জীবনের "মূলস্রোত" থেকে "বিচ্ছিন্ন" হয়ে পড়ার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বুক চাপড়ানোর মহোৎসা দিয়ে নিজেদের বিশ্বহিন্দু পরিষদ বা মুসলমান মৌলবাদীদের তুলনায় আরো বেশি, "খাঁটি" হিন্দু বা মুসলমান প্রতিপন্ন করার কোন কসরৎ দেখানোর প্রয়োজন নেই।[৮] কারণ যা দরকার তা হলো মৌল মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে যাদের মধ্যে নানা বিষয়ে গুরুতর মতভেদ রয়েছে তাঁদেরও একযোগে কতগুলি কাজ করতে পারা। সেই সম্ভবনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, যে কথা দ্রৈৎস্কি একদাভিন্নপরিস্থিতিতে সকলের সাধারণবিপদেরমুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের "অভিযান স্বতন্ত্র ভাবে হতে পারে, কিন্তু আঘাত হানতে হবে একত্রে"।[৯]

হিন্দুত্বের শক্তিরা যে এই ঐক্যকে ভয় পায় তার প্রমাণ হলো সেকুলারইজ্‌মকে, সব রকমের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে হিন্দু বিরোধী বলে চিহ্নিত করার ব্যগ্রতা। একই সঙ্গে তারা সেকুলারইজ্‌মের তত্ত্বকে "নেহরু-আমলের" রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহু ধরনের সুবিধাবাদী পাপ, চরম আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণের, নানা সময়ের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার সমার্থক করে দেখাতে চায়। এখানেও দেখা যায় বুদ্ধিজীবীমহলের সমকালীন প্রবণতা এই সব সমালোচনাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। কারণ এখন প্রায়ই ধরে নেওয়া হয় যে সেকুলারইজ্‌ম হলো বহু সমালোচিত বুদ্ধি বিভাসা উদ্ভূত যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদের ফসল, যা ঔপনিবেশিক যুগের চিন্তা ভাবনার সূত্রে এদেশে আমদানি করা হয়েছে এবং পরে পশ্চিম আদলে গড়ে তোলা নিপীড়নবাদী জাতীয় রাষ্ট্র ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। অথচ এমন কি ইউরোপেও সেকুলারইজ্‌মের উদ্ভবকাল আরো দু'শ বছর পিছিয়ে দেওয়া দরকার, যখন ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মীয় যুদ্ধের সূচনা করেছিল (যাদের বৈধভাবে আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করতে পারি)। রাষ্ট্র থেকে

ধর্মকে স্বতন্ত্র করার ভিত্তিতে যাঁরা প্রথম সহনশীলতার কথা বলেছিলেন তাঁরা কেউই যুক্তিবাদী মুক্ত চিন্তার মানুষ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রীষ্টধর্মে বিশেষভাবে অনুরক্ত অ্যানাব্যাপ্‌টিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, নিপীড়ন, বিধর্মীদের উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনা এবং যে কোন ধরণের রাষ্ট্রীয় পোষকতা ভিত্তিক ধর্ম হবে মানুষের প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী।

অন্য অনেক দেশের মতো ভারতেও যেখানে বহু ধরণের ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসৃত হয়ে থাকে, সেখানে সব ধর্মের বিপুল সংখ্যক ধার্মিক মানুষদের বাণী কিম্বা উদার ধার্মিকতার জন্য খ্যাতিমান শাসকবর্গের, যাঁদের মধ্যে আকবর সর্বাগ্রে স্মরণীয়, নীতির গণভিত্তির চেয়েও বিভিন্ন ধর্মমতের সহাবস্থানের ভিত্তি আরো অনেক বেশি প্রশস্ত ও গভীর। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন-গুলির গভীরেই তার শিকড় প্রোথিত. সেখানে বিরোধ মাঝে মধ্যে ঘটতে পারে, কিন্তু অচিরেই আবার নানা মতের পরস্পর নির্ভরতার দিকে সমাজ ফিরে যায়, যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শক্তি সে কাজ করার সুযোগ পায়, যদিও তার পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে।[১০] অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ যদি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রাকে ভেঙে তছনছ করে দিতে পারে, তাহলে যৌথ সক্রিয়তায় শোষণ বন্ধ ও মানুষের নানা অভাব পূরণের সমস্ত উদ্যোগ স্তব্ধ হয়ে যায়। সেটি ঘটে থাকে দুটি মৌলিক ভাবে: সমস্ত মেহনতী মানুষ ও নিম্ন-বর্গের সমস্ত গোষ্ঠির সংগ্রামী ঐক্য চুরমার করে দিয়ে; এবং অনমনীয় সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার মধ্যে ব্যতিক্রমবিহীনভাবে সমজাতীয়তার বৈশিষ্ট্য-গুলি আরোপ করে, অর্থাৎ সব কিছু ছাঁচে ঢালাই করে। এই ধরণের নিশ্চিত সমজাতীয়তা অনিবার্য ভাবেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি ও স্বার্থ সমূহের প্রাধান্য কায়েম করে—হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের পটভূমিতে যেটা স্পষ্টতই হয়ে উঠবে উচ্চবর্ণের এলিটদের প্রাধান্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে যথেষ্ট সীমিত ধরণের যে সব ব্যবস্থা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছিল তাদের কার্যকর করার সামান্যতম উদ্যোগকে হিন্দুত্ব-বাদীদের আগ্রাসী নীতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। হিন্দুত্বের কর্মসূচী ও কার্যাবলীতে সুনির্দিষ্ট আর্থ সামাজিক বিষয়ে চোখে পড়ার মতো নীরবতা (রাম দাবির রুটি অনুষঙ্গ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করার বদলে সেই দাবির কথা বেমালুম ভুলে যাওয়ার লক্ষণ প্রকট হলো) এমন এক ক্ষেত্র যেখানে

কার্যকর সেকুলার হস্তক্ষেপ করার জায়গা করে নেওয়া যায়, যদি অবশ্য ভারতীয় বাম ঐতিহ্যে বহু পুরানো অভ্যাসের অঙ্গ হিসাবে "অর্থনৈতিক" ও "রাজনৈতিক" বিষয়গুলিকে "সাংস্কৃতিক" কিম্বা "মতাদর্শগত" বিষয় থেকে বাতিল করার রীতি ত্যাগ করা হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার কেবল সেমিনার ও মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না, সেই সবের গুরুত্ব যতোই থাক না কেন, ঠিক যেমন দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রাম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মতাদর্শের প্রশ্ন এই যুক্তিতে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না যে মানুষের বস্তুগত স্বার্থের দিক ও "প্রকৃত" শ্রেণীগত পরিচয় শেষ পর্যন্ত নিজের থেকেই নিজেদের জাহির করবেই।

ইউরোপে ফ্যাসিস্তদের যুগের কথা চিন্তা করলেই মনে যে কঠিন ও নৈরাশ্যজনক ভাবোদয় ঘটে আজ প্রায় সর্বত্র আত্মাভিমানী শক্তি সমূহের মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা দেখে সেটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ৩০ কিম্বা ৪০-এর দশকের স্মৃতি কেবল ঝটিকা বাহিনীর, বিপর্যয়, বন্দি শিবিরের স্মৃতি নয়, দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার মধ্যে তখনই যে সব অসম্পর্কিত নয় এমন ধরণের বিকৃতি ঘটেছিল, যার সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে সেই বিকৃতি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে, তাদের স্মৃতিও মনে জেগে ওঠে। তার মধ্যে কেবল স্তালিনীয় সন্ত্রাস নেই সেখানে রয়েছে ফ্যাসি বিরোধী ঐক্যবদ্ধ ও বিজয়ী সংগ্রামের স্মৃতি, আছে পপুলার ফ্রন্ট, আর যে বার্সিলোনা গত বছর দূরদর্শনে দেখা গেছে তার চেয়ে ভিন্ন ধরণের অন্য এক বার্সিলোনার স্মৃতি। প্রজাতন্ত্রী স্পেনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে যারা লড়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা ও রণধ্বনি থেকে বোধ হয় প্রেরণা ও প্রাণশক্তি সংগ্রহ করার তাগিদ এসে গেছে: নো পাসারান, ফ্যাসিবাদকে পেরোতে দেওয়া হবে না।*

---

* বোম্বাইয়ের বিখ্যাত "ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইক্লি" পত্রিকার, ২৮শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ৩০ জানুয়ারী ১৯৯৩তে প্রকাশিত সুমিত সরকারের "দি ফ্যাসিজম্ অব দি সংঘ পরিবার"-র অনুবাদ।

—সম্পাদক।

## টীকা

১। ৬ ডিসেম্বরের পর কোন একটা সময়ে যখন দেশের ২১৩ স্থানে কারফিউ জারী করা হয়েছিল, যাতে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের বিপুল দুর্গতি ঘটে তার মধ্যেও কানপুর, ভোপাল, সুরাট, বোম্বাই ও অন্য অনেক জায়গায় উচ্চ মানের এই আদর্শ দেখা গিয়েছিল। দ্রষ্টব্য "হু আর দি গিলটি", পিপিল্‌স্‌ ইউনিয়ন অব্‌ ডেমোক্রেটিক রাইট্‌স্‌ দিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৯২

২। সংঘ পরিবারের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য তপন বসু, প্রদীপ দত্ত, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার ও সম্বুদ্ধ সেন রচিত "খাকি সার্টস্‌ এ্যাণ্ড স্যাফ্রন ফ্ল্যাগ্‌স্‌; দি পলিটিক্স অব্‌ হিন্দু রাইট", ওরিয়েন্ট লংম্যান্‌স্‌, দিল্লী, ১৯৯৩

৩। ড্যানিয়েল গুয়েরিন : ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এ্যাণ্ড বিগ বিজ্‌নেস, ১৯৩৬, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪, পৃঃ ১০

৪। গুয়েরিন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, অ্যালান এম. মিলওয়ার্ড রচিত "ফ্যাসিজ্‌ম এ্যাণ্ড দি ইকনমি" নিবন্ধ ওয়াল্টার ল্যাকুয়েরে সম্পাদিত "ফ্যাসিজ্‌ম্‌; এ রিডার্স গাইড" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, ১৯৭৬, পেঙ্গুইন সংস্করণ ১৯৭৯

৫। মিলওয়ার্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৪

৬। গৌতম ভদ্র ১৯৯১ সালে একটি বাংলা সাময়িক পত্রে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রথম করসেবা আন্দোলনে নিম্নবর্গের নিজস্ব অস্তিত্ব জাহির করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ লক্ষ্য করেছিলেন এবং সাধ্বী ঋতাম্বরার বক্তৃতায় সেই সুর ধ্বনিত বলে মনে করে ছিলেন। "সাবালটার্ন স্টাডিজ" সম্পাদক মণ্ডলীর আরেক সদস্য দীপেশ চক্রবর্তী সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে দাবি করেছেন, বুদ্ধিবিভাগ-উত্তর পশ্চিমদুনিয়ার "বো হুকুম" বুদ্ধিজীবীরা যে সব উপাদানের নিন্দা করেন, ধিক্কার দেন, তাদের মধ্যে সৃজনশীল উপাদান কোথায় কোথায় রয়েছে খুঁজে দেখা দরকার। এইসব বুদ্ধিজীবীদের দলে যেমন মেকলে আছেন তেমনই মার্ক্সও রয়েছেন। দ্রষ্টব্য "নাইয়া" ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, "বারোমাস" অক্টোবর ১৯৯২

৭। জিভ্‌ স্টার্নহেল, "ফ্যাসিস্ট ইডিওলজী" ল্যাকুয়ার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৩৪ (উদ্ধৃতিটি মেরিল'র), গুয়েরিন, ঐ পৃঃ ৬৫, ১৬৮–৬৯, ১৭১

৮। সুরাটের যে যুবকবৃন্দ হিন্দুদের নামে মুসলিম নারীদের ধর্ষণের ভিডিও ছবি তুলেছে তাদের থেকে এই সব মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের গোড়ার কথা থেকে অনেক কম বিচ্ছিন্ন। বোম্বাই শহরে বহু ধনী পরিবারে সান্ধ্য আসরে ধর্ষণের এই ভিডিও ছবি সোৎসাহে প্রদর্শিত ও উপভোগ করা হয় বলেই আমার জানানো হয়েছে।

৯। লির্ ট্রট্স্কি, "ফর এ ওয়ার্কার্স ইউনাইটেড ফ্রন্ট এগেনস্ট ফ্যাসিজ্‌ম্" ডিসেম্বর ১৯৩১ দ্রষ্টব্য "দি স্ট্রাগ্‌ল্ এগেনস্ট ফ্যাসিজ্‌ম্ ইন জার্মানী", পেঙ্গুইন ১৯৭৫, পৃঃ ১০৬

১০। পাক্ষিক "ফ্রন্টলাইন" পত্রিকায় জানুয়ারী ১৫, ১৯৯৩, পৃঃ ৬০-৮১য় ৬ ডিসেম্বরের দাঙ্গার পরেও সাধারণ মানুষের আন্তঃ সাম্প্রদায়িক সখ্যতায় বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি আবার জোড়া দেওয়ার আবেগ-উদ্বেল বহু ঘটনার বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

## বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান

# ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লি :

( একটি সরকারী সংস্থা )

২৩বি নেতাজী সুভাষ রোড ( ৪র্থ তল ) কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ, এম. টি. / মহিন্দ্র / এসকর্টস / মিৎসুবিশি ট্রাকটরস।
খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।
গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট।
ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে ( ফোন নং ২০-২৩১৪/১৫ ) যোগাযোগ করুন।

## জেলা অফিস :

| | | |
|---|---|---|
| ২৪-পরগণা ( দক্ষিণ ) | : | ১৪, নিউ তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮ |
| " ( উত্তর ) | : | ডাক বাংলো মোড়, বারাসাত |
| | | ২৭ যশোর রোড, হাটখোলা বাস স্টপেজ |
| হুগলী | : | সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর. আরামবাগ, হুগলি |
| বর্ধমান | : | মেমারি, বর্ধমান |
| | | ৫নং রামলাল বোসলেন, রাধানগর পাড়া |
| বাঁকুড়া | : | লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর |
| মেদিনীপুর ( ওয়েষ্ট ) | : | সুভাষ নগর, মেদিনীপুর |
| মেদিনীপুর ( ইষ্ট ) | : | পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া |
| বীরভূম | : | সিউড়ি, বড় বাগান |
| মালদা | : | মনস্কামনা রোড, মালদা |
| মুর্শিদাবাদ | : | ১৬, শহীদ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, বহরমপুর |
| জলপাইগুড়ি | : | 'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি |
| দার্জিলিং | : | বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি |
| কুচবিহার | : | এন, এন, রোড, কোচবিহার |
| পুরুলিয়া | : | নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া |
| নদীয়া | : | এম. এম. ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া |
| | : | ১৪নং আর. এন টেগর রোড, |

# মাছ

নন্দ চৌধুরী

ঘুঁষকে রাত থাকতে থাকতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল ফটিক।

চ্যাটাই এর উপর একতাল কাদার মত বৌটা ঘুমোচ্ছে—কাপড় চোপড় এলোমেলো। তার ওপাশে বাচ্চা দু'টো গুটিয়ে আছে কেন্নোর মত। একটা তো গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

ঘুমোচ্ছে ওরা ঘুমোক। এখন ডেকে লাভ নেই। সন্তর্পণে আগড়টা লাগিয়ে বেরিয়ে আসে সে।

আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ফুটেছে। শেষ ফাগুন-বাতাসে একটু কামড়ানি ভাব আছে। গামছাটা মাথায় গায়ে জড়িয়ে এগিয়ে চলে সে। মানুষজন ঘুম ভেঙে ওঠার আগেই তাকে পৌঁছোতে হবে।

মাঠের মাঝে দলপুকুর। সেখানে তার সটকা পোঁতা আছে। মোটা কঞ্চির ডগায় সুতো বেঁধে ছিপ তৈরি হয়েছে। বঁড়শিতে বেঁধান আছে জ্যান্ত পুঁটি মাছ।

দলপুকুরের চারিধারে বড় বড় দল ঘাসের জটলা। মাঝবরাবর এক কোমর জল। সে জলে লুকিয়ে থাকে চ্যাং গড়ুই মাগুর কই শিং শোল ইত্যাদি হরেক রকম জিওল মাছ। এ পুকুরে মাছ কেউ ফেলে না। মাঠে ভেসে আসা মাছ ঢুকে এখানে আশ্রয় নিয়ে আপন মনে বাড়ে। তাই এ পুকুরটার বাবুদের তেমন কড়া নজরদারি নাই। দল পরিষ্কার করে মাছ ধরার হাঙ্গামাও খুব। জল আরও কমে এলে বাবুরা বাউরিপাড়ায় খবর দেয়। তারা এসে জল তোলপাড় করে পুকুরের পাঁক অবধি ঘেঁটে ফেলে। তখন জলের নিচের ছোট ছোট মাছ সে পাঁকজলে খাবি খায়। মাগুর শিং এসব পাঁকের মাছ অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায়। তখন কেউ ঘুনজাল, কেউ পলুই নিয়ে সেসব মাছ ধরে ডাঙায় তোলে। মাছের সাথে সাথে থাকে ছোট বড় নানান জলজ সাপ—ঢোঁড়া, মেটেলি এইসব। এদের বিষ নেই—তবে কামড়ে জ্বালা খুব। বাউরিরা কুঁচলেপাতা কানে গুঁজে জলে নামে। এদের বিশ্বাস, কুঁচলে পাতা শরীরে থাকলে ঢোঁড়া সাপ কামড়ায় না।

তা দু'একজন কামড়ও খায়—গল গল রক্ত বার হয় পা বা উরু থেকে। সাপটাকে মেরে ক্ষতস্থানে চুন লাগাতে হয় তখন।

বাবুরা বসে থাকে ডাঙায় বাঁকড়া কদুই গাছটার নিচে। সঙ্গে মুড়ি আর হাঁড়ি পাল্লা। সতর্ক দৃষ্টি রাখে মাছ নিয়ে কেউ পুকুর ছেড়ে না পালায়। মাছ ধরা হলে উঠে এসে ভাগ দিয়ে যায়। ছোট মাছ অর্ধেক অর্ধেক। শোনা বা শিং মাগুর শোল কই এসব সিকি ভাগ পাবে ধরিয়েরা—বারো আনা বাবুরা। দেখতে দেখতে মুড়ি ভর্তি হয়ে যায়। বাউরিরাও সেয়ানা কম নয়। কেউ পরনের লেংটির ভিতর মাছ লুকিয়ে রাখে—যাতে ভাগ না দিতে হয়। কেউ বা মাছ মেরে কাদায় পুঁতে রাখে চিহ্ন দিয়ে। বাবুরা চলে গেলে পরে এসে তুলে নিয়ে যায়। চিহ্ন হারিয়ে গেলে সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পরে পচে ভেসে ওঠে—তখন কাক চিলে খায়।

ফটিক এই জন্যই এ পুকুরটাকে বেছে নিয়েছে। দলের মাঝে মাঝে ছিট তালুকের মত পরিষ্কার জায়গা। সন্ধ্যার পর ফটিক সেখানে সটকা পেতে দিয়ে চলে যায়। ছিপের গোড়াটা শক্ত করে কাদায় পোঁতা থাকে—যাতে মাছ হেঁচকা টান দিয়ে ছিপ টেনে নিতে পারে। কোনদিন মাছ টোপ গিলে বসে থাকে—কোনদিন কিছুই থাকে না। শুধু বঁড়শিতে গাঁথা পুঁটি মাছটা মরে পেট উল্টে ভাসে।

জমিজমা কিছু নেই ফটিকের। তার ঠাকুর্দা, তার বাপ সবাই সাজুলী বাড়ির বাঁধা মুনিশ ছিল। চাষের শুরুতে এককেশ ধান পেত। আবার পৌষ মাসে ধান গোলায় তুলে দিয়ে আর এক কেশ ধান পেত। চড়ক সংক্রান্তি আর পুজোয় আট হাত্তি কাচা আর একখানা চার হাত গামছা। মেয়েরা-ঝি এর কাজ করত—দুধ বেচত। পোষা ছাগল বেচত। ক্ষেত খামারে ছিল শুষনি শাক, হিঞ্চে শাক, পুকুরে গেঁড়িগুগলি ঝিনুক—মাঠে চুনো মাছ। পেট ভরা খাবার জুটত। একটু বড় হতে ফটিকও তেলি ঘরে ঢুকেছিল রাখাল হয়ে। সেখানে জলখাবার, দুপুরের খাবার সব পেত। রাত্রে এক থালা ভাত নিয়ে ঘরে ফিরত।

ঠাকুর্দা, বাবা একে একে মরে গেল। সাজুলীরাও কি একটা ব্যবসার কাজে শহরে গিয়ে, বাড়ি করে সেখানেই রয়ে গেল। বেচে দিল গাঁয়ের জমিজমা। তার আশ্রয় গেল। তাতে অবশ্য খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়। কারণ আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে নানারকম চাষ বাড়ছে। কাজের

সুবিধেও বেড়েছে। করব বললে কাজের অভাব নেই। অসুবিধেটা হোল অন্য জায়গায়। ছোটবেলা থেকেই ফটিক খানিকটা রোগা পটকা। বাপ ঠাকুর্দার মত তেমন খাটতে পারে না। সবদিক বিবেচনা করে সে বেছে নিয়েছিল গাড়ি চালাবার ব্যবসা। বাড়ির দু'টো বাছুর দামড়া হয়েছিল। সে দু'টোকে না বেচে গাড়ি বাইতে শেখাল। দোকানের মাল আনতে, কারুর বাড়ি তৈরির ইট বালি বইতে টুকটাক বেশ কাজ পাওয়া যেতে লাগল। মাঠে কাজ করার চেয়ে খাটনি কম, কিন্তু আয় মন্দ নয়। গরুর খাই-খরচা মিটিয়ে সংসার চলে যেত। কিন্তু ফটিক আজকাল দু'দিক দিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে। দিনদিন জিনিসের দাম যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লেগেছে তাতে খরচা কত আর কমান যায়? কমাতে হয়েছে গরুর বরাদ্দও। এদিকে গরুগুলোর বয়সও বেশ হয়েছে। এবার বদল না করলেই নয়। কিন্তু কোত্থেকে করবে সে? ফলে গাড়ি মাঝে মাঝেই কামাই হচ্ছে।

সাতে পাঁচে ফটিকের পেটেও টান পড়ছে। মাঝে মাঝে সটকায় দু'একটা মাছ গাঁথতে পারলে সেদিনটা রক্ষা হয়। না না, নিজেরা কক্ষনো তারা খেতে পায় না সেসব মাছ। পেট আঁচলে লুকিয়ে চলে যায় বাঁড়ুজ্জে নয়তো রায়বাড়ি। মাছটাও টাটকা আর বাজার থেকে সস্তাও কিছুটা। সুতরাং বেচতে অসুবিধা হয় না। সে টাকা দিয়ে চাল আসে। ফ্যানভাতের সঙ্গে আমড়ার টক হাপুস হাপুস করে খায় সকলে।

বেশ গা চালিয়েই চলছিল ফটিক। আর মনে মনে বলছিল, হে মা মনসা, হে বাবা ধর্মোরাজ, একটা বেশ বড় সড় মাছ সটকায় গেঁথে দিও বাবা—যেন কেজি দু'য়েক চাল হয়। দু'দিন চলে যাবে। গরুগুলোও দিন কতক জিরেন পাবে। আজ কাল বাদ দিয়ে পরশু তাহলে গাড়ি বাইতে পারবে। হে মা মনসা···

সটকাটা হাত দিতেই বেশ ভারী বোধ হোল। জয় মা মনসা—স্বচ্ছন্দে তুলে ফেলল বেশ বড় সড় একটা শোল মাছ। আঃ, ডাঙায় উঠেও কি দাপাদাপি। কালো কুচকুচে গায়ের রংটা। তাড়াতাড়ি গামছাটা চাপা দিয়ে কায়দা করে বাগিয়ে ধরে। আনন্দে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি পৌঁছোয় সে। তখন সবে ভোরের কাক পক্ষী ডাকতে লেগেছে।

মেনকা নাই। সে মাগি বোধহয় হাগতে গেছে। একটা ছেলে মুতে বিছানা ভিজিয়ে পড়ে আছে। আর একটা ছেলে বসে বসে চোখ রগড়ে মা মা

করে কাঁদছে। এতবড় মাছটা দেখাবার মত কাউকে না পেয়ে ফটিক ক্ষণেকের জন্ত হতাশ হয়। রাগ হয়ে যায় তার। প্রতিবেশীদের জানানোর উপায় নাই। কোথায় ধরলে, কী বিত্তান্ত-এসব জেরার মুখে পড়লেই হয়েছে। বাবুদের কাছে খবর চলে যাবে ঠিক। তারপর···সে দুর্দৈবের কথা আর ভাবতে পারে না ফটিক।

যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এটাকে এখন চালান করতে পারলেই ভাল। কিন্তু এতবড় কৃতিত্বটা মেনকাকে না দেখিয়ে যেতেও মন চাইছে না।

সে এল একটু পরেই। তারপর মাছটাকে বুকে চেপে ধরে চটকাতে চটকাতে নাকি কান্না জুড়ে দিল, এত সোন্দর মাচটা তুমি বিচতে পাবে নাই গ, আমড়া দিয়ে শোল মাচের টক, সেই কোন ছুটু বেলায় খেয়েছিলম, তার সোয়াদ এখনো মুখে লেগে আছে। আজ যদি ভগমান জুটিয়েছে—তা ঘরে খাও কেনে। ছানাভলা কুহুদিন খায় নাই এমন মাচ। বিচতে দুব নাই আমি।

ফটিক তাকে ভোলায়, দূর ক্ষেপি, শুধু মাচটা খাবি কি দিয়ে? ঘরে কি চাল আছে যে ভাত হব্যাক। আগে ঘরে ভাত হোক, তখন খাবি এমন মাচ। আরো কত পাব এমন।

প্রায় জোর করেই মাছটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল ফটিক। যেতে যেতে ভাবে, মেয়েলোকের বুদ্ধি! ঘরে চাল নাই, তার মাচ। না হলে তারও কি সাধ যায় না, এমন মাচটা ঘরের সবাই মিলে খেতে? ভগবান কি সে সুদিন দিবেন কখনো।

'বাড়ুজ্জে' গিন্নী তক্ষণে একগোছা বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে যাবার তোড়জোড় করছে। ফটিককে দেখে, এক গাল হেসে বলে, কিরে ফটকে—সাত সকালে কী ব্যাপার?

ফটিক হাসতে হাসতে গামছা জড়ানো বিশাল শোলমাছটা বার করে। উঠানে নামাতেই সেটা তখনও সাপের মত এঁকে বেঁকে দৌড়তে চেষ্টা করে। গিন্নী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, বাবাঃ, এযে বিরাট শোল মাচরে। কোথায় পেলি-বাবা?

—সরকারী কেনেলে গলুই-এ ধরেছি। তা লিবেন ত' দেখুন। কুড়ি ট্যাকা দাম লাগবে কিন্তুক!

বাঁড়ুজ্জে গিন্নী চিন্তায় পড়ে। কর্তা নেই। গ্রামের বাড়িতে আশি

বছর বয়েসী শশুর শুয়ে। তাঁকে দেখাশোনা করতে-কর্তাকে ঘনঘন সেখানে যেতে হচ্ছে।

ডাক্তার ওষুধেও খরচ হচ্ছে বিস্তর। টাকা পয়সা হাতে নেই তেমন। কিন্তু মাছটা দেখে ছাড়তেও মন চাইছে না। দোনামোনা করতে করতে গিন্নী বলে, তোরও যেমন কথা ফটকে। চুরি করা মাছ, তার কিনা কুড়ি টাকা দাম! শোন, হাতে পয়সা নেই আজ। চাল নিবি?

—তা ক্ষেতি কি! পয়সা দিয়ে আমি তো চালই কিনব।

—বেশ, তবে দুসের চাল নিয়ে যা।

—না ঠাকরুন, তিন সের দ্যান।

কিছুক্ষণ দরাদরি চলে। ফটিক খাটিকটা মরীয়া। সবাইকার জিভের জল ফেলা মাছ! এত সহজে ছাড়া যাবে না। শেষতক ফয়সালা হয়, ফটিক আজ দুসের চাল নিয়ে যাক। একসের চাল বাকি রইল অন্য কোনদিন নিয়ে যাবে।

তাই সই। দরাদরি নিয়ে বেশি ক্যাচলাচ্চি করতে সাহস হয় না। একটা গোল হলেই মুস্কিল।

চার আনার বিড়ি কিনে ফটিক যখন বাড়ি ফিরল, তখন সেখানে কেউ নেই। মেনকা গেছে কাঠ কুড়োতে। ছেলেরা খেলতে গেছে। আগড় খুলে পুঁটলিশুদ্ধ চালটা রেখে দিয়ে ফটিক বেরুল গরু নিয়ে। হাতে একটা ঝুড়ি। দু'চার দাদ গোবর পেলে কুড়িয়ে নেবে। ঘুঁটে বেচেও দু'চারটাকা রোজগার করে মেনকা।

ধীরে ধীরে রোদ বাড়ে। সকালের সেই শিরশিরে আমেজটা আর নেই। মাঠের ঘাস এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। মাস খানেকের মধ্যেই সব জলে যাবে। তখন গরু রাখা দায়। চরাতে নিয়ে যেতে হবে সেই কেনেলের পাড়ে।

কিছুক্ষণ গরু চরিয়ে ঘরে ফেরে সে। মেনকাও ফিরেছে। উনুন ধরানোর তোড়জোড় চলছে। ছেলেগুলো তাদের মাকে ঘিরে বসে আছে। খেতে দাও খেতে দাও করে বিরক্ত করা শুরু করেছে। খিদে ফটিকেরও পেয়েছে। পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়ি চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু উপায় নাই। উনুন ধরবে, ভাত ফুটবে তবে খাবার ব্যবস্থা। তার আগে ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই। ফটিক গরুগুলোকে গাছতলার ছায়ায় গোঁজে বেঁধে উদাস নয়নে একটা বিড়ি ধরায়।

কে যেন একজন এসে ফটিককে খুঁজছে। ফটিক এসে দেখে বাঁড়ুজ্জেদের ছেলেটা।

"ফটিক, তোকে মা ডাকছে। একবার তাড়াতাড়ি চল।"

"ক্যানে?"

"চল না—গেলেই দেখবি।"

এই বাঁড়ুজ্জেদের বাড়িতেই সে সকালে মাছ দিয়ে এসেছে। কিছু গোলমাল হোল না তো!

উদ্বেগ আশংকায় দুর দুর করতে করতে সে হাজির হোল বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে। সেখানে তখন একটা থমথমে আবহাওয়া। মেয়েদের কেউ কেউ কান্নাকাটি করছে। বাঁড়ুজ্জ্যে কর্তাকে দেখা গেল না। গিন্নীর মুখও থমথমে। ফটিক যেতেই বলল, এসেছিস। আহা, বাছা তোদের থাকে। শোন, মাছটা নিয়ে যা।

ফটিক অবাক হয়ে গেল। সকালে দু'সের চালও দিল—আবার মাছটাও ফেরৎ দিচ্ছে!

গিন্নী রান্নাঘর থেকে একটা এলুমিনিয় আমবাটিতে করে এক আমবাটি মাছের তরকারি এনে নামাল ফটিকের সামনে। একটা পাতায় রান্না করা খানিক খানিক অন্ত তরকারি।—'বলি, জায়গা-টায়গা কিছু এনেছিস?'

ফটিক ক্রমাগত অবাক হচ্ছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে গিন্নীর দিকে—'ছোটবাবু তো কিছু বলে নাই।"

—আ, ছেলেটাও যেমন হাবা! শোন, এই ডেকচিটাই তাহলে নিয়ে যা। ধুয়ে মুছে এক্ষুনি ফেরৎ দিয়ে যাস বাপ। আমরা এখুনি সীতেপুর চলে যাচ্ছি। শ্বশুরমশায় মারা গেছেন। খবর নিয়ে লোক এসেছে। অশৌচ হয়ে গেল, এসব তো আর খাবার যো নাই। তোরাই খা। আর, শোন, পরে একদিন আর একটা এইরকম মাছ খাওয়াস।

এতক্ষণে ফটিক সব বুঝতে পারে। মনে মনে বড় আনন্দ অনুভব করে সে। আজকের দিনটাই তার বড় ভাল শুরু হয়েছে। সামনের নামানো পাত্রটাতে মাছের তরকারিটার কী রং—কি সুন্দর গন্ধ! গিন্নী একটু সরে যেতেই একটা খণ্ড মুখে ফেলে দেয় সে। আঃ, কি স্বাদ। আনন্দে চোখ বুজে আসে তার।

সব কিছু গামছায় ভাল করে বেঁধে নিয়ে সে রওনা দেয় ঘরের দিকে।

কল্পনা করে গরম ভাতের সঙ্গে মাছের তরকারি দিয়ে মেনকা কি আরাম করে খাচ্ছে। ছেলেরা খুনসুটি করছে আরো দাও, আরো দাও করে।

একটা পরিপূর্ণ সুখ যেন তার বুক চেপে ধরে। যেন হাঁটতে কষ্ট হয় তার। মনটা একটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কেন সে রোজ এমন খাবার যোগাড় করতে পারে না। মেনকা আর ছেলেদের এমন পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। কেন, কেন? এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। সামনে বেশ খানিকটা খোলা মাঠ। সেখানে প্রখর রৌদ্রে এরই মধ্যে ঘাস জলে যেতে শুরু করেছে। হাওয়ায় ছোট ছোট ঘূর্ণি উঠছে শুকনো ঘাস পাতা উড়িয়ে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ জলে ভরে যায়।

ধীরে ধীরে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

# ফারাক

সমীর সেন

চতুর্থবার কড়া নড়ে উঠতেই বাবা টিপ্পনী কাটল, দেখ গিয়ে আবার কোন্ মক্কেল এলো। তোমার তো আবার মক্কেলের কোন অভাব নেই।

আদৌ আমি উকিলই যেখানে নই, সেখানে মক্কেলের কথা যে আসে না, একথা বাবাও বোঝে। তবু বাবা 'মক্কেল' শব্দটি ব্যবহার করে সজ্ঞানে ও আমাকে খোঁচা দেওয়ার জন্যই। বলা যায়, হুল ফোটাবার জন্য।

বাবার প্রক্ষিপ্ত শব্দে আমি বিচলিত না হয়ে, দরজাটা দরাজ হাতে খুলে দিলাম। দরজা খুলে যাকে দেখলাম, সে আমার বোধে একেবারে অপ্রত্যাশিত। আমি পেছন না ফিরেই বুঝেছি—আগন্তুককে দেখে এরই মধ্যে বাবার ও বাবার চতুর্দশী কন্যার চকিতে দৃষ্টি বিনিময়টা সারা হয়ে গেছে। সম্ভবত একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও এতক্ষণে উভয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

যাকে দেখে বাবা ও মামনির হাত্তোকৌশক বিরূপ প্রতিক্রিয়া, সে কিন্তু সংকোচহীন ও নির্বিকার। ওর পরণে খাটো ধুতি. হাঁটু পর্যন্ত ওঠা। গায়ে বুকচেরা হাফহাতা ফতুয়া। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। দু-তিন জায়গায় কালচে দাগও। ঘামে জলে ফতুয়াটা গায়ের সাথে লেপ্টানো। পায়ে সস্তা-দরের টায়ারের চটি। মাথার ঝাকড়া চুল—ফেটি করে বাঁধা। হাতে বাজারের এক পেল্লায় থলি।

কালো কুচকুচে শরীরের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় যা, তাহল—ওর জবালাল দুটি চোখ। বোঝা গেল এই পড়ন্ত বেলাতেই ভাটিখানা হয়ে এসেছে। মুখো মুখি দাঁড়ানোও দুষ্কর। ভাগ্যিস বাবা দরজা খুলে দেয়নি। দিলে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে তিনহাত পিছাত আর আমার দিকে চোখ পাকাত। আমার কাছে এটা অবশ্য নতুন অভিজ্ঞতা নয়। লগ-ক্রোয়ে, পে-কাউন্টারে, জমায়েতে কিংবা মিছিলে-মিটিংএ ওর উপস্থিতি এমনিভাবে টের পাওয়া যায়। ওটা ওর ও ওদের অধিকাংশেরই জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দরজা খুলেই টের পেলাম—দশরথ যথারীতি আজও স্বাভাবিক নয়। ওর পা-দুটি আজ যেন বেশী টলোমলো।

আমি বিরক্তি না করে বললাম, কীরে দশরথ, কী ব্যাপার, হঠাৎ তুই ? একেবারে বাড়ি পর্যন্ত এসে যাওয়া ?

দশরথ কোন ভনিতা না করে বলে ফেলল, হঁ বাবু আমি। টাকা চাই টাকা হে। ঘোরপ্যাঁচ এড়িয়ে সহজ কথাকে সহজভাবে বলাটা যে ওদের সহজ সরল চরিত্রের আর একটা দিক, এটা আমি জানতাম। তাই ওর কথায় আমি বিস্মিত না হয়ে বল্লাম, বলিস কিরে ? টাকা চাই বললেই তো আর টাকা পাওয়া যায় না। তাছাড়া টাকা আমি কোত্থেকে পাব ?

দশরথের সেই এক কথা, নাই বইল্যে শুইনব ক্যানে ? টাকা চাই ট্যাকা হে। মিছিলায় হাট যাব-অ এখেচন।

বললাম, তুই মিছিলায় নাজাহান্নামেযাবি যা-না। আমি টাকা দেব কেন ?

—উ-সোব আমি শুইনব নাই। ট্যাকা খুঁজছি—তুকে ট্যাকা দিতে হবেক। বাজারট-অ কইরতে হবেক নাই ? কুটুম আইস্যিছে যে—

বললাম, তোর কুটুম এসেছেতো তার আমি কী করব ?

—তুই কী কইরবি শুইনতে খুঁজছিস ? শুন তবে—তুই টাকা দিবি। নইলে আমি এই বইস্ কইরে রইলম তুর ঘরে। না দেওয়াতক চইলবে আমার এস্‌টাইক।

আমি বাধা দেবার আগেই দশরথ সত্যি সত্যিই চৌকাঠের ওপাশে বসে পড়ল। ভাবলাম—এ-তো জ্বালাই বিপদে পড়া গেল। এই উজবুক সাঁওতালকে আমি বোঝাই কী করে—যে কেউ এসে টাকা চাইলেই আমি অমনি টাকা দিয়ে দিতে পারি না। টাকা খোলামকুচি নয়। তাছাড়া আমারও ঘরসংসার আছে। ছেলেমেয়ে আছে। ওদের নিরাপত্তার কথা ভেবেও আমাকে সমঝে চলতে হয়। কেউ এসে চাইলেই তা আমি তক্ষুনি নবাব দিলের লোক হয়ে যেতে পারি না। সমপর্যায়ভুক্ত অন্য কোন ধোপ-দুরস্ত লোক হলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাই বলে এই বোধবুদ্ধিহীন গেঁয়ো সাঁওতালটাকে ! ফেরৎ পাওয়ার আশা করাটাই যেখানে অন্যায়, সেখানে উপুরহাত না করাই ভালো। তাছাড়া টাকা হাতে পেলে ও কোথায় হাটে যাবে ? যাবে তো ভাটিখানায়—যাবো শিশা শিশা তাড়ি গিলে বুঁদ হতে। জীবনটা তো ওদের মদ-মাড়ি-তাড়িতে খেলো। নাহলে জোয়ানমদ্দগুলো এমন অসময়ে ফুটে যায় কী করে। গড়পড়তা বয়স তো পঞ্চাশও পেরোয় না। শিবের বাবারও সাধ্যি নেই, এদের পরমায়ুর মেয়াদ বাড়ায়।

এক লহমায় এত কথা ভাবলাম বটে এবং এতে মনটাও কংক্রীটের মতো কঠিন হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু দশরথের নিরীহ শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও ওর ভাবলেশহীন চোখের নিরুত্তাপ দৃষ্টি আমাকে তা হতে দিল না। সহানুভূতি নিয়ে বল্লাম, এই দশরথ ওঠ, একেবারে বসে পড়লি যে।

—তুই ট্যাকা দিচ্ছিস নাই তো, বইসব-অ নাই? বইলেছিত—না দেয়াতক চইলবে এসটাইক। দশরথের বলায় ও বসার ধরণে আমি হেসে দিলাম। বল্লাম, একেবারে স্ট্রাইকই শুরু করে দিলি? —দিব নাই? দশরথ বলল, তুরাইতো শিখাইনছিস—এসটাইক কইরলে মালিক মাথা হেঁট করে, দাবী পূরণ হয়। শিখাইনছিস আর এখোন নিজেই সিটা মাইনছিস নাই।

আমি বললাম, কলে কাজ করে অনেক কিছুই যে শিখেছিস। কালে কালে আরো কত শিখবি। —শিখাইনছিসতো শিখব নাই? দশরথ বলল, বুরবক বইনে থাকলেই বুঝি তুদের খুব ভালো? বললাম, তবে এটা শিখিসনি তো মাইনার দিনে যে কারো কাছে হাত পাততে নেই। কথাটা একটু রূঢ় হওয়ায় পরক্ষণে নিজেরই খুব খারাপ লাগল। ভাবলাম—না বললেই হতো। কিন্তু মাতালের দেখি, সেদিকেও জ্ঞান টনটনে। ঐ অবস্থাতেও ওর মুখে কথার পিঠে কথা ফুটল—কী বইলছিস বাবু? মাইনার দিনইতো তুরা ইউনিয়নের টিকট্ কাটিস আর হাত পাতিস, সিটা বুঝি দুষের লয়।

আমতা আমতা করে বললাম, সেটা তো অন্য ব্যাপার, অন্যভাবে হাতপাতা।

দশরথ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর যুৎসই কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে—হাত পাততে যে বাইধ্য হল্যম বাবু, দেখিস নাই মাইনার খামটো হাতে লিতেই সুদখোর পাঁড়েটো কিমন চিলের পারা ছোঁ মেইরে লিয়ে লিল।

দশরথের কথায় আমি অনেকটা দমে গেলাম। মাতাল হলেও ও তো মিথ্যে বলছে না। সত্যিই ছিনতাইবাজের মতোই তো তিলককাটা সুদখোর সনাতন পাঁড়ে দশরথের হাত থেকে খামসমেত প্রায় গোটাটাকাটাই ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। দশরথ টাকাটা গুণবার পর্যন্ত সময় পায়নি। এইতো মাত্র কয়েক ঘন্টার আগের ঘটনা। ছিলাম তো ওখানে অনেক পাণ্ডাই, কৈ বাধা দিতে পারা গেল।

দশরথের মুখের মলিন হাসিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দুপুর

বেলাকার সেই দৃশ্য এবং প্রার্থী দশরথের এই বর্তমান দৃশ্য একাকার হয়ে আমার চোখের সামনে ফুলতে লাগল। ওর রিক্ত মূর্তি আমার মনের বরফ যেন গলিয়ে দিল।

আমি দশরথের হাত টেনে ধরে বললাম, এই দশরথ, খুব হয়েছে এবার ওঠ।

—না, আমি উঠটবনাই, দশরথ গোঁজ হয়ে রইল, তুর ট্যাকা আছে, তুই দিচ্ছিস নাই। আমি ঈষৎ ঘুরিয়ে বললাম, তুই হাটে যাবি বলছিলি যে।

—হুঁ বইলেছিলম তো।

—তবু উঠছিস না যে। হাটে না গেলে কুটুমকে খাওয়াবি কি?

দশরথ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝটিতি উঠে পড়ল। ও যেন আমার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে। ওর মুখ উজ্জ্বল দেখাল। আমি দশরথকে দোর গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে, ভেতরে এসে আমার মাদ্রাজে পাওয়া খামে হাত দিলাম।

রাধা হা হা করে উঠে এলো। পেছন পেছন এলো মামনিও। ওরা দু-জনেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার খাম নাড়াচাড়া দেখল।

রাধাই প্রথম মুখ খুলল, টাকা দেবে বুঝি ঐ কাঙ্গুত লোকটাকে?

আমি মাথা নাড়লাম। রাধা বলল, এমন অবিবেচক হলে কী করে সংসার চালাব?

আমি কোন বাদ-প্রতিবাদে গেলাম না।

রাধাই বলল আবার, যারা নেয়, তারা তো কেউ উপুরহাত করে না। এমন বাহাদুরি কি আর না দেখালেই নয়? এদিকে মেয়ে যে বড় হচ্ছে সে খেয়াল আছে? এখন না বাঁচালে তখন কাড়ি টাকা আসবে কোত্থেকে?

বিয়ের কথায় মামনি লজ্জা পেল। আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলও। ঐ হাসি দেখে আমার মনে হল, মেয়ে ইতিমধ্যেই মার চেয়ে আমাকে যেন বেশী চিনে ফেলেছে। ওর মুখময় ছড়ানো হাসিটা আমাকে আমার আরব্ধ কাজে বেশী উৎসাহ যোগাল। আমি বিশ আর পঞ্চাশ এই দুই নোট নাড়াচাড়া করে শেষ পর্যন্ত বিশটাকার নোটটাকেই তুলে নিলাম। ভাবলাম—যাবে তো নির্ঘাৎ তবে যাবেই যখন, তখন কমের উপর দিয়েই যাক।

তাই দেখে রাধা খাঁই দিয়ে উঠল, করছ কি তুমি, দেবেই যখন, দশটাকা দিলেই তো হয়। তবু আমি বিশের পরিবর্তে দশটাকার নোটটা বদলে নিলাম

না। কেমন যেন রোখ চেপে গেল। রাধা সতর্কবাণী ছড়াল, এ মাস থেকে প্যাকেট কিন্তু আমি আর ছোঁব না। সংসার চালাবে তুমি। বললাম, আজ থেকে সিগারেট খরচা কমিয়ে, এ টাকার ঘাটতি আমি পূরণ করে দেব। —তুমি কমাবে সিগারেট? রাধার গলায় অবিশ্বাসী স্বর, তাহলেই হয়েছে আর কি! রাধা শেষ নিদান দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, তোমার মনে যা খুশি তাই করো, আমি আর কিছুর মধ্যে নেই। বরং আমাকে বাপের বাড়িতে দিয়ে এসো আর তোমরা বাপবেটিতে সুখে শান্তিতে থেকো। তখন কেউ আর বলতেও আসবে না।

মামনি মায়ের উষ্মাপ্রকাশের বহর ও সশব্দ পদক্ষেপের প্রস্থান দেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আর কালক্ষেপ না করে আমি টাকাটা দশরথের হাতে তুলে দিলাম। দশরথ পা ছুঁতে গেল আমার, আমি সরে এলাম। তবু দশরথ আভূমি আনত হল। ওর নমস্কারের ও বিগলিত হবার ভঙ্গিটি দেখে মনে হল—ওর মস্তিষ্ক, মেধা এমন কি শরীরও তখন কৃতজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণাধীন।

টাকাটা হাতে পেয়ে, বিগলিত হয়ে দশরথ বলল, কুটুমের কাছে ইজ্জৎটা বাঁচাইন দিলি বাবু। তুই ভালো লোক বটি!

আমি ধমক লাগালাম, যা এখন, তোকে আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না। দেখিস—হাটে না গিয়ে আবার ভাটিখানার দিকে যেন দৌড় মারিস না।

আমার কথায় দশরথ তার 'কুন্দ দন্ত' বিকশিত করে একগাল হাসল এবং হাসতে হাসতেই রাস্তায় পা দিল।…

…আমি দরজা বন্ধ করলাম। রাধা গজগজ করে তখন মামনিকে বলছে শুনতে পেলাম, তোমার বাপীকে বলো গিয়ে—ঐ মুখ্যু লোকটার সার্টিফিকেটটা মাদুলি করে যেন গলায় ঝোলায়, তাহলেই ঘরগেরস্থালি সব বজায় থাকবে।

মেয়ে-মায়ের কাছে হাসি চেপে দৌড়ে ছুটে এলো আমার ঘরে। তারপর হাসিতে প্রায় ফেটে পড়ল, আমিও চেপেচুপে হাসলাম অনেকক্ষণ।

রাধার ভৎর্সনা আর ডাক দুটোই এলো এক সাথে, হিঃ হিঃ করে বাপকে আর সোহাগ দেখাতে হবে না। এসো এখানে।

মেয়ে মায়ের মেজাজ বোঝে। ছুটে গেল মায়ের কাছে, কিছু বলছিলে মা?

—হ্যাঁ বলছিলাম, রাধার গলায় রাগত স্বর, বড় হয়েছ, এখন এক আধটু সাহায্য করলেও তো পার। একা কোন্ দিকে যাই? ঘরে কি কোন ঝি-চাকর আছে? জল ঘেটে ঘেটে হাতে হাজা ধরে গেল, সেদিকে কারো খেয়াল আছে?

এ তীর মেয়ের দিকে নিক্ষিপ্ত নয়। বালকেও বোঝে এ তীর নিক্ষিপ্ত কার উদ্দেশে। চুপ করে থাকা শ্রেয় মনে করে চুপ করেই রইলাম। সময়ে সব থিতিয়ে যাবে এভরসা নিয়েই।

কিন্তু না, থিতোল না। তিনদিন তেরাত্র অন্নজলগ্রহণপর্ব যথারীতি চললেও আমাদের দু'জনার মধ্যে বাক্যালাপ হল না একটাও। মেয়ে একবার বাপের দিকে তাকায়, আর একবার তাকায় মায়ের দিকে। কিন্তু কারো চোখেই কোন সন্ধির লক্ষণ না দেখে প্রথমে আড়ালে মুখ টিপে হাসে, তারপর হতোদ্যম হয়।

আরও কয়েকদিন চলো রাধার 'না হাসি' নামক অসহযোগ আন্দোলন। আমরণ অনশন ভাঙার কৌশল আমার জানা। দিনকয়েক আগেও কয়েকজন অনশনকারীর মুখে লেবুর রস ঢেলে অনশন ভাঙিয়েছি। অনশন ভেঙে ওরা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। মুখেও ফুটেছে হাসি। আমি রাধার হারানো হাসিকে ফিরিয়ে দিতে মনোযোগী হলাম।

একদিন কারখানা থেকে ফিরে, মেজাজমর্জি বুঝে বলে ফেললাম, তোমার জন্ত একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি রাধা। আর কোন চিন্তা নেই।

রাধা ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। মেয়েও এসে দাঁড়াল সামনে, মেয়ের চোখে সরল জিজ্ঞাসা আর রাধার গলায় কৌতুক—তোর বাপীকে জিজ্ঞেস কর তো, সে ব্যবস্থা কোন হোমে, না কোন স্থবির আশ্রমে? না কি তোর মামার বাড়ি?

রাধার বলার ভঙ্গী আমার হাসির উদ্রেক করল, কিন্তু আমি হাসলাম না। না হেসে ইনফর্মেশানটা রাধাকে দিলাম—কাজের একটা মেয়ে কাল থেকেই আসবে।

তার সঙ্গে যোগ করলাম, দেখা যাক হাতের হাজা এবার সারে কিনা।

এবার রাধাই হেসে দিল। আবার তক্ষুনি গম্ভীরও হয়ে গেল। জানতে চাইল বিশদ বিবরণ। জিজ্ঞেস করল, ঠিক তো করেছ, কিন্তু ঠিকা না ফুলটাইম?

বললাম, এটাকেই পরে ফুলটাইম করে নেওয়া যাবে। আপাততঃ করুকতো কিছুদিন।

রাধা জানতে চাইল, বৌ, না মেয়ে, নাকি বুড়ি?

বললাম, দুই সন্তানের জননী।

রাধা আশ্বস্ত হল। নিশ্চিন্তও হতে চাইল, হাতটানকান নেইতো?

—সেটা তো কয়দিন থাকলেই বুঝতে পারবে।

—কাজেকর্মে পরিষ্কার তো?

—সেটাওতো কাজে হাত দিলেই যাচাই হবে।

—কামাইটামাই করেনা তো?

—কী মুসকিল, এমন জেরার উত্তর দিই কী করে?

এবার, এতক্ষণ পর রাধার মুখে হাসি ফুটল, আসলে আমার ত্বরিৎ ব্যবস্থাপনায় রাধা ভীষণ সন্তুষ্ট হল। তার বহিঃপ্রকাশও ঘটল তক্ষুনি, মামনি, তোর বাপীর জন্য এককাপ চা চাপাতো মা। আমার জন্যও একটু দিস—

মুখটেপা হাসি নিয়ে মেয়ে গ্যাসউনুন অন করল। রাধা খুশিতে ডগমগিয়ে আমাকে নির্দেশ দিল, আজ আর বেরিয়ো টেরিয়ো না। ভাবছি গোটাকয়েক পিঁয়াজি ভাজব। তুমিতো আবার পিঁয়াজি খুব পছন্দ কর।

সত্যি সত্যি রাধা আধঘণ্টার মধ্যে গণ্ডাখানেক পিঁয়াজি ভেজে এনে আমার হাতে তুলে দিল। পিঁয়াজিতে কামড় দিয়েই বললাম, আঃ দারুণ—

সেই সুযোগে রাধা চোখের কারুকাজ সেরে আবদার ধরল, এবার থেকে বাপু, একটু ঘরের দিকে ধ্যান দাওতো। তার সঙ্গে পয়সা নয়ছয় করার বদঅভ্যেসটাও বন্ধ কর।

আমার আর রাধার সন্ধিস্থাপনের এই মহার্ঘ মুহূর্তটা দেখলাম, আমার আদুরি কন্যার চোখের মনিতে ততক্ষণে স্থিরচিত্র হয়ে ধরা পড়ে গেছে।

* * *

সুন্দরাকে পেয়ে প্রায় একমাস রাধার মেজাজটা বেশ শরিফই ছিল। সুন্দরা রোজ রুটিনমাফিক দিনে তিনবার এসে কাজ সেরে যায়। সুন্দরার কাজকর্মেও রাধা বেজায় খুশি। খুশির আতিশয্যে রাধা ইতিমধ্যেই সুন্দরার কিছু কিছু চাহিদাও পূরণ করেছে। দিয়েছে একখানা রঙচটা শাড়ি, দুখানা বগলছেঁড়া ব্লাউজ আর একখানা পিত্তরঙ সায়া। অব্যবহৃত একজোড়া চপ্পল দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে রাধার। এর মধ্যে মেলায় যাবার নাম করে গো টা

দশেক টাকাও হাতিয়েছে ফুলরা। আর সেটা গেছে রাধার ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই।

এতসব কথা আমার জানার কথা নয়। আমি জানলাম আমার একমাত্র প্রাইভেট ইনফর্মেশান সার্ভিস সূত্রে, যার সোল এজেন্ট হল, আমার আদুরে কন্যা মামনি। মায়ের কান বাঁচিয়ে মামনি ফুলরাসংক্রান্ত যাবতীয় গোপন সংবাদই আমার কাছে পাচার করত, জেনেশুনে বুঝে নির্বিকার থাকাই আমি শ্রেয় মনে করলাম এবং থাকলামও।

কিন্তু নির্বিকার থাকব বললেইতো আর থাকা যায় না। দিন কয়েক বাড়ি ছিলাম না। জরুরী কাজে যেতে হয়েছিল অন্যত্র। ফিরলাম পাক্কা পাঁচ পাঁচটা দিন পর। মেয়েই দরজা খুলে দিল। প্রথমেই যা চোখে পড়ল, তাহল—ভাঁই করা বাসনকোশনের সামনে বসে আছে ফুলরা নয়, বসে আছে মামনির গর্ভধারিণী স্বয়ং রাধা। আমাকে দেখে রাধা ঘষঘষিয়ে বাসন মাজতে শুরু করে দিল।

প্রমাদ গুনলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেসও করলাম, ফুলরা আসেনি?

রাধা কোন জবাব না দিয়ে আরো জোরে জোরে বাসনমাজায় মনোযোগী হল। মেয়েই জানাল সেখবর, শুধু কি আজই আসেনি? আজ নিয়ে তো পর পর চারদিন হল—ফুলরার দেখা নেই।

আমি অসহায় দৃষ্টি নিয়ে রাধার দিকে তাকালাম এবং বেশ ভাবিত হয়েই বললাম, তাহলে? মেয়েই মায়ের ভূমিকা নিল, তাহলে আবার কি! চারদিন ধরে মা-ইতো জল ঘাঁটাঘাটি করছে। জানো বাপী, মায়ের হাতের হাজাটা আবার—

মেয়েকে শেষ করতে দিল না মা, তার আগেই হুকার ছাড়ল, মায়ের জন্য কারো দরদ দেখাতে হবে না বলছি। মা মরে মরে হলেও সব করবে, কারো চিন্তার কোন কারণ নেই।

এ তীরও নিক্ষিপ্ত কাকে তাক করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তীরের খোঁচা খেয়ে নিঃশব্দে ঢুকে গেলাম বেডরুমে। পিছু পিছু এলো মেয়ে। মেয়ের কাছেই চুপি চুপি যা জানা গেল—তা হল এই—ফুলরা যে পর পর চারদিন আসেইনি তা নয়, অপরাধ তার চেয়েও গুরুতর। 'দিদির বাড়ি যাচ্ছি' বলে ফুলরা শেষ সময়ে রাধাকে দাঁও মেরে গেছে। রাধা ওর ইনানোবিনানোয় গলে গিয়ে আরো দশটাকা ফুলরার হাতে তুলে দিয়েছে।

দিয়ে বলেছে—একদিনের বেশী সময় থাকবি না কিন্তু। একদিন কেন, চার চার দিন পরও মৃন্ময়া ফিরে আসেনি। তাতেও রাধা তেমন একটা ক্ষেপে উঠত না, যদি না জানত মৃন্ময়া অন্য পাড়ায় অন্য একটা বাড়ির চৌপ দিলে ফুলটাইম কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাধার রক্ত মাথায় ওঠার মতো এতো মোটে দ্বিতীয় ঘটনা।

তৃতীয় যে ঘটনায় রাধা মেজাজ খোয়াল, তার জন্য দায়ী আমার অবিবেচনা প্রসূত কিছু কাজকর্ম। আমার অনুপস্থিতিকালীন রাধা এমন কয়েকটি গূঢ় খবর সংগ্রহ করেছে, যা আমি পারিবারিক শান্তি ক্ষুন্ন হবার ভয়ে রাধার কাছে গোপন রেখেছিলাম।

এই কিছুদিন আগেই পোস্টাফিসের কল্যাণে আমার হাজার পাঁচেক সঞ্চিত টাকা ডাবল হয়ে আমার হাতে এসেছে। সে খবর রাধার অজ্ঞাত থাকলেও আমার কয়েকজন সুহৃদবর্গের গোচরে এসেছে এবং ওরা দফায় দফায়—কেউ মেয়ের বিয়ের নাম করে, কেউ মায়ের শ্রাদ্ধের নাম করে, আবার কেউ বা ছেলের পরীক্ষার ফী জমা দেওয়ার নাম করে, আমার কাছে ধার নিয়ে গেছে। সবাই সদাশয় সুহৃদ হওয়া সত্বেও, প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে কেউ সেটাকা শোধ দিয়ে যায়নি।

একে, ডাবল হয়ে আসা মেয়াদি টাকার খবর গোপন রাখা, তার আবার কাকে না কাকে টাকা ধার দেওয়া এবং সময়েও সে টাকা শোধ না দেওয়া প্রভৃতি ন্যায়সংগত কারণেই রাধার মস্তিষ্ক বস্তুত এমন অগ্নিগর্ভ। রাধা পৈ পৈ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, টাকাটা হাতে এলেই চলো যাই স্বর্ণকারের দোকানে। দিনকে দিন মেয়ে একচা বড় হয়ে উঠছে। এখন থেকেই একটু একটু করে তৈরী না হলে পরে আর কূলকিনারা পাবে না।

রাধার মূল্যবান এই উপদেশ কোন মতেই অগ্রাহ্য করার নয়। সত্যিই-টাকাই তো সব, টাকাই তো আসল বলভরসা। অথচ আমারই আহা-ম্মুখির জন্য, ভরসা করার মতো সেই থোক টাকাটা পর্যন্ত এখন বিশ বাঁও জলে। অতএব সঙ্গত কারণেই রাধার এখন নিজের চুল নিজে ছেঁড়ারই দশা। কিন্তু এতসব সত্বেও রাধার ক্ষিপ্রতাটা এতটা চরমে উঠতো না, যদি এর সঙ্গে আরও একটা উট্‌কো ঝামেলা জুড়ে না যেতো।

রাধার কান বাঁচিয়ে এ খবরটাও মেয়েই দিল। ও জানাল—এই চিব-দিনে দশরথ কমুসেকম চার চারবার নাকি দরজা খটখট করেছে। ওকে দেখে

রাধা নাকি রেগে আগুন। শুধু রাধা কেন, শুনে আমারও মেজাজ খারাপ হল। রাধাতো তাহলে ঠিকই বলে। ভাবলাম—ব্যাটা পেয়েছে কি আমাকে? একবার না হয় দিয়েছি দিয়েছি। তাই বলে বার বার? ও কি ভাবে—আমি একেবারে কল্পতরু, ঝাঁকি দিলেই ঝুরঝুরিয়ে টাকা পড়বে! ওদের স্বভাব কি মলেও যাবে না? এইতো দিন সাতেক আগেই ওকে পি. এফ থেকে লোন পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। পেয়েছেও নিশ্চয়। আশ্চর্য এর মধ্যেই সব খতম!

খুব রাগ হল দশরথের উপর। ভাবলাম—মদ-মাড়ি-তাড়ি নিয়ে যাদের আগোছাল জীবন, তাদের মরাই উচিত। কে জানে এবার আবার কোন্ কুটুমের দোহাই দিয়ে ঢুঁ মারতে এসেছিল। রাধাতো বলতে গেলে ওকে খেদিয়েই দিয়েছে। ও মূর্তি দেখে কে জানে ও আর এ মুখো হবে কিনা। না হবেতো না হবে। কালতো সপেই মুখোমুখি দেখা হবে। তখন না হয় আচ্ছা করে মাতালের মাতলামো ঘোচানো যাবে। মনে মনে গরজালাম—ব্যাটার 'জায়গা চিনে খাওয়ার' মজাটা আমি টের পাওয়াচ্ছি, কাল একবার দেখা হোক। ...... ..

...আমার চেহারায় উত্তাপের ছাপ দেখে মেয়ে আমার হাসতে লাগল। মেয়ের মা তখনও আমার দৃষ্টির বাইরে। মেয়েকেই বললাম, এক গ্লাস জল খাওয়াওতো মা-মনি। মামনি জল আনতে গেল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

এতক্ষণ পর রাধা নড়েচড়ে বসল। নতুন উদ্যমে ওর বিষ মাখা জিহ্বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে শানিত হল—ঐ বুঝি তোমার শাঁসালো সেই মক্কেল এলো।

বেরোতে গিয়েও আমি রাধার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

রাধা ওসকালো, বুঝলেনাতো. তোমাদের শ্রীরামচন্দ্রের পিতাগো। খালি হাতে যাচ্ছো যে বড়, মানিব্যাগটা সাথে নিয়ে যাও?

তাড়া-খাওয়া বন্য বরাহের মতো আমি দরজার পথে এগোলাম। বাসন-কোসন ছেড়ে রাধা এলো পিছু পিছু। তার পেছনে মেয়ে। সম্ভবত ওরা আমার বীরত্বব্যঞ্জনাটা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করতে চায়।

একটানে দরজাটা খুলে ফেললাম। হ্যাঁ, রাধার অনুমানই ঠিক। চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথই বটে। পা যথারীতি টলটলায়মান।

আমি কিছু বলার আগে দশরথই বল্লো একগাল হেসে, চাইর দিনতক তুকে খুঁজেছি, কুথায় ছিলি বাবু? আচ্ছা লুক বটি তুই—

উত্তাপ চেপে রেখে বল্লাম, খুঁজছিস কেন? আবকে আবার কোন কুটুম্ব এলো?

কাঁচুমাঁচু হয়ে দশরথ বল্লো, আজ ন্থন কুটুম আসেনিতো বাবু।

হাতে ধরা থলিটা দেখিয়ে বল্লাম, তবে বাজারের থলি যে হাতে, আজও কি মিছিআম?

দশরথ লজ্জা পেল, হঁ-আ বাজারটো একবার ঘুরান দিয়ে দেইতে হবেক বটে?

—তাহলে ঠিকই ধরেছি, বল্লাম, কুটুম এলেতো তোদের ঘরে আবার মোচ্ছব পড়ে যায়। —ইটা যা বইলেছিস বাবু, দশরথ বল্লো, কুটুমদেরতো আদরযত্ন করতেই হয়। না কইরলে যে মান থাকে না।

ভাবলাম, ওরে ব্যাটা মান-অপমানজ্ঞান যে একেবারে টনটনে।

আর কালক্ষেপ করাটা সমীচীনবোধ করলাম না। ওদেরই মতো সোজা কথাটা সোজাভাবে বলে ফেলাই ভালো মনে করলাম। রাধার চোখে চোখ পড়তে পেলাম ওরও অনুমোদন। মেয়েই শুধু বিহ্বলভাবে একবার তাকাল আমার দিকে, আর একবার তাকাল দশরথের দিকে।

বেশ রুক্ষভাবেই বল্লাম, দেখ, দশরথ, কুটুম নিয়ে যা তোর মন চায়, তাই তুই কর; কিন্তু তোকে এই সাফ সাফ বলে দিচ্ছি—সত্যি সত্যিই আজ আমার হাত একেবারেই খালি; তোকে দেওয়ার মতো একটি পয়সাও নেই।

মুখময় সরল হাসি ছড়িয়ে দশরথ এক আশ্চর্য কথা শোনাল। ট্যাকা নিতে তো আসিনি বাবু, এইসেছিতো তুর জানা শুইধতে।

সত্যি সত্যি দশরথ আমাদের তিনজনকে অবাক করে দিয়ে একটা কড়্‌-কড়ে বিশটাকার নোট, ওর ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে দশরথ হেসে বলল, ধরনা ক্যানে বাবু নোট-ট। পি. এফের ট্যাকাটা হাতে পেতেই ভাইবলম্—যাই ক্যানে, বাবুর দ্যানাটোত শুইধে আসি আগে, তাই এলম।

আমার হাতে নোটটা ধরিয়ে দিয়ে, দশরথ চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, একটো কোথা বইলব বাবু, তুই যেনে ন্থন রাগ লিবিনাতো?

বল্লাম, শুনিইনা আগে কী কথা।

—খালি হাত বইলছিলিনা বাবু, দশরথ বল্লো, তো আমার সঙ্ আরোতো কিছু ট্যাকা আছে, দিব তুকে, লিবি তুই?

আমার যাবতীয় সংশয় ও অবিশ্বাসের মূলে সপাটে যেন এক টা চড় এসে পড়ল। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে আমি একেবারে এতটুকু হয়ে গেলাম। বললাম না-রে থাক।

—থাক ক্যানে? দশরথ বল্লো, লাজ কিসকে।·· বুইঝলি বাবু ই ট্যাকার হদিশ এখনতক ঘরপোষরটো জানেই না। জাইনতে পাইরলেতো কখোন ছিনতাই হয়ে যেতম।

দশরথ আর এক প্রস্থ সরল হাসি উপহার দিয়ে পথের বাঁকে মিলিয়ে যেতেই আমি ভাবলাম—একজন আকাট মুখ্যু সাঁওতালের নিপাট সারল্য ও সততার যে স্তর সে স্তর থেকে আমাদের দূরত্ব কতটা?

কে জানে রাধাও তেমন কোন ভাবনার আবর্তে পড়ে মূক হয়ে গেল কিনা!

# চতুর্দিক

মূল রচনা : অসগার ওজাহত

হিন্দি থেকে অনুবাদ : সজল দে

যে দেয়ালের গায়ে লেখা থাকে, 'এখানে প্রস্রাব করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ', তেমন দেয়াল দেখলেই পেচ্ছাপ করার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। আজও প্রায় এরকমই হল।

রাত সাতটা কি আটটা বাজে। আমি নিজের মনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এক দেয়ালের গায়ে উত্তেজক বাক্য লেখা দেখা গেল। আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। যেন এতদ্বারা শুধু নিজের কর্তব্যই করব না, একটা বড় সামাজিক দায়িত্বও পালিত হবে। কিন্তু সামনের দিক থেকে লাঠি দোলাতে দোলাতে এক সেপাইকে আসতে দেখে আমি মনোবাসনা দমন করে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, সেপাই সামনের দিকে এগিয়ে গেলে বাসনা পূরণ করব। সেই অপেক্ষায় আমি দেয়াল বরাবর পায়চারি করছিলাম আর ভাবছিলাম, যদি দেয়ালে লেখা থাকত যেদেয়াল বরাবর পায়চারি করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, তাহলে আমি কী করতাম?

আর একটু সামনে এগিয়ে দেয়ালের গায়ে লেখা ছিল, 'দেয়ালের গায়ে প্রস্রাবকারীদের দণ্ডিত করা হবে।' আরো একটু এগিয়ে লেখা, 'দেয়ালের গায়ে প্রস্রাবকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে।' পড়ে রাগ হল। বা রে বা, এ তো দেয়াল নয়, দেশের সংবিধান হয়ে গেল।

আড়চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে সেপাই তখনো দেয়ালের তদারকি করছে। ভাবলাম, ওকে কীভাবে ধোঁকা দেয়া যায়। একপাশে বড় একটা নিমগাছ ছিল। তার নিচে কিছুটা অন্ধকার, আমি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ বাদে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে যেতে ওখানে আরো একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ওকে দেখে আমারই মত মনে হল। কথায় আছে যে সমগোত্রীয় লোকের সঙ্গে কথা না বলা পাপ, এজন্য আমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম এবং জানতে পারলাম যে সেও আমারই মত 'অপেক্ষা' করছে।

আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে খুব বেশিক্ষণ হয়নি এমন সময় তৃতীয় একজন আমাদের দিকে এল। কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় ব্যক্তি বলল যে, সে 'পেইন্টার' এবং ওকে দিয়েই দেয়ালের নির্দেশগুলো লেখানো হয়েছিল। তা জেনে আমরা ভাবলাম যে পেইন্টার আমাদের ধরতে এসেছে, কিন্তু সে জানাল যে সেও দেয়ালে পেচ্ছাপ করতে এসেছে। 'পেইন্টার'-এর কথা শুনে আমরা কিছুটা অবাক হলাম, কিন্তু খুশিই হলাম বেশি। আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে যদি দেয়ালের নির্দেশগুলো লিখে থাকে তাহলে এখন দেয়ালে পেচ্ছাপ করতে চাইছে কেন? পেইন্টার বলল—"আমি নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য দেয়ালে লিখেছিলাম আর এখন নিজের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেয়ালে পেচ্ছাপ করতে চাই।"

আমরা কথাবার্তা বলতে বলতে ওখানে একটা চতুর্থ ছায়াও এসে পড়ল। যেহেতু অন্ধকার ঘন ছিল, তাই চতুর্থ ছায়াও যখন আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে গেল তখন জানা গেল যে সেও পেচ্ছাপ করার জোগাড় করছে। একটু ভালো করে দেখে এবং জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে চতুর্থ ছায়াটি আসলে ওই সেপাই-এর, লাঠি হাতে দেয়ালের সুরক্ষার জন্য মজুত ছিল।

লেখক পরিচিতি :

প্রগতিশীল হিন্দি কথাশিল্পী অসগর ওজাহতের জন্ম ১৯৪৬ সালে, উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে। গল্প, উপন্যাস, আলোচনা ছাড়াও নাটক, পথ-নাটিকা, ফিল্ম-লেখন এবং নির্দেশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। অনুবাদ করেছেন কুররতুল-এন-হায়দারের মত লেখিকাকে, উর্দু থেকে হিন্দিতে। অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক কার্যশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতিগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের ওপর ওঁর কাজ রয়েছে। বর্তমানে নতুন দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি বিভাগের রিডার। ১৯৭৯ সালের 'সংস্কৃতি পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত।

অসগর তাঁর প্রতিটি লেখায় সচেতনভাবে সমসাময়িক সমাজ, শাসন, মানুষ এবং মূল্যবোধগুলির ওপর টিপ্পনি করে থাকেন। অসগরের ভাষা

প্রতিবাদী; ব্যঙ্গ তীব্র, কশাঘাতের মত। ফলত ওঁর অনেক লেখাই বিবাদাস্পদ হয়ে পড়ে।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: রাত সে আগনেওয়ালে (উপন্যাস); অন্ধেরে সে (গল্পসংগ্রহ); দিল্লি পহঁচনা হ্যায় (গল্পসংগ্রহ); স্বইমিং পুল (গল্পসংগ্রহ); বীরগতি (নাটক); ইয়া কী আওয়াজ (নাটক); সবসে সস্তা গোস্ত (পথনাটিকাসংগ্রহ); হিন্দি উর্দু কী প্রগতিশীল কবিতা (আলোচনা); বুঁদ বুঁদ (বহুবিতর্কিত টেলি-সিরিয়াল) ইত্যাদি।

বর্তমান গল্পটি (চায় কি প্যালি) ওঁর 'স্বইমিং পুল' নামক গল্পসংগ্রহ থেকে নেয়া।

—অনুবাদক

# ভারতীয় সংহতি ঃ বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা ও মানবতাবাদ

পীযূষকান্তি সোম

ভারতের জাতীয়বাদ ও তার বিকাশ নিয়ে ঐতিহাসিকরা যে সব তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তার মধ্যে একটি ঐকমত্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। মতৈক্যের বিষয়টি সংক্ষেপে এই রকম—ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ হল আমদের মতাদর্শ এবং এক টি সংগঠন নীতি যার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাও অন্তর্ভূক্ত। কিছু ঐতিহাসিকের জাতীয়তাবাদী বিকাশের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আনীত হয়েছে জাতপাতের উপর নির্ভরশীল হিন্দু 'এলিট' গোষ্ঠির ধারণার গুরুত্ব। মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ দেখি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ইতিহাস পর্যালোচনায়। তিনিও স্বীকার করেন যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে কোনও অখণ্ড জাতীয় ঐক্য উপস্থিত ছিলনা। জাতীয় ঐক্যের নায়ক হিসাবে দুটি গোষ্ঠীকে তিনি চিহ্নিত করেছেন :

(ক) নবীন জাতীয় বুর্জোয়া

(খ) পশ্চিমী শিক্ষা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়

প্রথমটির উপাদান পুরাতন পরাজিত বণিকগোষ্ঠী। এরা ইংরাজের সঙ্গে অনুকূল সংযোগ দ্বারা আর্থিক সুবিধাদি আদায় করে বাড়তি টাকা শিল্পে-বাণিজ্যে নিয়োগ করতে থাকে। একই সঙ্গে ইংরাজ আমলে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি পেয়ে আর একটি বৃত্তিআশ্রয়ী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'এলিট' গোষ্ঠী পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এরাই জাতীয় কংগ্রেস পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিল। এরা আর্থ-রাজনৈতিক কারণে বণিক ও শিল্পগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে থাকে ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটায়; 'এলিট' চেতনার পিছনে ধর্ম, বর্ণ, জাতি প্রভৃতি অনুঘটকের কাজ করেছে। তথাপি এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ

থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতামুক্ত জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আঞ্চলিক ও বর্ণভিত্তিক ভেদাভেদের ঊর্ধে উঠে এরাই সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ঐক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ সৃজন করে নবীন জাতীয় বুর্জোয়ার অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেছে।

একইসঙ্গে ইংরাজের শাসন-তন্ত্র ভারতের সনাতন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় রাজশক্তির অনুপ্রবেশ দ্বারা তার পরিবর্তন নিয়ে আসে। বহুস্থানীয় নেতার আবির্ভাবে 'পাইয়ে দেবার' রাজনীতি বা মক্কেল-মুরুব্বি সম্পর্ক ভোট-প্রথার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরীর মূল কারণ হয়ে দেখা দেয়। এই গোষ্ঠীগুলির একাকারীকরণ ইংরাজের রাজশক্তির আর্থিক স্বার্থে সংঘটিত হোল। কিন্তু তা কি ইংরাজ শাসনকালের আগে ভারতের জাতীয় সাধনা?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজার প্রভাব ছিলনা। সে ছিল প্রতিবেশী জাতিতে জাতিতে; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে—ভাষা ও আচারের ভিত্তিতে, ধর্ম ও চরিত্রের আদর্শের ভিন্নতায়। প্রাচীন ভারতের ঐক্য সাধনের সমস্যা মূলত ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত। বিবিধের মধ্যে-ঐক্য আনার জন্য যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তা ভারতের ইতিহাসে নানাজাতির মধ্যে যুগে যুগে সংঘাত এনেছে। এই সংঘাত দেখি আমরা বৈদিক যুগে, বৌদ্ধযুগে ও তার পৌরাণিক পরিণতিতে এবং তার উত্তরকালে হিন্দুজাতির আত্মপ্রকাশের সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টির ইতিহাসে রাজা ও রাষ্ট্রনীতিকে প্রধান শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন নি। ভারতের ইতিহাস সামাজিক ও ধর্মতন্ত্রমূলক এবং তা ইংরাজ আক্রমণের আগে অসমাপ্তই রয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"যে আদর্শের ঐক্য হিন্দুজাতিকে বৌদ্ধযুগোত্তর ইতিহাসে পোক্তায় ও সামঞ্জস্যে সৃজন করতে পারত তা বহিরাগত শক, হুণ, আরব, মোগল ও ভারতবর্ষীয় অনার্যদের সংঘাতে বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ হয়েছে।" তবুও এই বিচ্ছেদের মধ্যেই ভারতীয় ঐক্যের মূলসূত্রটি আছে। কিন্তু ভেদ আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে ছিল। তার ঐক্যসাধনের আগেই বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের প্রশাসনিক একাকারীকরণের সাহায্যে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হোল। তার স্বদেশী নায়ক যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিবিধের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মতন্ত্রমূলক ঐক্যসাধনের জন্য সক্রিয় চেষ্টা করতে সমর্থ হন নি। বরং এক্ষেত্রে

অনেকেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গঠনের ইতিহাসগত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারত-ইতিহাসধারার ভগীরথ হবার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ভারতের ইতিহাসে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের পথ খুঁজলে ভারতের ইতিহাস চর্চা হয়না। "ভারতের সমস্যা যেখানে ভারতের ইতিহাস সেখানে"—রবীন্দ্রনাথের এই বাণী বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞে প্রতিফলিত হতে দেখি।

বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা ও মানবসেবার আদর্শ বৌদ্ধযুগোত্তর অসমাপ্ত হিন্দুত্ববাদের পুনর্জীবন বা রেণেসাঁর উৎস। ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসমূল নির্ণয় করতে গিয়ে এবং তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন: "এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ-নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামিচিই সার···।" এই ধর্ম বলতে কী বুঝি? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "ধর্ম বলিতে রিলিজিয়ন নহে, সামাজিক কর্তব্য তন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজিয়ন, পলিটিক্স সবই আছে।··· ···পলিটিক্স এবং নেশন কথাটা যেমন ইয়োরোপের কথা, ধর্ম কথাটা তেমনি ভারতবর্ষের কথা।···ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এজন্ত ধর্মকে ইংরাজি রিলিজিয়নরূপে কল্পনা করিয়া অনেক সময় ভুল করিয়া বসি।"

সে যা হোক সকল ধর্মের লক্ষ্য কিন্তু আত্মানুভূতি। আর ভারতীয় জীবনের লক্ষ্যবিন্দু অপরোক্ষানুভূতির মোক্ষ। পাশ্চাত্যের ধর্ম বা রিলিজিয়ন বিবেকানন্দের মতে ক্রিয়ামূলক। সে তাকে সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। আর মোক্ষ শেখায় যে, ইহলোকের সুখ গোলামি, পরলোকেরও তাই। প্রাচীন ভারতের সমাজে এই ধর্ম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য বিধানই আদর্শ ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন ধর্মের চেয়ে মোক্ষই প্রধানতর আদর্শ হয়ে দেখা দিল তখন সমাজ পঙ্গু হয়ে পড়ে। স্বামীজীর ধর্মচেতনায় ভারতীয় প্রাচীন আদর্শ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোল। তিনি সমাজের অগ্রগতিকে প্রাধান্য দিয়ে নির্দেশ দিলেন: "বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।" এই হীনমন্যতার অবসানে সংহতির সূচনা।

ভারতীয় ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর অন্যতম অবদান হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানুষের নির্ভীকতার মূলসূত্রটির একটি বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা। মানুষ জগৎসংসার থেকে পৃথক একটি ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তামাত্র নয়। এই ধর্মচেতনার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সময়ে সময়ে গ্লানি উপস্থিত হয়েছে। স্বামীজী সেই অভাব দূর করতে বেদান্তকে কর্মে পরিণত করে সকলের কাছে গ্রহণীয় করার সাধনা করে গেছেন। বেদান্তের হিমশীতল জ্ঞান-সর্বস্ব অস্তিত্বকে স্বামীজী তাঁর প্রেম ও মানবতাবাদের সাহায্যে গঙ্গার ধারার মত নিয়ে এসেছেন তাঁর দেশের মানুষের কাছে—ভেদাভেদহীন সেবাব্রতের আদর্শে, বীরোচিত চরিত্র গঠনের আদর্শে, যাবতীয় কর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাসের আদর্শে, এবং সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের আদর্শে। তাঁর মতে, "এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।" ভারতীয় সংস্কৃতির এই সর্ব-ধর্ম-সমন্বয় ভাবনাই তাঁর মানবতাবাদের উৎস। তিনি বলেছেন: "প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অপরের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব? অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে,...অজ্ঞব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি।...সকলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হও।" পরিপূর্ণ মানবের এই সনাতন ভাবটিকে, আদর্শটিকে কর্মে প্রতিফলিত করে স্বামীজী ভারতীয় সমাজে একটি বলিষ্ঠ চেতনার পুনর্জীবন দিয়ে গেছেন। আজ ভারতবাসীর শিক্ষায়, সামাজিক অনুশাসনে ও রাষ্ট্রতন্ত্রে এই মানবতাবাদের বিকাশ ছাড়া বিবিধের মাঝে ঐক্যের সন্ধান নিরর্থক হবে।

সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা মেনে নিয়ে তদনুরূপ ব্যবহার করার মত মানসিক পুষ্টির অভাবে তৈরী হয়েছে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের কাল্পনিক ভেদ যা অতীতে আমাদের জীবনকে কলুষিত করেছে ও এখনও করে তুলছে। একটি বলিষ্ঠ সমাজসংগঠননীতির অভাবে হিন্দুদের মধ্যে এই মানসিক পুষ্টির অভাব সর্বজনীনভাবে অনুপস্থিত স্বীকার করে নিয়ে সেই ত্রুটি সংশোধন করতে তিনি ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন: বৈদান্তিক

মস্তিষ্ক ও ইসলামীর দেহ-সূত্র। মুসলমান সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্বামীজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাছাড়া আমাদের দেশে ভক্তি-আন্দোলন ও সুফী মতবাদের প্রসার হিন্দু ও মুসলিম সমাজের ঐক্য সাধনে সাহায্য করেছে। বাস্তবে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য কোন একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী, ধর্মসম্প্রদায় বা সামাজিক শ্রেণী গর্বিত হতে পারে না। "ভারত একটি নৃতত্ত্ব সংগ্রহশালা।" সুতরাং সর্বোদয় বিকাশের জন্য কোন কেন্দ্রানুগ মুষ্টিমেয়তন্ত্র কার্য্যকরী হবে না। কেন্দ্রপরিচালিত আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের রাজনীতিতে ভোটব্যাংক তৈরীর প্রচেষ্টায় কেন্দ্র ও প্রত্যন্তবর্তী অঞ্চলের টানা-পোড়েনে ভারতীয় একতা বিঘ্নিত হতে চলেছে। মুষ্টিমেয় কবলিত হুকুমদারী আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির প্রাধান্য বন্ধ করে স্বয়ংশাসিত সামাজিক সংস্থাগুলির জন্য স্বনির্ভর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী করা চাই। এই কাজটি না হলে স্থানীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় রাজশক্তির আনুকূল্য পাওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠী বা সামাজিক শ্রেণীকে আপন আপন গর্ববোধের খণ্ড খণ্ড চেতনায় বিভেদকামী করে তুলতে সাহায্য করবে। এই গর্ববোধের সঙ্গে ধর্মান্ধতা ও নানাবিধ সাম্প্রদায়িকতার যোগাযোগ ঘটছে বলেই সংহতির বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি স্বামীজীর মতে সর্বাবগাহী বেদান্তের বিরোধিতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের মধ্যেই জন্ম নেবে—কোন লোকায়ত চেতনার মধ্যে নয়। মোগল সম্রাট আকবরের চেষ্টা স্মরণীয়।

স্বামীজী মনে করতেন ও সেইভাবে প্রচার করে গেছেন যে সকল প্রাচীন ধর্মমতগুলি দেশ-কাল-জাতি সাপেক্ষে বেদান্তের প্রকাশ মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগুলি যে বেদান্তের আঞ্চলিক প্রকাশ তা বিশ্বাস করতেন বলেই স্বামীজী সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের জন্য উৎসাহিত বোধ করতেন। এই সমন্বয় দ্বারাই ভারতের সংহতি ও প্রগতি সম্ভব—ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা সৃষ্টি দ্বারা নয়।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিলেও জাতিভেদ প্রথার মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হয়েছে তা নিয়ে স্বামীজী কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "... জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে

দুর্গতিকে আশ্রয় করিয়াছে।" জাতিভেদ যে প্রাচীন সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপযোগী তা আজ অপ্রাসঙ্গিক। অথচ আজ এই প্রথার মূল কথা হয়েছে খাওয়া-দাওয়া ও বৈবাহিক আদান-প্রদান সম্বন্ধে বিগত সমাজব্যবস্থার অনুশাসন মেনে চলা। সুতরাং এগুলি হিন্দুর ধর্মাচরণের সার্থক রূপায়ণ হতে পারে না। স্বামীজীর মতে "ভারতে অন্তর্বিবাহ হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।" খাওয়া-দাওয়া নিয়ে জাতপাতের ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভেদ-বুদ্ধির উপর আঘাত হেনে স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন: "হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে।" ছুঁৎ-মার্গের বিরুদ্ধে স্বামীজীর উদাত্ত স্বদেশমন্ত্রের বাণী আমরা সকলেই শুনেছি: "...ভুলিওনা নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্রত আজও উদ্‌যাপিত হোল না। বরং জাত-পাতের লড়াই কোন কোন অঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করেছে। স্বামীজীর জীবন ও সাধনা থেকে বোঝা দরকার যে, রাজনৈতিক স্বার্থে চালাকির দ্বারা বিবিধের মধ্যে ভারতীয় ঐক্যের সন্ধান সাধন হবে না। ভারতের ঐক্য বহুকাল ধরেই ভারতের সামাজিক সমস্যা—কেবল রাজনৈতিক সমস্যা নয়।

আজ রাজনীতির সর্বগ্রাসী শক্তি প্রশাসন ও সমাজ দুটিকেই একাকার করেছে। সামাজিক কর্তব্যবোধ আজ রাজশক্তির এক অদ্ভুত প্রাবল্য দ্বারা পরাজিত ও সন্ত্রস্ত। সাধারণ লোকের মনে আজ এই ধারণা প্রবলতর যে, শাসকসম্প্রদায়ের দাক্ষিণ্য ছাড়া কোন সামাজিক কর্তব্য বা ধর্মতত্ত্ব অবশেষে নিরর্থক। জনমনের এই ভাব ভারতীয় জীবন সাধনা ও তার নির্মীয়মাণ ঐক্যের বিপরীত। বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মচেতনা ও মানবতাবাদকে কর্মোদ্যোগের ভিত্তি করে ভারতীয় সংহতির পথ-নির্দেশ করেছেন। সেই পথে অগ্রসর হওয়ার যথার্থ একটি সাংবিধানিক কাঠামো ও একটি শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করা প্রয়োজন। এই দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া জরুরী।

যথার্থ শিক্ষার অভাবে ভারতীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ভোগবাদী সমাজে সুবিধাদি আদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। সামাজিক কর্তব্যবোধ ও নীতিশিক্ষাকে বাল্যের

শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করলে ন্যায়-অন্যায় বোধ, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি ও সহনশীলতা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্বভাবের অঙ্গীভূত হবে। কর্মে পরিণত ধর্ম মানুষকে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা দেয় এবং নিঃস্বার্থ হতে, নির্ভয় হতে সাহায্য করে। নির্ভীক মানুষ না হলে আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। কাপুরুষের সঙ্ঘবদ্ধতা সঙ্ঘশক্তির সূচনা করে না—গড্ডালিকার প্রবাহ তৈরী করে মুষ্টিমেয় লোকের বিভেদকামী শক্তিকে জোরদার করে। হাজার হাজার দরিদ্র দেশবাসীর গোটা বছরের উপার্জনকে আত্মসাৎ করে যারা ডিগ্রীধারী হচ্ছে তারা শতকরা আশিজন দেশবাসীর দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সক্রিয় চিন্তা করে না। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাসিঙ্গাকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন: "যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দরিদ্র, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছেনা এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।" শিক্ষার সাহায্যে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা ও চরিত্রগঠন এবং বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের দ্বারা তাদের দারিদ্র্য মোচন—এই ছিল স্বামীজীর দেশগঠনের মূল কথা। রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি দশের এই কাজে সংগঠিত করেছেন। কিন্তু একাজ একা রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব বলে মনে করলে আমরা ভুল করব। একাজের দায়িত্ব সমগ্র শিক্ষিত সমাজের। সরকার বা রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে আমরা যারা শিক্ষিত তারা যদি সামাজিক দায়িত্বপালনে সচেতন না হই তবে ভারতের বহুবচন সমাজে শিক্ষার যে আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির উপযোগী তা পালিত হওয়া দুঃসাধ্য। লোকশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমাজের দায়িত্ব ও সক্রিয় ভূমিকা রাজশক্তির কবলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় লোকশিক্ষা কোনদিনই রাষ্ট্রকবলিত ছিল না। রাষ্ট্রীয় অনুদানের খাতিরে সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে অনর্থক রাজশক্তির দলীয় অনুপ্রবেশ ঘটাতে গেলে—ভারতীয় সংস্কৃতির বীজমন্ত্র—বিবিধের মধ্যে ঐক্যের বদলে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যাপ্ত করে Orwellian একাকারীকরণ ঘটে যাবে। এই একাকারীকরণের তামসিকতায় ভোগবাদী ও জড়বাদী অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দাসত্ব দ্বারা ভারতীয় সমাজের জীর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। এই জীর্ণতার ছিদ্রপথে মুষ্টিমেয়-

তান্ত্রিক স্বার্থপর গোষ্ঠীগুলি তাদের বিশেষ প্রাধান্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ভারতীয় ঐক্যের বিপর্যয় ডেকে আনছে ও আনবে।

স্বামীজীর সকলকর্মের প্রেরণা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের দুটি মূল সূত্র থেকে পাওয়া :

(ক) মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব

(খ) মানুষের নিশ্চিত আধ্যাত্মিক পরিণতি

এই দুটি সূত্রের বাস্তব রূপায়ণের জন্য স্বামীজীর দুটি নির্দেশ আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা ও আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত :

(ক) মানবজাতির বহুবচন সমাজ, রাষ্ট্র, ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে শ্রদ্ধা করে।

(খ) মানুষের সকল স্বার্থের অন্বেষণ নিয়ন্ত্রিত হবে মানুষের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতির প্রয়োজনে।

বিবেকানন্দের চিন্তায় মানুষের সমাজগঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তির ক্রম-বিকাশকে সাহায্য করা। সমাজবদ্ধ হয়ে ব্যক্তি তার "আমি"কে বিসর্জন দিয়েছে—বিবাহ, সন্তানপালন ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য সমাজ তার অনুশাসন দ্বারা মানুষকে এই ত্যাগের পথে পরিচালিত করে তার সুপ্তশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। স্বামীজীর বাণী "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন" যে অর্থে বেদান্তের সত্য তা কারও বা কোন শ্রেণীর বিশেষ অধিকারকে স্বীকার করে না। যদি কোন ব্যক্তি, শ্রেণী, নরগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশেষ স্বার্থে ব্যবহার করে তবে রাজশক্তির স্খলন হতে বাধ্য। সমাজবাদী সমষ্টির শক্তিতে উত্তরণ সম্ভব যখন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রযুক্তির দ্বারা সরলীকৃত হয়ে বহুবচন সামাজিক সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে মানুষের আধ্যাত্মিক পরিণতির জন্য। রাজশক্তি তখন এইসব সামাজিক সংস্থাগুলির একাকারীকরণ থেকে বিরত হয়ে একটি ঐক্যের সূত্রদ্বারা তাদের গেঁথে তুলবে। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে অপচয়বিহীন সামাজিক এবং সার্বজনীন উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাবনা উজ্জ্বল—এই উৎপাদন ব্যবস্থা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতা দাবী করে। এরজন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা সামাজিক কর্তব্যবোধ ব্যতীত সম্ভব নয়। স্বামীজীর জীবসেবার আদর্শ বিভিন্ন নর-গোষ্ঠী তথা উৎপাদন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত করলেই আর্থ-সামাজিক সংহতি সম্ভব। ভারতে এই সংহতি মূলত ধর্মতন্ত্রমূলক ও সমাজকেন্দ্রিক।

কেবল রাজশক্তির দ্বারা তা লাভ করা যাবে না। বিবেকানন্দের মতে রাষ্ট্র মানবিক ক্রমবিকাশের একটি স্তর—মানুষের পূর্ণতার প্রতীক নয়। ভারতরাষ্ট্র গঠন করা বহুবচন ভারতীয় সমাজ ও কৃষ্টিগত জীবনের অন্যতম একটি প্রয়াস মাত্র। কাজে কাজেই তাকে ভারত-সংস্কৃতির স্বাভাবিক জীবনস্রোতের দ্বারা পরিচালিত করা উচিত। নিবেদিতা বলেছেন : "জাতীয় জীবন দৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটিকেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত উহা শুনিল; এবং এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিল। ত্যাগই ভারতীয় জাতীয় জীবনের উৎস।" ভারতের প্রত্যেকটি নর-নারীর মধ্যে বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শ-কে জীবসেবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই উৎসব্যতিরেকে সাংবিধানিক গণতন্ত্র, লোকসভা, রাজ্যসভা, আইনসভা সবই অন্তঃসারশূন্য হয়ে স্বার্থ হানাহানির খোঁয়াড়ে পরিণত হয়।

সমাজের শাসক শ্রেণীর স্খলন কিভাবে হয় তা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী ভারতীয় ধর্মবোধ ও তার আদর্শ বুঝিয়ে বলেছেন : বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য্য,—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—সঞ্চিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনই সর্বনাশের সূত্রপাত।" আর আত্মবুদ্ধি বিভেদকামী, তাই সে পরপীড়ন দ্বারা নিজের বিশেষ অধিকার কায়েম করতে চায়। এর দ্বারাই সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। সংহতির আশা স্বপ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় বুর্জোয়া ও মুষ্টিমেয় ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এই আত্মবুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে বলেই দেশের ৮০ শতাংশ আপামর জনসাধারণ এদের থেকে আজ বিচ্ছিন্ন—পরিচিতি ও ভালবাসার অভাবে। আগে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের শরিক হয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের নানাবিধ সেবা করতে হবে, তাদের জন্য বিদেশীর কাছে কুন্ঠিত হলে চলবেনা—সংহতির ক্ষেত্র তখন তৈরী হবে। নিজেরা মানুষ না হয়ে "আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও" বলে শিক্ষিত শতকরা ২০ জনের নকল নবীশী যে সংবিধান তৈরি করে দিলেন তার ফল যা হবার তাই হচ্ছে। স্বাধীনতা পাওয়ার ৪৩ বছর যাবৎ যত নেতা এই সংবিধানের কল্যাণে ভোটের কাঙাল হয়ে শাসকশ্রেণীর আত্মবুদ্ধির মোহ-জালে জড়িয়েছে তার তুলনীয় গান্ধীজীর তিরোধানের পর সমাজসেবার কাজে —যথা অস্পৃশ্যতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র দূর করার কাজে—গৌরবের বোধ নিয়ে কতজন নেতা এত বড় অনগ্রসর দেশে আগ্রহ দেখিয়েছে? পেট্রিয়ট হওয়াটা যেন রাজশক্তির অংশীদার হওয়ার নামান্তর।

---

সায়েন্স অব সোসাইটি (ইণ্ডিয়া) আয়োজিত ২৯ নভেম্বর' ৯১-তে সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা।

# ছোবল

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

তুফানি দিঘি থেকে উঠে আসছে। দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল ছুঁই ছুঁই। গাছের ছায়া দীর্ঘ। চার পাশের উঁচু পাড়, গাছ-গাছালি, পেঁজা তুলোর অসংখ্য ভেলা বুকে নিয়ে নীল আকাশ যেন দিঘির কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দিঘির আয়নায় এখন স্থল ও আকাশের জড়ানো মুখ। তির্ তির্ বাতাসে জলের মৃদু কম্পন মুখটাকে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে অনবরত।

সেই কখন দিঘিতে এসেছিল তুফানি, তখন ঘাটে ঘাটে বেশ ভিড়। স্নান, কাপড়-চোপড় কাচা, ধোয়া-পাকলানো, আরো কত ধান্দায় ভিড় জমে। গোরু-মোষ স্নান করানো থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা সবই এই হাজা-মজা দিঘি ঘিরে। তুফানির মেটে হাঁড়িটায় এখন অনেক কিছু জমেছে—ছোটো ছোটো নানা রকমের মাছ, কাঁকড়া, শামুক আরো কী সব জলজ উদ্ভিদ। হাঁড়িটা প্রায় ভরে উঠেছে। আর না। এতেই হয়ে যাবে আজকের মতো। তুফানি মাথায় তুলে নেয় হাঁড়িটা। ওটা বাঁ হাতে ধরে। ডান হাতে এলো-মেলো কাপড়-চোপড় ঠিক করতে করতে ডাঙায় এসে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। সারা শরীর থেকে জল ঝরছে। এদিক ওদিক তাকায় তুফানি। চারিদিক নির্জন। কাউকে দেখা যায় না। শুধু একটা নিঃসঙ্গ ঘুঘু মাঝে মাঝে বুক-ফাটা হাহাকারে চারিদিকের নির্জনতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। তুফানির বুক কেঁপে উঠল।

ডান দিকের প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটার দিকে তাকালে এখন গা ছম্ ছম্ করে। গত বছর এক গ্রীষ্মের দুপুরে হারু নিজের পরণের কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে পাকুড়ের ডালে ঝুলে পড়েছিল। বিকেলের দিকে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে দলে দলে মানুষ এসে জুটেছিল এই দিঘির ধারের পাকুড়তলায়। কত লোকের কত কথা। সত্যির চেয়ে মিথ্যে বেশি। বাস্তবের থেকে কল্পনা প্রখর। অনেকের বেশ দুঃখ দুঃখ ভাব। আবার অনেকের জিভ্ রসালো আলোচনায় লালাসিক্ত হয়ে ওঠে। বিচিত্র মানুষের সমাবেশ হয়েছিল এই পাকুড়তলায়।

তুফানি ঘরেই ছিল, কিন্তু তার কানে খবরটা এসেছিল একটু দেরিতে। শুনে সে নিথর হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে গরম্ রক্তের দাপাদাপি। কান ঝাঁ ঝাঁ। মাথার ভিতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল যেন। সেখানে বিরামহীন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। তুফানির পা উঠছিল না। প্রাণপণ দৌড়েও যেন এগোতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, দু-চোখ ফেটে জল নয়, রক্ত গড়িয়ে পড়বে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কিছুই বুঝতে পারছিল না তুফানি। এলোমেলো পদক্ষেপে সে পাকুড়তলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। তার পায়ে বল নেই। অবশ দুটি হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সে এগোচ্ছিল।

আজ দুপুর শেষে দিঘি থেকে উঠে এসে কেন জানি সেই ছবিটাই ভেসে উঠল তুফানির চোখের সামনে। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল পাকুড় গাছটার নিচে। সেই ডালটা নেই যেটায় হারু গলায় ফাঁস লাগিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা কেটে ফেলেছে। ঐ ডালটায় নাকি হারুর অতৃপ্ত আত্মা বাসা বাঁধবে, সকলকে জ্বালাতন করবে। তুফানির ওতে বিশ্বাস নেই। সে জানে, হারুর আত্মা তাকে ঘিরেই ঘুরে মরবে অহর্নিশ। ও মরেও তুফানিকে ছাড়তে পারবে না। তুফানি ভাবে, এখনো হয়ত হারু ওর আশেপাশে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

ঘোর কমে তুফানি বাড়ি ফিরে আসে। সে ভুলে যেতে চায় হারুর বেত্তান্ত। কী হবে ঐ সব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে।

তুফানি দাওয়ার ওপর হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল। ভেজা চুল, মুখ, হাত-পা মুছে কাপড় পালটে নিল।

ঘরে ঢুকে দেখল, বুড়ো বাপ হলদেটে চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মনে হয় নিষ্প্রাণ। উপর পাটির অবশিষ্ট দুটি নড়বড়ে দাঁত সব সময়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে। নিচের পাটিতে একটিও নেই। গাল ভাঙা ঈষৎ হাঁ করা তোবড়ানো মুখটা দেখলে তুফানির মনে ভীষণ কষ্ট হয়। মায়া লাগে। কংকালসার দেহটা খিদের জ্বালায় কুঁকড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, তবুও মুখে এতটুকু শব্দ নেই। হয়ত শব্দ করার কোনো ক্ষমতাই নেই। কিংবা তুফানির জন্য নীরব অপেক্ষা।

দাওয়ার একপাশে রান্নার ব্যবস্থা। দিঘি থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসা

জিনিসগুলো কেটে কুটে ধুয়ে পরিষ্কার করে উনুনে চাপিয়ে দেয়। তেল-মশলা নেই। নুন দিয়ে সেদ্ধ করা ছাড়া উপায় কি ?

বুড়ো বাপ ঘর থেকে বাইরে আসে। তুফানির কাছে এসে বসে। তোবড়ানো মুখের কোঁচকানো চামড়ায় এলোমেলো তরঙ্গের ছোঁয়া লাগে যেন। চোখে খুশির মাত্রা। মুখে জল কাটতে থাকে। উত্তেজনায় বুকে হাপর টানে। আস্তে আস্তে সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে, "অ তুফানি, এখনো হোল নি। দে দিনি, যা হয়েছে তাই দে।"

"কাঁচা খাবা ? আর এট্টু সবুর করো।"

"ভাত নাই ?"

"না।"

বুড়োর মুখে এক চিলতে কালো মেঘ ছায়া ফেলে। নিজের ডান পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "ও-গুলা কী সিদ্ধ করিস ? আমিষের বাস আসে যেন।"

"ঐ মাছ-কাঁকড়ার গন্ধ পাও।"

বুড়োর ভাটা-পড়া চোখও চক্ চক্ করে ওঠে। মুখের ভিতরে লালাসিক্ত জিভটা যেন অস্থির হয়ে ওঠে। খুশিতে হেসে ফেলে সে।

ঠিক সেই সময়েই প্রচণ্ড শব্দে চমকে ওঠে তুফানি আর তার বুড়ো বাপ। প্রথমটা বুঝতে পারে না। পরক্ষণেই "কী সব্বোনাশ হইল গ" বলে তুফানি চিৎকার করে ওঠে। বুড়ো দেখে দাওয়ায় উঠোনের মতো আলো। তার চোখের সামনে খোলা-মেলা আকাশ।

তুফানি দাওয়া থেকে নেমে এসে দেখে পশ্চিমদিকের দেওয়ালটা ধসে পড়েছে। মাটির দেওয়াল। পুরোপুরি মাটির নয়। বাখারি সাজিয়ে তার উপর পুরু করে মাটির প্রলেপ দেওয়া। ঘরের উপর মাটির ছাউনি। খড় জোটে না। কোথা থেকে ছন্ কেটে নিয়ে এসে ছাউনি দিয়েছিল হারু। ও নিজে হাতে সব করেছিল। হাতে হাতে এগিয়ে দিয়েছিল তুফানি। হারুর সঙ্গে কাজ করতে করতে হেসে ফেলেছিল সে। নদীর স্রোতে জলের কলকল শব্দ যেমন হয় তেমনি। হারু অবাক। থমকে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "হঠাৎ কী হলো ?" তুফানি আঁচল দিয়ে মুখ, ঘাড়, গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলেছিল, "না, এমনি।"

"পাগল না-কি ?"

"হু জানেই।" বলে আবার হেসেছিল তুফানি। তারপর গাঢ় নিচু স্বরে হারুর বাঁ হাতটা টেনে ধরে বলেছিল, 'পাখিরা দুজনে এক সঙ্গে বাসা বান্ধে।' তুফানির ডাগর দুচোখে ঝিলিক খেলে গিয়েছিল। ফুটে উঠেছিল কিসের ইঙ্গিত। প্রায় স্বগতোক্তি করেছিল সে, "জানো না, কখোন তারা বাসা বান্ধে?" হারু চমকে উঠেছিল।

সে তো বছর তিনেক আগের কথা। এর মধ্যে আর ঘরের চাল ছাওয়া হয়নি। অন্তত তিনটে বর্ষা গেছে। ফলে থাকেই বা কী। এখন ঘরে শুয়ে চাঁদ দেখা যায়। দেখা যায় নক্ষত্রপুঞ্জ। মাথা গোঁজার ঠাঁই নামেই। আস্তে আস্তে ঘর আর পথের তফাৎ ঘুচে যাচ্ছে। পথে নেমেছে তুফানি।

বুড়ো খাওয়ার জন্য চিৎকার করে ওঠে। তুফানির সম্বিত ফিরে আসে। সে দাওয়ার দিকে সরে এসে দাঁড়ায়।

"আর যে পারি না, তুফানি। দে, আমারে খাতি দে।"

বুড়োর অবুঝপানা কাণ্ড-কারখানা দেখে তুফানির রাগ হয়। সে খর চোখে বুড়োকে জরিপ করে। ওর কি মাথাটা একেবারে গেছে। ঘরের অর্ধেকটাই ধসে গেল। মাথা গোঁজার চিন্তা নেই। বুড়ো নির্বিকার। কষের দুধার দিয়ে কালচে দুটো দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। মুখটা ঈষৎ হা করা। কালচে জিভ্‌টা তির্‌ তির্‌ করে কাঁপছে। নিষ্প্রাণ চোখ তারাহীন।

তুফানি বলে, "থাকবা কোথায়?"

"প্যাট যে মানে না তুফানি, খাতি দে।"

"হ, খাবার পর শোবা কই।"

"সারাদিন কিছু প্যাটে পড়ে নাই যে তুফানি। আর বাঁচি না।"

তুফানি বুঝতে পারে, বুড়ো বাপটা তার অবোধ শিশু। তবু তার বাপটা একটা দেওয়াল। দুর্বল, নড়বড়ে। পাতলা হাওয়ায় কাঁপে। তবু তো আড়াল। কোন্‌ দিন পশ্চিমের দেওয়ালটার মতো সে ধসে যাবে। সে কথা ভাবতে তুফানি শিউরে ওঠে।

এমন দিনে যদি হারু থাকত নিশ্চয় সে তুফানিকে রক্ষা করত। পেটানো স্বাস্থ্য তার। শক্ত-পোক্ত। মনটা নরম। কিন্তু অন্যায় সহ্য করতে পারত না। অন্যায় দেখলে তার পেশী শক্ত হয়ে উঠত। চোখ মুখের চেহারা পাল্টে যেত। তখন হারুকে কেমন যেন অচেনা অচেনা ঠেকত।

কিন্তু হারু শেষ পর্যন্ত নিজেকেই কি রক্ষা করতে পারল। সে কথা ভাবলে

তুফানি অস্থির হয়ে ওঠে। তার মনের ভিতরে দাউ দাউ আগুনের প্রবাহ। ভাবনায় হাল ভেঙে সে দিশেহারা। তরঙ্গায়িত জীবন নদীতে হারু ভিতি হিশেবে এসেছিল। সেই ভিত্তিই ছিল তুফানির আশ্রয়। কিন্তু ডুবে গেল।

হারুর সামনে এ গাঁয়ের কেউ দাঁড়াতে পারত না। কালো পাথরের শরীর। এই অ্যাত্ত বড়ো বুকের ছাতি। হাত দুটো শক্ত লোহার মতো। হাসলে শাদা দাঁতের ঝিলিক দেখা যেত। রাগলে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠত। সারা শরীরে কী যেন ভর করত। তুফানির বুকের ভিতরটা তখন ঢিপ্ ঢিপ্ করত। কিছু বলতে পারত না হারুকে। কথাগুলো জড়িয়ে যেত গলার ভিতর। তবু বুকের ভিতর হারুর জন্ত কী রকম যেন করে উঠত। তুফানি বুঝিয়ে বলতে পারে না।

সেবার আশ্বিনের মাঝামাঝি শুরু হল টানা বৃষ্টি। তিন দিন পার হয়ে গেল। থামে না। চারদিক জলে থৈ থৈ। এমনিতেই বর্ষায় সব পরিপূর্ণ। তার উপর এই বাড়তি জল। চারিদিকে ঢল নেমেছে। মাঠে মাঠে পুষ্ট ফসল। সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ঘুম নেই দিনে রাতে। দক্ষিণের বাঁধের অবস্থা মোটে সুবিধের নয়।

সন্ধের মুখে হারু ফিরল। ক্লান্ত। অবসন্ন। সারাদিন জলে জলে ঘুরেছে। দাওয়ার ভিজে মাটিতেই থপ করে বসে পড়ল। হাত দুটো পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "তুফানি একটু চা খাওয়াতে পার?"

"পারি।" তুফানি যেন প্রস্তুতই ছিল। "দুধ নেই। দুধ ছাড়া খাবা?"

"দাও।"

ভেলি গুড় আর চায়ের পোঁটলা নিয়ে চা তৈরি করতে বসল তুফানি। জালানি ভিজে। জ্বলতে চায় না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে ওঠে। তুফানি জিজ্ঞেস করল, "মাঠের অবস্থা কেমন দেখলা? তলিয়ে যায় নি তো?"

"না। তবে বাঁধ ভাঙলে আর উপায় নেই।"

"আমার বাপ কোথায়?"

"আছে মাঠে ঘাটে কোথাও। এখন জল তো শত্তুর। কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে সর্বোনাশ করবে কে জানে।"

"বাপ্ আমার কোথায় গাঁজা সেবার ফিকিরে ঘুরছে তাই ভাখো।" তুফানির স্বরে বিরক্তি। সে তার বাপকে হাড়ে হাড়ে চেনে। জমি নয়, গাঁজার কলকে বুক দিয়ে আগলাবে। "এ বছর তুমি ঘরটা ছেয়ে না দিলে

বর্ষায় যেতাম কোথায়? বুড়োর কি সে দিকে নজর আছে? কথা বলতে বলতে তুফানি চায়ের গেলাসটা হারুর দিকে এগিয়ে দেয়। "নাও।"

গেলাসটা নিয়ে মুখের কাছে ধরতেই ফটিক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল বাঁধের ওপর জটলা হচ্ছে। এখুনি মারামারি লাগবে মনে হচ্ছে। "শিগ্‌গির চলো হারুদা। পুব পাড়ার মণ্ডলদের জমি ভেসে গেছে। ওরা না-কি আমাদের জমির ওপর দিয়ে জল বের করবে।"

হারু সটান উঠে দাঁড়াল। তেল চুকচুকে লাঠিটা হাতে তুলে নিল। ফটিককে বলল, "চ"।

"চা খাবা না?"

কোনো জবাব দিল না হারু। হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

তুফানি হারুর সেই মূর্তির কথা ভাবে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

তুফানির ঘর ভেঙে গেল। হারুর তৈরি চালটা ঝুলছে। হারুর মতোই ঝুলছে যেন। যে-কোনো সময় পড়ে যাবে। খুঁটিগুলোও নড়বড়ে, বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো, তার বুড়ো বাপের শরীরের মতো, অথবা তুফানির জীবনের মতো। কী করবে সে ঠিক করতে পারে না। সে বেদিশে। শরীর কাঁপিয়ে, কলিজা মুচড়ে গরম শ্বাস বেরিয়ে আসে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে উপর দিকে তাকায়, দেখে, মাথার উপর নীল সামিয়ানার মতো আকাশ; আর তাতে কয়েক পোঁচ লালচে রক্তের দাগের মতো মেঘ হুম্‌কি দিচ্ছে। গ্রীষ্মের বেলা শেষে আকাশের এই পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কী বার্তা বয়ে আনবে কে জানে। তবু তুফানি ভাবে, তার মাথার উপর আকাশ ছাড়া কি-ই বা রইল।

দেওয়াল ধসে পড়ার শব্দে একে একে পাড়ার লোকজন জমতে শুরু করেছে তুফানিদের উঠোনে। তুফানি অবাক। সকলের শোক যেন উথলে উঠেছে। কোনোদিন কেউ খোঁজ খবর নেয় নি। বরং ফিস্‌ফাস্ গুজ্‌গুজ্ করেছে তাকে দেখে। যা নয় তাই বলেছে। এমন-কি ফিকির খুঁজেছে বিপদে ফেলার জন্য। হারুকে জড়িয়ে নোংরা কথার পাহাড় তৈরি করেছে এরা। তুফানি বোঝে না মানুষ কেন এমন হয়। কারো ব্যক্তিগত জীবন যাপনে কেন তাদের এত উৎসাহ!

অনেকেই শোক জানিয়ে চলে গেল। দু-একজন যেন মজা দেখতেই রয়ে গেল। এমন দুর্দিনে কী করে তুফানি, এটাই যেন তাদের দেখার বিষয়।

ফটিকের বুড়ি পিসিটা গলা কাঁপিয়ে থেমে থেমে অনেকটা গাইয়েনের মতো বলতে থাকে, "হ্যারে তুফানি, তর বড় দেমাক। ক্যানো পাড়া-পিত্তিবাসীদের আগে এট্টু বলতে পারিস্ নি। এখন তো আর হারু নেই। দেখে কে? ওই তো তোদের টানতো।"

গা-পিত্তি জলে যায় তুফানির। আবার, আবার সেই একই ইঙ্গিত। হারুকে ছোটো করলে সহ্য করতে পারে না তুফানি। মাথার ভিতর যেন আগুন জলে ওঠে। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। সে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। মুখে কথা সরে না। সে চায় না হারুকে নিয়ে হাটুরে আলোচনা হোক। অমন একটা মানুষ, মানুষের মতো মানুষ, এ জগতে কটা হয়। হারুর জন্যে ওর বুক ফুলে উঠত। যাওয়ার সময় সে ওর বুক ভেঙে দিয়ে গেছে। হারুর কথা মনে হলে ওর ভাঙা বুকে উথালি-পাথালি কিসের হাওয়া বয়ে যায়।

বুড়ি পিসির দিকে সে খর দৃষ্টিতে তাকায়। কেমন যেন মিইয়ে যায় বুড়ি। তবু স্বগতোক্তি করে, "মাইন্‌ষের মুখ বন্ধ করবি কী করে? কেউ তো আর অন্ধ না। তর কষ্টি-নষ্টির কথা কে না জানে।"

মানুষ? এদের মানুষ বলে? এই দুর্দিনেও এদের মুখে কিছু আটকায় না। সব সময় মুখরোচক একটা কিছু খুঁজে বেড়ায়। তুফানি ভাবে, হারুকে জড়িয়ে এমন নোংরা ইঙ্গিত করতে এদের বাধে না কেন। এই মানুষগুলোর জন্য সে কি-না করেছে। এই তো সেবার মণ্ডলরা যখন জমির জল বের করার জন্য বাঁধ কাটতে এসেছিল তখন হারুই রুখে দাঁড়িয়েছিল। ওদের লাঠিয়ালের আঘাতে মণ্ডল বাড়ির ছোটকর্তার মাথায় সেলাই পড়েছিল। হারুই জমি বাঁচিয়েছিল। বেঁচেছিল ফসল ভরা জমি।

অনেক রাতে দরজায় টোকা দিয়ে নিচু স্বরে ফিস্ ফিস্ করে তুফানিকে ডেকেছিল হারু। উৎকণ্ঠিত তুফানির চোখে ঘুম ছিল না। খুট্ করে দরজা খুলতেই ওর হাতের কুপির আলো তেরছাভাবে হারুর মুখে গড়িয়ে পড়ল। হারু তাড়াতাড়ি ফু দিয়ে কুপিটা নিবিয়ে দিতেই জুবোকালির মতো অন্ধকারে ঢেকে গেল সব। তুফানির হাত ধরে বাইরে টেনে আনল হারু। বলল, "চুপ। পিছনে লোক লেগেছে।" তুফানির বুকের মধ্যে তখন ধক্ ধক্। হাপরের ওঠা-নামা। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। বিরাম নেই। বৃষ্টির শব্দে

চারিদিক মুখর। তারই সঙ্গে তাল রেখে বেজে চলেছে দুটি মানুষের কলিজার এক দুর্বোধ্য সঙ্গীত।

কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে হারু খুব আস্তে আস্তে বলেছিল, "ছোটো কর্তার অবস্থা খারাপ। আমি পালাচ্ছি। আমাকে ধরলে শেষ করে ফেলবে।" হারুর শ্বাসের গরম হাওয়া সে অনুভব করেছিল। অজানা কিছুর আশংকায় তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল কম্পন। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে যেন জর আসছিল। কান্নায় তার গলা বুজে আসছিল। সে বলেছিল, "এ তুমি কী করলা। এখন আমি কী করব? আমার কী হবে?"

"ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলেই আমি ফিরে আসব। তারপর···।" থেমে গেল হারু। পিছন ফিরে তাকিয়েই বলল, "চলি।"

"না।" হাতটা জড়িয়ে ধরল তুফানি।

"ছাড়ো। ছেলেমানুষী কোরো না।" এক ঝটকায় তুফানিকে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

সেই থেকেই হারু প্রায় গ্রামছাড়া। মণ্ডল-বাহিনী তাঁকে খুঁজে বেড়াত তন্ন তন্ন করে। বিশেষ করে ছোটো কর্তার রোখ্ চেপে গিয়েছিল। তাড়াটে লোক লাগিয়েছিল হারুকে নিকেশ করার জন্য। তুফানিদের বাড়িতেও হানা দিয়েছে তারা।

তবু বার কয়েক হারু দেখা করেছে তুফানির সঙ্গে। গভীর রাতে গোপনে আসত। রাতের অন্ধকারেই চলে যেত। আসলে তুফানি আর হারুর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত ফটিক। ফটিকের কাছ থেকেই তুফানি জানতে পেরেছিল, মণ্ডলরা ব্যাপারটা নিয়ে থানা-পুলিশ করতে চায় নি, নিজেদের হাতে রেখে অন্যভাবে সমাধা করতে চেয়েছে এই সমস্যার, যাতে গোড়াতেই শত্রুর খতম হয়, কোনো কিছু জিইয়ে রাখা ছোটো কর্তার একেবারেই বাতে সয় না।

ফটিক নিয়মিত আসত। ক্রমশ হারুর ওপর সে বিরক্ত হয়ে উঠছিল, "ছোটো কর্তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে সব মিটিয়ে নিলেই পারে হারুদা। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ভাল লাগে না।" ফটিকের মুখে এ কথা শুনে অবাক হয়েছিল তুফানি।

একদিন সন্ধে বেলায় ওর সঙ্গে ছোটো কর্তা তুফানিদের বাড়িতে এসেছিল। তুফানির সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। কুত্‌কুতে চোখে আড়ে

আড়ে দেখেছে তাকে। জোর সলাপরামর্শ করেছে ওর বুড়ো বাপের সঙ্গে। লোভ দেখিয়েছে কাদের, পয়সার। নিচু স্বরে ফিস্ ফিস্ করে কী সব বলতে দেখেছে। বুড়োর মরা চোখে আলো জলে উঠেছে। কষ দিয়ে ঝল গড়িয়ে পড়েছে। ছোটো কর্তা মাঝে মাঝেই হাসছিল। বেরিয়ে পড়েছিল ধুঁধুলের কাদে। বিচির মতো দাঁতগুলো। হাসিটা নোংরা। কিসের ষড়যন্ত্র চলছিল।

ওরা চলে গেলে তার বাপ তুফানিকে কাছে বসিয়ে মিষ্টি করে বলেছিল, "হারু আসে না? ওর জন্তে তর মন খারাপ হয় না?"

"হঠাৎ এসব কথা কেন?" ফুঁসে উঠেছিল তুফানি।

"না, মানে ই'য়ে আর কি, তদের বিয়াডা হওয়ার দরকার। এবার এলে ঘরে আটকাবি।"

তুফানি চোখ সরু করে তাকায়। তার বাপকে মেপে নিতে চায়। তুফানি। সে বিদ্রূপ করে বলে, "ক্যানো, তোমরা হারুকে খাবা না-কি? কী মতলব।"

বুড়োর তখন কী অস্বস্তি। সে কুঁকড়ে গিয়েছিল।

সেই রাতেই হারু এসেছিল। সমস্ত তাকে খুলে বলেছিল তুফানি। বলেছিল, "সাবধানে চলাফেরা কোরো। ছোটো কর্তার জিদ্ চেপে গেছে। আমার ভীষণ ভয় করে।"

হারু হেসেছিল।

তারপর অনেকদিন হারু আসে নি। তা প্রায় মাসখানেক। দিন-রাত অজানা আশংকায় তুফানির বুকের ভিতরটা থর্ থর্ করত। মাথার ভিতরে বিজবিজে চিন্তা। খেতে ইচ্ছে করত না। কেটে যেত নির্ঘুম রাত। শুধু প্রতীক্ষা পরিচিত বিশেষ শব্দধ্বনির জন্ত। শুধুই অপেক্ষা একটা চেনা কণ্ঠস্বরের জন্ত। দিন দিন সে শুকিয়ে যাচ্ছিল।

ফটিক খবর দিত, কিন্তু ভাসাভাসা। তুফানি সন্দেহ করত ওকে। কারণ, খবর দেওয়ার চেয়ে, খবর নিতেই বেশি আগ্রহ ছিল। হারু কবে এসেছিল কিংবা কবে আসবে—এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে চাইত। তুফানি অবাক। ক্রমশই ফটিক অন্ত মানুষ হয়ে যাচ্ছিল।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তুফানি দূর অতীতে হারিয়ে যায়। পুরানো দিন গুলো তার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দে সে চমকে ওঠে। দাওয়ার ওপর শুয়ে বুড়ো বাপ ভাটাপরা চোখ দুটো প্রায় উল্টে গোঙাতে থাকে। সেই সঙ্গে কাশির দমক। হাপরের মতো শীর্ণ বুকের ওঠানামা। তুফানি দাওয়ায় উঠে বাপের কাছে বসে। গভীর মমতায় বুকের ওপর হাত রাখে। সে অনুভব করে, জ্বরে তার বাপের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

যারা এসেছিল তারা এতক্ষণে চলে গেছে। বাড়ি ফাঁকা। ভাঙা বাড়িতে প্রায় খোলা আকাশের নিচে এখন মাত্র দুটি প্রাণী, সে আর তার বুড়ো বাপ। বাপের অঙ্গে যেন যমের ছায়া পড়েছে। লড়াই করতে করতে ক্লান্ত তুফানি এখন যে কোনো অবস্থার জন্য নিজেকে তৈরি রাখে। সে জানে, তার জন্য ভালো কিছুই অবশিষ্ট নেই।

কী করবে তুফানি। উবু হয়ে বাপের মুখের উপর সে ঝুঁকে পড়ে। পিছনে কে যেন এসে দাঁড়ায়। মুখ ফেরাতেই সে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। দেখে, ছোটো কর্তা দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা কঠিন, পাথরের মতো। চোখ দুটোয় ভাটার টান। জামা ঘামে ভিজে সপ্‌সপে।

তুফানি উঠে দাঁড়ায়।

"ফটিক এসেছিল?" ছোটো কর্তার খলিত কণ্ঠস্বর।

"হ্যাঁ"

"যাস্‌নি কেন? না খেয়ে মরবি? আমার ওখানে কাজ করলে তোরা জাত যাবে?"

উত্তর দিল না তুফানি। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

এ প্রস্তাব নতুন নয়। হারু জেলায় হওয়ার পর থেকে ছোটো কর্তার ঝোঁক তুফানির ওপর। ওর বাপকে অনেকবার বলেছে তুফানির কাজের কথা। বাপের মত ছিল ষোল আনা। কিন্তু তুফানিকে জোর করার সাহস তার নেই। ফটিককে দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছে। কাজ হয় নি। শেষে ছোটো কর্তা নিজেই বলেছে। কিন্তু তুফানি সায় দেয়নি। বিরক্ত হয়েছে। ছোটো কর্তার নোংরা চোখ দুটো গেলে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। ঘেন্নায় ওর মুখে এখন থুথু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

হারু সাবধান করে দিয়েছিল তুফানিকে। বলেছিল, "ফাঁদে পা দিওনা। ফটিককেও আর বিশ্বাস নেই। ও শালা বিগড়ে গ্যাছে। নেমকহারাম।"

"আমার ভয় করে। ছোটো কর্তা বলে, তোর বিষ দাঁতটা কোথায়? জানিস না? জানে না?"

হারুকে ছোটো কর্তা তুফানির বিষ দাঁত বলে। হারুর ভয়ে সে কিছু বলতে পারে নি, করতে পারে নি। কে জানে কখন কী মূর্তিতে হঠাৎ দেখা দেবে। এসব কথা তুফানির কাছে শুনে হারু হেসেছে। কিন্তু আজ তো আর সে জোর নেই। তার রক্ষাকবচ ছিঁড়ে গেছে। তবু সে এখনো সেই কবচের তাপ অনুভব করে।

"কি রে উত্তর দিস্ না যে?" তুফানির হাত ধরে টানে ছোটো কর্তা। আচমকা টানে টলে যায় তুফানি। ছোটো কর্তার গায়ের ওপর পড়ে।

জড়িয়ে ধরে ছোটো কর্তা। তুফানি দাঁত বসিয়ে দেয় ছোটো কর্তার হাতে। কর্তা হাত ছাড়িয়ে নেয়।

"ও দাঁতে আর বিষ নেই রে তুফানি। তোর আসল বিষ দাঁত অনেক আগেই ভেঙে দিয়েছি। তুই চ। আমার সাথে চ।"

তুফানির মাথার ভিতর বিলিক দিয়ে ওঠে, সেই দৃশ্য। হারু ঝুলছে। সে তখন বুঝতে পারে নি কেন হারু এ কাজ করল। এখন পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

"তুফানি।" গাঢ় স্বরে ডাকল ছোটো কর্তা।

"কি?" ঘুরে দাঁড়াল তুফানি। টানটান। উদ্যত সাপের মতো। দু চোখে প্রতিশোধের আগুন। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত তালে বুকের ওঠা-নামা। রক্তের গভীরে যেন তুফান তোলে হারু। তুফান। তুফান। তুফানি উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

# প্রসঙ্গ ঃ রাসসুন্দরী দাসী-র 'আমার জীবন'

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

"এই বইখানি আমার নিজে হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না।" আজ থেকে শতাধিক বছর আগে এই বাংলারই এক গ্রাম্য, অশিক্ষিত গৃহবধূ রাসসুন্দরী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠকের কাছে তাঁর আত্মকথা "আমার জীবন" বইখানি পড়ার জন্য এইভাবেই সাগ্রহ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রাসসুন্দরী কি ভাবতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পরে (রাসসুন্দরীর মৃত্যুর সঠিক সনটি জানা না গেলেও মনে করা হয় ১৮৯৭-৯৮ সালের পরে তাঁর মৃত্যু হয়) তাঁর আত্মকথা পড়ে এ-যুগের কোন এক আধুনিকা অবাক বিস্ময়ে তাঁর সময় এবং জীবন নিয়ে ভাববে, ভেবে আনন্দে বিস্ময়ে তাঁকে নিয়ে লেখার জন্য অপটু হাতে লেখনী তুলে নেয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে।

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধনমান—কালস্রোতে সব ভেসে গেলেও সময়কে জয় করে কিছু সৃষ্টি যে টিকে থাকে, থাকতে পারে এ কথা রাসসুন্দরী সম্ভবত ভাবেননি। এরকম অনেক বই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। কিন্তু পর পর কয়েকটি সংস্করণের মধ্য দিয়ে রাসসুন্দরীর আত্মকথা শুধু তার অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখেনি, আধুনিককালের পাঠক-পাঠিকার কাছে বইটির জনপ্রিয়তাও অব্যাহত আছে। হয়তো বাঙালী মহিলার বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম আত্মজীবনী হিসাবে বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে, অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে সমাজে নারীর অবস্থান এবং নারীজীবনের সার্থক বাস্তব আলেখ্য রূপায়ণে, অথবা রাসসুন্দরীর লেখার "একটী অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্যের" জন্যই বইটি আজও আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। আমার ভাল লাগার কারণটি কিন্তু অন্য—রাসসুন্দরীর বিদ্যাশিক্ষালাভ এবং পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, প্রবল বাধা এবং সামাজিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও অদম্য অধ্যবসায় এবং আন্তরিকতায় সে প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন—তাঁর সময়ের এক সাধারণ গৃহবধূর পক্ষে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বলেই

আমার মনে হয়েছে। রাসসুন্দরী এক্ষেত্রে পুরোবর্তিনী বলে আমার প্রণম্য হয়েছেন।

নারী জাগরণ দূরে থাকুক, নারী যখন তার অস্তিত্ব ও অবস্থানে সঙ্কুচিত হতে হতে অন্ধকার গৃহাভ্যন্তরে অর্থহীন জীবনযাপনকেই স্বাভাবিক বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছিল, সেই সময়ে রাসসুন্দরী জেগে উঠলেন। এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গ ইচ্ছায় আলোড়িত হল তাঁর শরীর-মন, তাঁর চেতনা। তাঁকে পুঁথি পড়া শিখতেই হবে। একটি নিষিদ্ধ স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করার দুর্মর বাসনা রাসসুন্দরীকে অস্থির করে তুলল। তাঁর এই অস্থিরতার মধ্যেই হয়তো নিহিত ছিল সমগ্র নারীসমাজের আত্মপ্রকাশের আকুল আকাঙ্ক্ষা। সময় এবং সমাজকে অতিক্রম করে এক নারীর জেগে ওঠা এবং জয়ী হওয়ার দুর্মর বাসনার এক অনবদ্য দলিল হিসাবেই 'আমার জীবন' আমাকে আকর্ষণ করেছে সবচাইতে বেশি।

রাসসুন্দরী সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে আমরা জানতে পারি ১৮১০ সালে পাবনা জেলায় পোতাজিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। শৈশবে-মাত্র চার বছর বয়সের সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বারো বছর বয়সে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার রাসদিয়া গ্রামের সীতানাথ সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বারোটি সন্তানের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ও আইনবিশারদ কিশোরীলাল সরকার এবং কন্যা সরলাবালা সরকার কলকাতার বিদ্বৎসমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

রাসসুন্দরী তাঁর আত্মকথা শুরু করেছেন এভাবে, "১২১৬ সালের চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।" এই বই এরই অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "১২১৬ সালে চৈত্রমাসে আমার জন্ম হইয়াছে, এক্ষণে ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৫ বৎসর হইল।" তাঁর দেওয়া সন তারিখের মধ্যে বেশ কিছু গোলমাল দেখা যায়। গ্রন্থ প্রকাশের যে তারিখ তিনি দিয়েছেন তাতেও সন্দেহ থেকে যায়। তাঁর দেওয়া তারিখ অনুসারে "আমার জীবন" ছাপা আরম্ভ হয় বাংলা ১২৭৫ সালে, অর্থাৎ ১৮৬৮—৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। অন্যদিকে বেঙ্গল লাইব্রেরীর দেওয়া তারিখ অনুসারে বইটি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। শৈশব থেকে ষাট বৎসর পর্যন্ত জীবনের কথা তিনি শুনিয়েছেন তাঁর আত্মকথায়। লেখা

শেষ করেছেন অষ্টআশি বছর বয়সে। তাঁর আশা ছিল—তাঁর জীবনের বাকি পঁচিশ বছরের কাহিনী তাঁর কোন উত্তরসূরী লিপিবদ্ধ করবেন। আত্মকথা শেষ করেছেন তিনি এই আশা ব্যক্ত করে, "আমার জীবনচরিত্র—২য় ভাগ এই পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকিল। আমার জীবনান্ত হইলে আমার বংশের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি আমার শেষ ভাগ লিখিবেন।" "আমার জীবন" দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শৈশব থেকে ১২৮০ সন পর্যন্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ এরপর থেকে ১৩০৪ সালের ঘটনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বার বছর বয়সে রাসসুন্দরীর যখন বিয়ে হয় তখন বাংলায় নবজাগরণের সবে সূচনা হতে চলেছে। কলকাতায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রবল আন্দোলন রামমোহন সবে শুরু করেছেন, বিদ্যাসাগর মাত্র ছ'বছরের শিশু। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামে স্বামীপুত্রবতী বর্ষিয়সী রাসসুন্দরী যখন তাঁর জীবনকথা লিখছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" সদ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পনের। নারীশিক্ষা আন্দোলন, গ্রামে দূরের কথা শহরেও তখন দানা বাঁধেনি। সতীদাহ ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত, বিধবাবিবাহ সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ, উপরন্তু কৌলীন্য প্রথার উপদ্রবে কুলীন কন্যার জীবনে যে অভিশাপ ও অপমান নেমে এসেছিল তাকেই অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়ে অনপনীয় দুঃখ ও বঞ্চনার বোবা নীরবে আমৃত্যু বয়ে বেড়ানোই নারীত্বের চিরন্তন পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাসসুন্দরী বড় রকমের কিছু করার স্বপ্ন দেখেননি। লেখার মাধ্যমে বড় রকমের আঘাত হেনে সমাজকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টাও তিনি করেননি। এটা ভাবাই তখনকার দিনে কোন নারীর পক্ষে ছিল ধৃষ্টতা, অমার্জনীয় অপরাধ। কোন মেয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেই গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা তাকে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করতেন। এই বলে, "বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতে পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না। একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত। আমাদের কালে এত আপদ ছিল না।" (আমার জীবন : পৃ ৩১)

কিন্তু মেয়েরা কি বিদ্যাচর্চা করেননি রাসসুন্দরীর আগে? অবরুদ্ধ বাসনা চরিতার্থ করতে তাঁরা অবগুণ্ঠনের আড়ালে, লোকচক্ষুর অগোচরে, কখনো

প্রকাশ্যে বিদ্যাচর্চা করে গেছেন এর ঢের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একশো বছর আগে এদেশে কতজন মেয়ে লেখাপড়া জানতেন তার সঠিক বিবরণ আর কোনদিন না পাওয়া গেলেও মেয়েরা অনেকেই যে সাহিত্যের স্বাদ পেতে অভ্যস্ত ও আগ্রহী ছিলেন তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রসন্নময়ী দেবীর লেখা থেকে জানতে পারি সে সময়ে গ্রামের মহিলাদের মধ্যেও লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। তিনি লিখেছেন—"আমাদের গ্রামের অধিকাংশ রমণী তৎকালেও লেখাপড়া জানিতেন।" লোকনিন্দার ভয়ে অনেকে রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়তেন, কলকাতায় এ জাতীয় বাধা ছিল না। বাধা ছিল না এমন জায়গা, যেমন বৈষ্ণবদের আখড়ায় বিদ্যাচর্চা হত, সমাজের বিধিনিষেধ সেখানে বিশেষ না থাকায় বৈষ্ণবীরাও লেখাপড়া শিখতেন। তারপর নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী কেউ কেউ হয়ে উঠতেন গ্রন্থানুরাগিণী। ছাপা বই ছিল না, ছিল হাতে লেখা পুঁথি। কখনও নিজের হাতে এঁরা নকল করে নিতেন পছন্দসই বই, আবার কখনও পেশাদার লিপিকারকে টাকা দিয়ে নকল করিয়ে নেওয়া হত বিশেষ কোন বই। শুধুমাত্র পুণ্যার্জনের জন্য এসব বই নকল করানো হত একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। যে পুস্তক পাঠের জন্য রাসসুন্দরীর মন ব্যাকুল হয়েছিল, যে বই পাঠের মধ্যে দিয়ে তাঁর পাঠাভ্যাসের সূচনা হয়, সেই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটিও হস্তলিখিত ছিল।

রাসসুন্দরীর বই পড়ার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি লেখেন, "আমার মন যেমন পুস্তক পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তেমনি পুস্তক পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। ওই বাটীতে যে কিছু পুস্তক ছিল ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, আঠারো পর্ব জৈমিনি ভারত, গোবিন্দ লীলামৃত, বিদগ্ধ মাধব, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরাণ এই সকল পুস্তক ওই বাটীতে ছিল। কিন্তু বাল্মীকি-পুরাণের আদিকাণ্ড মাত্র ছিল, সপ্তকাণ্ড ছিলনা।···আমার মন সেই সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি পুরাণের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল।" রাসসুন্দরী না পেয়ে বড় ছেলেকে বললেন। ছেলে তাঁকে আশ্বাস দিলেন কলকাতায় ফিরেই বইটি তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। বইটির জন্য অধীর অপেক্ষায় রাসসুন্দরী প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর কথায়,— "আমার মন ওই পুস্তক পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিল যেন আমার শরীরে কত রোগ উপস্থিত হইয়াছে। মনের এই প্রকার যন্ত্রণা হইতে লাগিল।" যেহেতু বইটি ছিল বাল্মীকি-রামায়ণ, সে কারণে রাসসুন্দরীর এই

আকুলতাকে আমরা যদি শুধুই পুণ্যার্জনের আগ্রহ বলে ভাবি তাহলে ভুল হবে। নিজে পড়তে শিখে রাসসুন্দরী তাঁর তিন ননদকে পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন। তাঁর আনন্দকে তিনি ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন সকলের মধ্যে।

দশ বছর বয়সেই লেখাপড়ার প্রতি রাসসুন্দরী আগ্রহী হন। পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে তাঁদের বাড়ীতে সেই সময়ে একটি স্কুল ছিল। ছোট ছোট ছেলেদের পড়াবার জন্ত সেখানে একজন মেম শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। দশ বছরের রাসসুন্দরীকে ঐ পাঠশালার একপ্রান্তে বসিয়ে রাখা হত। পাঠ শিক্ষার জন্ত নয়, শান্ত ও সরল স্বভাবের হওয়ায় দুষ্ট ছেলেমেয়েরা পাছে তাঁকে বিরক্ত করে এই আশঙ্কায়। ছেলেরা বাংলা ও ফার্সী শিখত, চীৎকার করে বানান আবৃত্তি করে মুখস্থ করত, ভীরু বালিকাটি 'মঙ্গলঘটের' মতো নীরবে বসে সব দেখতেন, সব শুনতেন। তাঁর কোন অধিকার ছিল না অংশ নেবার। এইভাবে শুনতে শুনতে তিনি বাংলা অক্ষর ও বানান শিখে ফেললেন—কেউ জানতে পারল না। রাসসুন্দরী লিখেছেন—"তখন সে একদিন ছিল, এখনকার মত মেয়ে-ছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখা-পড়া করিত। একজন মেম সাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে শিখাইতেন। ...তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নক্তি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়েই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। সে কালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না।" দশবছর বয়সের ইচ্ছা আর আকুলতাকে রাসসুন্দরী মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখলেন প্রায় মধ্যবয়স পর্যন্ত। আর যে বয়সে অবসর এবং আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মগোপন করার কথা, সেই বয়সে তিনি নব উদ্যম ও উৎসাহে আত্মকথা লেখায় ব্রতী হলেন।

আজ থেকে প্রায় একশো বাইশ বছর আগে, সমাজের ঘুম ভাঙবার আগেই বাংলার অখ্যাত গ্রামের গৃহবধূ রাসসুন্দরীর মন জেগে উঠল। ঈশ্বরে অদম্য বিশ্বাস এবং দুরন্ত আশায় ভরসা করে সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং বিকেলে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাতে গিয়ে প্রার্থনা করতেন,—'আমাকে

লেখাপড়া শিখাও, পুঁথি পড়িব।" ঈশ্বরের কাছে ছাড়া আর কাউকেই মুখ ফুটে কথাটি বলতে পারেননি তিনি। তর্জনী উচিয়ে ছিলেন সমাজপতিরা। পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার পাবার জন্ত নারীর প্রয়োজন ছিল, লেখা পড়া শেখার জন্ত নয়। ভাবতে অবাক লাগে স্বামীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকেও রাসসুন্দরী তাঁর এই গভীর, অন্তরঙ্গ ইচ্ছাটির কথা কোন দুর্বল মুহূর্তেও তার কাছে বলতে পারলেন না। এতই সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত থাকতে হত তাঁকে।

নারী কখনো এদেশে কি সম্মান ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে? পেয়েছে কি কখনো স্ব-পরিচয়ে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকার? শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে সন্তানের পরিচয় এবং আশ্রয়ে তার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। পুরুষ সমাজ পরিচালনা করায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিয়েছে সৃষ্টির সেই আদিপর্ব থেকেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী শুধু পুরুষের সম্পত্তি, শুধুই ভোগের বস্তু। নারীরও যে স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, স্বাধীনতার স্বাদ পেতে তারও যে ইচ্ছা হয়, শুধুমাত্র সংসারের যাঁতাকলে দিনরাত পিষ্ট হওয়া নয়, মুক্ত বাতাসে তারও যে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে ইচ্ছা করে,—নারীর এই স্বাভাবিক ইচ্ছা কখনো স্বীকৃতি পায়নি। ক্রম আত্মবিলোপ এবং অবদমনের মধ্যে দিয়ে নারী শুধু সংসার প্রতিপালন, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে উঠেছিল। তার জন্ত কোথাও ছিল না দাবীর অধিকার। সতীত্ব, পাতিব্রত্য, মনুর বিধানের অজুহাত দেখিয়ে মেয়েদের নির্বাসিত করা হয়েছিল অসম্মানের অন্ধকার অন্দরমহলে।

দশ বছর বয়সে পুঁথি পড়ার যে বাসনা জেগেছিল রাসসুন্দরীর মনে, যখন পড়তে শিখলেন তখন তিনি বারোটি সন্তানের জননী। প্রতিদিন পঁচিশ ছাব্বিশ জন লোকের রান্না বেঁধে, ঘরকন্নার অজস্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বৃদ্ধা শাশুড়ী ও ননদের সেবার অবসরে, ছেলেমেয়ে মানুষ করতে করতে, কারো কোন সাহায্য ছাড়াই রাসসুন্দরী পুঁথি পড়া শিখে ফেললেন। শুধু পড়তেই শিখলেন না, সে যুগের গৃহবধূর "আত্মগোপনপ্রয়াসী নীরবতার" এবং "কলুর চোখ ঢাকা বলদের" মতো জীবন যাপন করেও এক অপরূপ জীবনালেখ্য রচনা করে ফেললেন। নারীদের যে অবমাননা বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা সঙ্কুচিত যে-জীবন, নিদারুণ বঞ্চনায় দুঃসহ গ্লানিভারে পর্যুদস্ত যে-জীবন, তার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ কিম্বা প্রতিবাদ নেই রাসসুন্দরীর লেখায়। ঘঁাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে ঘঁাধার-চাকাতে বাঁধা মেয়েদের যে গতানুগতিক

জীবন ফল্গুস্রোতের মতো নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, কোলাহলমুখর কর্মচঞ্চল সমাজে প্রতিদিনের "শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে," সেই জীবনের কথাই শুনিয়েছেন রাসসুন্দরী তাঁর লেখায়। মেয়েদের জীবনেও যে কিছু কথা থাকতে পারে শোনবার মতো, শোনাবার মতো, রাসসুন্দরীর আগে সে কথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলেন ?

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আলোড়িত হত রাসসুন্দরীর মন। একদিকে পুঁথিপাঠের প্রচণ্ড বাসনা, অন্যদিকে প্রবল সামাজিক বাধা ও বিরোধিতা। কখনো হতাশ সংশয়ে ভাবতেন, "আমার কিছু হবে না, মিথ্যা বাসনা মাত্র।" আবার বিশ্বাস এসে বাসা বাঁধত মনে। ভাবতেন, "কেন হবে না, পরমেশ্বর যখন আমার মনে এতখানি আশা দিয়াছেন, তখন তিনি কখনই নিরাশা করিবেন না।" ভাবতে অবাক লাগে কী অদ্ভুত ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস, কত প্রগাঢ় ছিল তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস। ক্ষোভ কি ছিল না মনে ? অবরুদ্ধ আবেগ কখনো প্রকাশিত না হলেও আত্মকথায় নিজের অসহায় অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—"পিঞ্জরে ত পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন।" বন্দী জীবনের অসহায়তা আর্তনাদের মতো উচ্চারিত হয়েছে এইভাবে—"মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দশা। চোরের মতো যেন বন্দী হইয়াই থাকি; তাই বলিয়া কি বিদ্যাশিক্ষাতেও দোষ ?"

তাঁর সময়ের মেয়েদের তুলনায় রাসসুন্দরী তুলনমূলকভাবে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। নিস্তারিনীর মতো কৌলীন্য-প্রথা কিম্বা প্রসন্নময়ীর মতো কন্যা-প্রথার শিকার হতে হয়নি তাঁকে। তিনি পিতৃগৃহে সকলের স্নেহ-আদর পেয়েছেন, স্বামীগৃহেও পেয়েছেন সকলের সমাদর। সর্বোপরি ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস তাঁর জীবনকে এক মধুর তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভরে তুলেছিল। ঈশ্বরে সমর্পিত তাঁর হৃদয় এক অন্তর্লীন তৃপ্তিতে ভরে থাকত সব সময়, তাঁর লেখাকেও আচ্ছন্ন করে আছে এই ভগবৎ-বিশ্বাস। মানসিক দৃঢ়তা, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ইচ্ছার ঐকান্তিকতা তাঁকে সমস্তকে অতিক্রম করার সাহস এবং শক্তি জুগিয়েছিল। নইলে নিত্যদিনের সাংসারিক-গৃহকর্মের দুর্বহ ক্লান্তিতে কিছুমাত্র পীড়িত না হয়ে, অল্প সময়ের ব্যবধানে বারটি সন্তানের জননী হবার শারীরিক ও মানসিক ধকল সামলে, একাধারে বধূ, মাতা, গৃহিনীর গুরুদায়িত্ব পালন করে, উৎসাহ, সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই বিদ্যাশিক্ষা-লাভের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল কি করে ?

কেমন করে সকলের অগোচরে পুঁথিপাঠের মতো সমাজে প্রথাবিরুদ্ধ নিষিদ্ধ ব্যাপারটি আরম্ভ করলেন তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন রাসসুন্দরী। চৈতন্যভাগবত পড়ার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়েছিল। পুস্তকখানি কেমন করে তাঁর কাছে পৌঁছল তার বর্ণনাটি এরকম—একদিন রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ শুনতে পেলেন স্বামীর রাশভারী কণ্ঠস্বর। পুত্রকে ডেকে বলছেন,—"আমার চৈতন্যভাগবত পুঁথিখানি এখানে থাকিল। আমি যখন তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও।" শুনে শিহরিত হলেন রাসসুন্দরী। পুঁথিটি তাঁর নাগালের মধ্যে, কিন্তু এর গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা তাঁর নেই। ছেলেবেলায় পাঠশালায় বসে থেকে সামান্য অক্ষর পরিচয় হয়েছিল। তারপর আর কোন চর্চা হয়নি। পরম যত্নে বইটিকে ছুঁয়ে দেখেন প্রিয়জনকে স্পর্শ করার মতো। সবইতো তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, অন্ধকার। স্বামীর ওই পুঁথি থেকে সন্তর্পণে একটি করে পাতা খুলে নিয়ে উনুনের পাশে বসে সকলের আড়ালে দীর্ঘ ঘোমটার মধ্যে নিয়ে গিয়ে পড়বার চেষ্টা করেন। সাদা কাগজের দিকে তাকানোও নারীর জন্য তখন মহাপাপ বলে গণ্য হত। রাসসুন্দরী লিখেছেন—"এমনকি যদি একখানি লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে তাকাইয়া দেখিতাম না, পাছে কেহ বলে যে লেখাপড়া শিখিবার জন্যই দেখিতেছি।" বাড়ীর বৃদ্ধাদের এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি ছিল। সর্বদা ভয় আর সংশয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে। "এই পুস্তকের পাত যদি আমার হাতে কেহ দেখে তাহা হইলে নিন্দার একশেষ হইবেক।"

নিয়মমাফিক ঘরের কাজ করেন রাসসুন্দরী, রান্না খাওয়া সেরে যেটুকু অবকাশ থাকে বুক অব্দি ঘোমটা টেনে গুরুজনদের কাছে নম্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, বুকের মধ্যে বোবা কান্না গুমরে ওঠে। অসহায় আকুতি কেবল পরমেশ্বরের কাছেই জানান—"হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও। আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব।" আজকের নারী প্রগতির ব্যাপক অগ্রগতির দিনে রাসসুন্দরীর সেদিনের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রমের বিনিময়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় এবং অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া সংসার নারীকে আর কোন সুবিধাই দিত না। মূল্যহীন নারী, অশক্ত নারী, সংসারে জঞ্জালের সামিল নারীকে জন্মাবার পর পৃথিবীতে প্রথম অভ্যর্থনা জানানোর নিয়ম ছিল দরজায় পদাঘাত করে। পুরুষের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন অসংখ্য

বিয়ে করে পৌরুষের পরিচয় দিত, কিন্তু "পত্নীর ভরণপোষণ যে একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তাহা তখনকার বিবাহিতদের ধারণায়ও আসিত না।" নারীর সামাজিক অবস্থানটি যখন এরকম সেই সময়ে রাসসুন্দরীর পুঁথিপাঠের প্রবল ইচ্ছা, প্রতিবন্ধকতার পাঁচিল ডিঙিয়ে সার্থকতায় পৌঁছনোর পিছনে এক নতমুখী নারীর নীরব সংগ্রামের ইতিহাসকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাসসুন্দরীর দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা জানার জন্য আমাদের মন স্বভাবতই কৌতূহলী হয়। তিনি কিন্তু আমাদের হতাশ করেন। অদ্ভুত মিতবাক তিনি এ ব্যাপারে। তাঁর এই নীরবতা কি শুধুই স্বামী-সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বলার সংকোচ, নাকি প্রগাঢ় অভিমান বোঝা যায় না। সেকালের গৃহবধূর স্বাভাবিক সংকোচবশত তিনি স্বামীর নামটি তাঁর লেখায় কোথাও একবারও উচ্চারণ করেননি। সুন্দরী এবং গুণবতী স্ত্রীর প্রতি স্বামী সীতানাথ সরকারের প্রেম এবং ভালোবাসার প্রকাশটি কেমন ছিল তা আমরা জানতে পারি না। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "স্বাভাবিক লজ্জাশীলতায় রাসসুন্দরী এই প্রেমের অংশটিই স্বজীবন হইতে বাদ দিয়াছেন—তাঁহার জীবনের অপরাপর দিক দ্বিগুণতর হইয়া উঠিয়াছে। কবি বা ঔপন্যাসিক যে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাসসুন্দরী সেই স্থান হইতে কথা আরম্ভ করিয়াছেন।"

যে লোকটির 'অধীন' হয়ে বারো থেকে ঊনষাট বছর কাটালেন রাসসুন্দরী, তাঁর ভাষায় তিনি 'বেশ লোক ছিলেন।' রাসসুন্দরীর বর্ণনা থেকে সীতানাথ সরকারকে আমার একজন স্থূলাকার, বিষয়সর্বস্ব, কলহপ্রবণ, মোটামোটের মানুষ বলে মনে হয়েছে। তিনি সে তৎকালীন পুরুষসমাজের পৌরুষ এবং প্রতাপের যথাযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন এটা বোঝা যায়। সীতানাথ সম্পর্কে রাসসুন্দরী লিখেছেন—"তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন। তেমন একটি লোক বড় দেখা যায় না। তাঁহার শরীরটি বেশ স্থূলকায় ছিল। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলে যেন কর্তা কর্তা বোধ হইত।" এই উত্তম স্থূলকায় মানুষটির প্রিয় কাজ কি ছিল? রাসসুন্দরী লিখেছেন—"তিনি রাজকার্যেও বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন, আর তিনি মামলা-মোকদ্দমা বড় ভালবাসিতেন। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপ বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন, তদুপযুক্ত তাঁহার বিশ পঁচিশটি মোকদ্দমা লাগিয়াই থাকিত। কখন তিনি মোকদ্দমা ছাড়া থাকিতেন না। ভারী ভারী লোকের সঙ্গে তাঁহার কাজিয়া ছিল। তাঁহার এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ও এমন বিশাল

কণ্ঠধ্বনি ছিল যে, যখন তিনি কোন ব্যক্তির উপরে বিক্রম প্রকাশ করিতেন, তখন গ্রামস্থ সকল লোক কম্পিত কলেবর হইত।" এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ, বিক্রমশালী, বিশাল কণ্ঠধ্বনির অধিকারী পুরুষের পাশে রাসসুন্দরীর নারীসত্তা সর্বদাই যে কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত থাকত, কখনোই যে বিকশিত হতে পারেনি এটা ধরেই নেওয়া যাবে। পুঁথি পাঠের গুপ্ত বাসনার কথাটি কখনো কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সব চাইতে আপন মানুষটির কাছেও যে প্রকাশ করার সাহস তাঁর হল না, এর থেকে বোঝা যায় কতটা ভীত, ত্রস্ত ও সদা সন্ত্রস্ত থাকতে হত তাঁকে। মামলা-মোকদ্দমা-প্রিয় স্বামী সীতানাথ সরকারের স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ এবং অনুরাগ-প্রকাশের অবসর আদৌ ছিল কিনা সেকালের সব স্ত্রীর মতই রাসসুন্দরীও 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই তত্ত্বেরই শিকার হয়েছিলেন তো কিন্তু রাসসুন্দরী স্পষ্ট করে বলেননি। এটাই শুধু অনুমান করা যায় সংসার ও স্বামীর প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে দিতেই নারীর জীবন, যৌবন কখন ফুরিয়ে যেত তা উপলব্ধি করার অবকাশই থাকত না।

আত্মকথায় যে কোন ধরণের আত্মস্তুতিকে সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করেছেন রাসসুন্দরী। নারীসুলভ নম্রতা এবং আত্মগোপনপ্রয়াসী সলজ্জ ভাষণের মধ্যে দিয়ে যত সংক্ষেপে এবং সংযত ভাবে নিজের কথা বলা যায় ততটুকুই বলেছেন। কোথাও অতিশয়োক্তি নেই; কোথা থেকে এই আশ্চর্য পরিমিতি বোধ তিনি পেলেন ভেবে অবাক হতে হয়। তিনি যে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন এই সত্য কথাটি সঙ্কোচবশতই হোক অথবা সাহসের অভাবেই হোক সহজভাবে বলতে পারেননি। বার্ধক্যেও তাঁর সে সঙ্কোচ কাটেনি। গদ্যে বলতে না পেরে পদ্যে চার ছত্র পয়ারের সাহায্যে তাঁকে সে কথা বলতে হয়েছে:

বর্ণটি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল।
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি।
বলিত সকলে মোরে সোনার পুতুলী।

অপ্রকাশের আড়ালে থাকতে থাকতে আত্মপ্রকাশ অথবা নিজেকে বিবৃত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও সমাজে স্পর্ধা হিসাবেই গণ্য হত। রাসসুন্দরী তো সেই সমাজেরই মানুষ ছিলেন। নিজের অবস্থানে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন, সন্তুষ্ট ছিলেন না, আত্মকথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসসুন্দরী লিখেছেন—

"তখন মেয়েছেলেরা লেখা-পড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই।" গৃহকর্মের বাইরে মেয়েছেলের আর কোন কর্ম ছিল না, গার্হস্থ জীবনের বাইরে আর কোন জীবন ছিল না। রাসসুন্দরী আরো লিখেছেন—"বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সেকালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহার সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহির দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না।" এই ছিল সেকালের 'বৌদিগের কর্মের রীতি'। রাসসুন্দরীকেও ঐ রীতি মতোই চলতে হত।

সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে রাসসুন্দরীর স্বচ্ছ ধারণা ছিল। ঊনিশ শতকের শেষভাগে বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে সীমিতভাবে হলেও দেশে নারীশিক্ষার যে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তা দেখে তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন "......এখনকার মেয়েছেলাগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখনকার নিয়ম দেখিয়া আমি বড় সন্তোষ পাইয়াছি। এখনকার মেয়েদের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, এখনকার অন্য অতি উত্তম নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন যাহার একটি কন্যা জন্মিয়াছে, তাহার পিতা মাতা সেই মেয়েটিকে পরম যত্নে শিক্ষা দিয়া থাকেন।" দীর্ঘজীবী হওয়ায় নারী শিক্ষা আন্দোলনের ফলে সমাজে নারীর পরিবর্তিত অবস্থা তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। দেশে নারীশিক্ষার অগ্রগতি দেখে তাঁর কি মনে পড়েছিল ছেলেবেলায় পাঠশালার সেই দিনগুলির কথা, যেখানে গ্রামের সকল ছেলে সুর করে পড়া তৈরী করত, তাঁকে শুধু বসে বসে দেখতে হত, শুনতে হত, মেয়ে বলে কোন অধিকার ছিল না অংশ নেবার কিম্বা চুরি করে চৈতন্য ভাগবতের পাতা একটি একটি করে রান্নাঘরে নিয়ে প্রদীপের নিঃস্রুত আলোয় পড়ার দুঃসহ দিনগুলির কথা।

নিজের জীবনকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই নারীশিক্ষাকে সহজে স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন। এই যে নিজের জীবনকে উপলব্ধি করার গভীর ক্ষমতা, নারীশিক্ষা এবং নারীকল্যাণের জন্ত তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা এটাই প্রমাণ করে যে সামান্ত পুঁথিপাঠের বিদ্যা নিয়েও রাস-সুন্দরী কতটা আধুনিক এবং প্রগতিশীল মনোভাবের অধিকারী ছিলেন।

রাসসুন্দরীর মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পর, নারী প্রগতির এই তুলকালাম সময়ে নারীর জীবনধারার তেমন কি যৌলিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই? শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নারীর পারিবারিক, সামাজিক জীবনের আপাত বৈষম্যের আড়ালে আজো বয়ে চলেছে নারী হয়ে জন্মাবার নিদারুণ অভিশাপ। নারী আজও নির্যাতিত হচ্ছে নির্বিচারে। আধুনিক শিক্ষা কিম্বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোনটাই তাকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। কখনো সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়ায় কখনো স্থূল বলাৎকারে, কখনো এ্যাসিডে দগ্ধ করে কিংবা হত্যার মাধ্যমে চলে নির্যাতন। এ দেশে, নগন্ত ব্যতিক্রমী নারী ব্যতীত, পুরুষের মনোরঞ্জন ও উপভোগের বাইরে নারী কি আজও পেয়েছে আপন পরিচয় ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত হতে?

আজ সংসার থেকে রাজপথ, সর্বত্রই নারীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হলেও শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে নারী সম্বন্ধে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সামান্তই হয়েছে। আজও নারী-শিক্ষার একমাত্র একমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে সংসার ও সন্তানকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ত / যে কোন আলোচনা সভা কিম্বা সেমিনারে শুধু পুরুষ বক্তাই নন, মহিলারাও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সীমারেখা নির্ধারণ করেন এইভাবেই। নারীরাই নারীকে হেয় করেন, ছোট করেন। পুরুষ-শাসিত সমাজের অবক্ষয়ী মূল্যবোধের কারণে শিক্ষিত নারী নিজের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, আক্রান্ত হয় হীনমন্যতায়, আত্মআবিষ্কারের মহৎ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয় না। নিজেকে পুরুষের চেয়ে ছোট ও দুর্বল ভেবে পুরুষের নির্ভরতায় নিরাপত্তা খোঁজে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও নারীসমাজকে আত্মসচেতন করার পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক এক আত্মকথা।

## নন্দিতা চৌধুরীর কবিতা

### ওঁ শান্তি

১.

তুষার ঝড়ে পুড়ল হল কুষ্ঠ হাসপাতাল
এবার তবে শূদ্রাণী মা ভিক্ষা দেবে কাল।
কাল সেখানে যাবার আগে নীলাম শাদা ঘোড়া,
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি কাঁসর বাজায় কারা?

যৌনক্ষতে ম্যাগ্‌নোভি-গান, কলমে দেবদূত,
চাইনি পড়তে, চাইনি লিখতে মহাজনী সুদ,
বাঘের ডেরায় বুলেট ছোঁড়ে হেমন্ত-সন্ত্রাস
মাতৃদুগ্ধে জবুথবু কয়লাখনির লাশ।

দূর্বাশ্যামল-গাভীর প্রেমে ডুবন্ত নীল শব
প্রহর জুড়ে চুনিশালার আর্ত কলরব,
ডানায় গন্ধে অর্থনীতি, টেবিলে মাথহীন,
এবার কেন পুতুলখেলায় দোল-ফাগুনের মাস?

বড় ভালোবাসি ঘুমের জন্য এলোমেলো ঝাউবন,
ঝাঁঝালো সবুজে বিদ্যুৎ-তারকা, মায়োমা নির্বাচন,
বৃষ্টি-লকেটে কলোনি শাসিত; মৃত বাপের কোলে
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি—কমরেড খুঁজে পেলে?

২.

চলো যাই চলো চিত্তহরিণী ছিঁড়ে খুঁড়ে দুই ডানা,
এই শহরে যে স্কুলবালকের বই হারানোর মানা।

আর সোনা। তবে পাশাপাশি দুই নীল নদীটির তীরে
হুচ্ছাই, তোকে বন্দী রেখেছি নিহত শিশুর ভীড়।

হলুদে সবুজে কুমারী যোনির রুপোর কেল্লা লুট,
মিশর-প্রাচীরে চাঁদের দেবতা, প্লাস্টিক-ব্যাধি ছুট,
তবু চুরি করে অনেক শিখেছি ভিক্ষের স্বরলিপি,
কোর্টিন্-মকেটে কোথায় অ্যাটমবোতলের ভাঙা ছিপি।

ক্ষিরের মত সোনালি স্বপ্নে ক্যাম্বেরি খেয়ে ঘুরি,
গণিকালয়ের বাবুর গন্ধে তাহিতির নরনারী,
মনে মনে তোকে বাজাতে চেয়েছি ইস্পানি ভায়োলিনে,
সূর্য এখন মাতাল করেছে, চুম্বন ডাস্টবিনে।

ইঙ্গিত করো কোহলের দিত বিগ্রহ-বিন্যাসে,
বেঁচেও ছিলাম জেব্রার মত জলপরীদের দেশে,
নাবিক-পণ্যে তেরোটা পুতুল লক্ষ করোনি বাবা,
স্বভূমির রক্তমাংসে মধু ঢেলে দাও, দেবা।

৩.

এখনো এখানে গ্রহণ করোনি পরবীজের মালা,
খিদের জলছে ডাকিনীতন্ত্র, কুসুমিত ডালপালা।
চাঁদের হলুদে ঠোঁট রাখতেই মেঘের সিংহাসন,
শয়তান দ্যাখো—হরিণ, ময়ূর, কাঠ-চেরাইয়ের বন।

মায়ের মৃত্যুর যোগ্য পোশাকে ভূগোলে অচেনা নারী—
চলো শনিবার—উদাসীন গৃহে চুমুর মহামারী।
জানি সহোদর, উৎসব-শেষে দেয়ালে লেনিন নেই,
সাপের ছোবলে বর্শার গ্রীবা—এলোচুল এখানেই।

নেশার শবে কপাট ভেঙেছে ষোড়শী মন্ত্রে দীক্ষা,
কলোনির ঋণ শোধ করে দিই নদীর শবের শিক্ষা,
মুখ যেন তার আল্-আক্সার মায়াবী উটের মত
চাবুকের প্রেমে রাতরাঙা পাখি পরিণামে সংহত।

তোমাকে বলছি ; খুব মনে পড়ে দূরে রাখালের গ্রাম,
ক্রুদ্ধ বাঘের নির্দেশ মত গাই-বাছুরের হাম,
আজ আমি হায় যুদ্ধ করেছি প্রেরণার দ্রোণফুলে—
দাঁতালো কবিতা উত্থিত হও তুষার আগুন জেলে।

৪.

রঞ্জিলা তুমি কেন যে তোলো না পকেটে লাল মলাট,
মাঝ দরিয়ায় কাঁচা-পাকা চুল তোলে লৌকিক পাট,
হাড়ের পাহাড়ে উষ্ণ গোলাপ আলোর চিবুকে ধরো,
তুমি কি জননী মাধবীলতায় মালা গেঁথে আজও পরো ?

বাঘের কবরে তৃতীয় রোবট পদ্মের নাভিমূলে,
এসো না এখানে মাতাল নাবিক, ভালোবাসা নেই জলে,
জলের দুপুরে নৌকা কোথাও নদীতে নামবে হাঁস,
কোয়াক্ কোয়াক ডেকে যায় তারা, ভুলে গেছি দুর্‌চাব।

অমরকৌটো ডুব দিয়ে তুলি বালিশে হেলান দিয়ে,
নেকড়ে কিশান লজ্জা ঢেকেছে শিশিরের ঘাসে শুয়ে,
গভীর আঁধারে ডানায় আওয়াজ 'রাধা' 'রাধা' বলে কাঁদে—
উঠোনে দাঁড়ানো কবির খাতায় ইঁদুরের অপবাদে।

চুপচাপ বসি স্কুলের চাতালে, কাছে গিয়ে রাখি হাত,
তুমি কি জানো না তোমার শরীরে নীল নকশার দাঁত ?
কল্পনা করোনি সবুজ আঙুল মায়াবী আরশি ভেঙে,
শকুনের চোখে আকাশের রং জন্মার মাঝখানে।

## দেবে কাকে

বিতোষ আচার্য

( প্রয়াত অধ্যাপক সুবোধ রায়চৌধুরীর উদ্দেশে )

যা জমেছে নিঃস্ব করে দিতে চেয়েছিলে, ঝুলি ঝেড়ে
—দেবে কাকে, কে নেবে? কে?
কার ঘাড়ে কটা মাথা
যে সাহসে বুক ঠুকে নেবে;
করতল উপচে পড়ে একাকার, সারা পথে
যত না হেঁটেছ— মন্থণ কাদায় যত
কী আশ্চর্য বোধ
পা থেকে মাথায় ধুলি কুরে কুরে অস্তিত্ব খেয়েছে
যত দিন গেছে···

মনে পড়ে?
মমতার দিনচর্যা, নিরম্বু উঠোনে
নিঃশব্দে নেমেছে সন্ধ্যা : ছাইমাখা মুখ
ফোঁকে শাঁখ, সাঁঝালের ধুম
গোলপাতার চাল ফুঁড়ে পড়ার বাতাসে
চিকরে যায় সেই শিশু
ছিঁচকাঁদুনে, চিরকেলে
কেঁদেই চলেছে···

—এইসব রূপ, রূপাভাস
ক্যানভাসে এনেছিলে, পা মিলিয়ে
মননের অলিগলি বেয়ে
—আর তাই

নোনাবিল ছুঁয়েফেরা হঠাৎ-ই উদোম হাওয়া
আভাধা উড়িয়ে নেয়, নেয়
হ্যাঁচকাটানে দাঁড় কয়ারি
অগ্নিভুক মানুষের ভিড়ে
টানটান ছিলায় বাঁধে বুক, কাঁধে কাঁধ
মুদ্রার বন্ধক

নিজেকে নিঃশেষ করে তুমি তো দিতেই চেয়েছিলে
—দেবে কাকে ?
প্রতিকূলে থরোথরো কম্পাসের কাঁটায় আগুনে
যারা দেহমন সেঁকে, বাঁকে কাঁধ
পাহাড় টলাতে চায়
—দাও দাও, নিঃশেষে তাদের দাও
অগ্নিগর্ভ দিন ছেনে বাজমেছে
হৃদয়ের বিশাল কোটরে
না দিয়ে কি পারো
তুমি পারো ?

## সেফটিপিন

**সুমেন আচার্য**

বাব তীব্র বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে একা একটা সেফটিপিন।
তার গড়নে একটা প্রণামের ভঙ্গি,
যে ছুঁচলো পিন চোখের মনিতে বিঁধে যেতে পারতো
তা কপালে ঠেকিয়ে সে তার পূজা নিবেদন করছে।

সিগারেটের ছাই ও বাদাম খোলার মধ্যে
আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে শহীদ মিনার।
মুখ থেকে যদি কোন বাদাম গড়িয়ে পড়ে মাটিতে
তা থেকে শেকড় গজানোর কথা কি কেউ কখনো ভাবে।

কেউ কি বলে : আমরা যা গড়তে পারিনি
আমাদের কঙ্কাল দিয়ে তা গড়া হোক।

কয়েকটি ইঁদুর অদ্ভুতভাবে মাত্র আধ ইঞ্চি ফুটো দিয়ে
ঢুকে গেছে বুক-শেলফে।
দাঁতের ধার পরীক্ষা করতে তারা কুটি কুটি করছে
মানুষের কীর্তি ও অহংকার।

বাইরে যখন শীত আর দুর্যোগ
তখন মানুষ যে যার ঘরের দেয়ালকে
চাদরের মত জড়িয়ে নিয়েছে শরীরে।
নোনা জলে এক একটা দ্বীপের মত তারা ভাসছে।
ভাসছে আর স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে আর তাদের শরীর
প্রবল শীতে কুঁকড়ে গুটিয়ে আসছে নিজের জঠরে।

অথচ একটা সেফটিপিন সমস্ত জীবন
দাঁতে দাঁত কামড়ে
যাবতীয় বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে, একা।

## যাতনা

**আবদুস সামাদ**

বহু ঘুম স্বপ্ন কী জানে না,
বহু চক্ষু ভাখেনি আপেল,
ভাখেনি ভাতের থালা অনেক দুপুর,
তবুও উঠোন জুড়ে চাপ চাপ রক্ত জমে থাকে।

যাতক ধুয়েছে শুধু কৃপাণের দাগ
কৃপাণ ভাখেনি
পালাতে পারেনি যারা জঙ্গলে, গুহায়,
সেই সব মানুষের কাড়া পেট থেকে

সেই সব শিশুদের ফাড়া পেট থেকে
বেরিয়েছে কচু পাতা, নষ্ট কড়ি, বেগুনের বোঁট

কৃপাণ দ্যাখেনি
নিহতের বাবা তার খাতনা দিয়েছিল
এই অপরাধে,
নিহতের বাবা তার খাতনা দেয় নাই
এই অপরাধে
খড় ও খোলার ঘরে সারি সারি রক্তমাখা ঘুম…

## আর কিছুই মনে পড়ছে না

**তীর্থঙ্কর মৈত্র**

মনে পড়ছে ;
নীল খামের মতো বারান্দা, ঘুরানো কাঠের সিঁড়ি।
নতুন ডাক বাক্সের মতো এক জোড়া চোখ।

মনে পড়ছে ;
ছোকরা হকারের অভিমানের মতো এক লেন।
দুপুরে সাইকেল আরোহীর ধাবমান জামার মতো বৃষ্টি।

মনে পড়ছে ;
কাঠের ব্রিজের পাশে হারানো রুমালের মতো আষাঢ়।
রাধাচূড়া পাতার মতো থরে থরে ঘন মেঘ।

সব মনে পড়ছে ;
শুধু শহরতলির সেই মিষ্টি আষাঢ়
তোমার মুখ মনে নেই বিংশ শতকের পরে।
তোমার জামার রং আকাশি ? নাকি
বাদাম পাতার মতো হলুদ ছিল ?

আর কিছুই মনে পড়ছে না ?
তোমাদের বাগির ঘরে ঘদেশি ফুল ছিল কিনা
প্রথম কোটা কুঁড়ি দেখে প্রজাপতি নাকি বাদুড় আসতো ?
ঘোড়া প্রসবের রাত্রি ছড়ানো খড়ের মধ্যে বাতাসায় মতো চাঁদ

আর কিছু মনে নেই—কিছুই মনে পড়ছে না।

## সে
### শ্রাবণ ভৌমিক

বুদ্বুদের মধ্যে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে।
এমন সমস্ত দিন বলো সে ঘুমোলে
লক্ষ লক্ষ শিশি এই বন্দি হাওয়া, আর
কার্বোহাইড্রেট শুধু শক্তিই জোগাবে ?
বাষ্প করবে না, জল যদি
সত্যি সত্যি কেঁপে ওঠে উত্তরে দক্ষিণে ?

বরফের অন্ধকারে শুয়ে ছিলো কবে একদিন।
বারে বারে বারে পড়ে এ কী তাপ দেয়ালে দুয়ারে।
এমন সমস্ত দিন বলো সে ঘুমোবে ?
এখনই জাগাও সেই ঘুমন্ত মূর্ছনা।
জলে স্থলে ফুলে ফুঁসে ঢেউ দিয়ে দিয়ে
কালো অসম্ভব শূন্যে মিশে যাক ···
৭ আজ ঘুমোবার দিন শেষ।

## ভুল ঠিকানায়

**অজয় বসু**

আজকাল যে কোনো মুখের দিকে তাকালেই
দু রকম আকাশ একসঙ্গে দেখি—
ধু ধু মরুভূমি আর শ্রাবণের বৃষ্টির দমকা
চোখে হলুদ কাচের শতখণ্ড আর বুকখোলা শূন্য আলপথ.

সরল জলের দেয়ালে ভালোবাসার ছবি আঁকতে গিয়ে দেখি
বারবার এক অগোছাল স্বপ্নের তোতলামি—
আজকাল তাই, যে কোনো বোধের ডানদিকে তাকালেই—
শুধু ভুল ঠিকানায় উদ্বেগের বর্ণমালা দেখি।

## বাসাংসি জীর্ণানি

**গোবিন্দ ভট্টাচার্য**

এই যে এতো হেঁকে বলছি 'লজ্জা',
এই যে এতো ঘুমপাড়াচ্ছি 'ক্রোধ'
ভাসিয়ে দিচ্ছি পূত অস্থি মজ্জা
আবহমান ছন্ন-বিষবোধ

এ সবই তো স্বয়ংক্রিয় শাস্তি
বক্তা শেখায় বাঁচার হিতবাণী
এতো দিন যে লালন করছি ভ্রান্তি
পরিবর্তে পেলাম ফুলদানি

বেশ তো আছি লোম অন্ধকারে
কে তুমি হে উস্কে দিচ্ছ বাতি
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ুক ঘায়ে
এমন আশা দারুণ আত্মঘাতী

আমরা বরং জলের অনুগামী
যে দিকে চল সে দিকে যাই ভেসে
এতো দিন তো ছিলাম গগনচারী
এখন ভ্রমণ জলজ সাধুবেশে

জীর্ণ বসন পাল্টে দিয়ে আসি
কল্পলোকের বোধিদ্রুম আতঙ্ক
স্মৃতি হারায় চতুর সন্ধ্যালে
পরিত্রাতা ব্রহ্মচারী থাকুক।

## দুটি কবিতা

**অর্ণব সাহা**

একা বয়েস যুবকে

স্বপ্নের বেথেলহেম। তোমার চোখের কোণে জেগে থাকা, স্পর্শকাতরতা,
ক্ষিপ্র নিয়তির মত…নেমে এস মৃত্যুশীত—নিবিড়, কোমল
আর নেমে এস নীল সালকের ঈশ্বরের ছেঁড়া হাতে মৃত বাইবেল
অনন্ত ক্রুশ থেকে নেমে এস আমাদের শাণিত জীবন।

যন্ত্রণা তোমার নয়; আনন্দ-ও অন্ধকার স্পর্শ করেছিল?
এস, আমি ক্রমশই জেগে উঠছি পৃথিবীর ঘোলাটে সবুজ মন্দিরে
ঈশ্বরের একাকিত্ব, সমবেত বন্দনায় জড়ানো গভীরতর ঘুম
ঈশ্বরের একাকীত্ব, তোমাদের বৃন্দগানে স্খলিত মদের মত নেশা—

যে নেশা ঈর্ষণীয়, শিল্পবোধ, অবচ্ছেদন…চূর্ণীকৃত
হাতের পরস্পর ঘর্ষণের শব্দগুলি প্রকাশ্যে বয়ে আনে আর্ত হিম স্তব্ধতা
যে নেশা তোমারও দুটি উন্মাদ অক্ষিপটে, ধোঁয়াটে বিছানা, খোলা চুলে
নিটোল গ্রীবার পাশে জমেছে সমস্ত হাত, ধারালো দীর্ঘ তরবারি—

শঙ্কর অধিযোগী কে

একটি আগুন জ্বলে উঠলে, আমরা অবাক মানি
আমরা থাকি সতর্কতায়, বদ্ধ কণ্ঠস্বরে
তবুও আগুন জ্বলে উঠলে ঔদ্ধত্যের শিখায়
জ্বললে উঠে আমরা ফের আগুনে চমকাই

হাওয়ায় ছোটে হলকা লাগে জলসমাধির
সবল দুটি বাহুর তেজ, টুকরো-ঝুরো মাটি
আজও কতো প্রশস্ত এই অগ্নিশপথ, সম্ভব—
যত বর্ষার শব্দ আরও বজ্র নিয়ে আয়।

## ঘোটক

স্বপন চক্রবর্তী

গতকাল তখনো দাঁত মাজা হয়নি।
তোমের শুরুতেই আচমকা আকাশের ডাক—
আমায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল
গ্যাঁজলা তুলে মরে যাওয়া তাজা এক ঘোটকের কাছে।

মৃতের পাশে দাঁড়িয়ে
অনেকের মত আমি ভুলে গেছিলাম দাঁতের দুরবস্থার কথা,
অনেকের মত আমি ভুলে গেছিলাম মৃত্যু, অপঘাত বা আত্মহত্যার আগে
ইঁদুরের পাশে শুয়ে শিখতে হবে দাঁতের ব্যবহার।

ছাইপাঁশ কাগজের মত বাতিল হয়ে উঠেছে জীবন।
তবু তার মধ্যে কখন যে বেমালুম ঘোড়া হয়ে গেছি
সেলুনে কাঁচির নীচে মাথা পেতেও বুঝিনি
কেশর আর চুলের মধ্যে পার্থক্য কত খানি।

আজো দাঁত মাজা হয়নি।
ঘরের কোন গোপন ডেরায় ব্রাশ নিয়ে চলে গেছে সাবধানী ইঁদুর,
পাতে খাওয়া লবনের দানায় দাঁত ফুটো হয়ে যাচ্ছে।
অনেকের মত আমি তাই নস্যি নিই দাঁতে,
অনেকের মত আমি তাই সেফটি পিন ঢুকিয়ে
দাঁতের ফাঁক থেকে তুলে আনি অপাচ্য শস্য দানা।

হয়ত দাঁত মাজার প্রয়োজন হবে না ।
উপেক্ষিত হতে হতে নাইলনের দাঁড়া হারাবে আত্মবিশ্বাস ।
অথবা কীইবা আসে যায় দাঁত মাজায়—
আমি কি মৃত্যু, অপঘাত বা আত্মহত্যায় যাবার বাইরে
অন্য কোন যোটক ।

## একটি গোপন ফুল

**অহনা বিশ্বাস**

দূরতম বস্তুর প্রতি এই টান ; টান সেই গ্রহটির প্রতি
বিশেষ সমুদ্রবর্ষা থেকে উঠে আসা এক দ্বীপ ;
নৌকায়, তরমুজ খোলের আড়ালে প্রেম

সমস্ত ঘনিষ্ঠতা থেকে উথলে আসা এক চন্দনবীজ
ঐ বীজের রক্ত ও বাকল ছিল আমাদের মধ্যকার প্রাচীর
শব্দ হোত না, আরো জটিল রহস্যে কেটে যেত সারারাত

হলুদ ফুলের চেয়েও ফ্যাকাশে বৃত্তাকার বন্ধুজন
ঈশ্বরের মত কুৎসিত আর অবিশ্বাসী বর্ণমালা
একটি গোপন ফুল কুহুয়ের জলে ছুঁড়ে ফেলে
তুমি সারারাত সাদা সাদা ঘুড়ি ওড়াও ছন্দবিহীন

সেদিন আভূমি শূন্যতা ছিল নিষ্পাপ, স্মরণীয়
শুধু অসুখী আত্মার উচ্ছিষ্ট বস্তু
বিশ্লেষিত গর্ভ থেকে ছিটকে গেলে পাপ
নিজস্ব অস্তিত্বে আমরা তিনজন

এখন কেউ কাউকে আর চিনতে পারি না ।

## বৃষ্টি

নিতাই জানা

তোমার ঘরের মতো বৃষ্টি হল বহুদিন পর।
তোমার ঘরের মতো পাহাড় আর মরুভূমি সমতল ধুয়ে
উঁকি মারে সাগর-সঙ্গম।
হরিত ঘাসের বীজ, হরিত মাঠের পর মাঠ,
নয় এক নদী
না দেখা ছবির মতো দোল খায় পাথুরে দেয়ালে।

পাষাণে খোদিত লিপি কাটা কাটা স্তব্ধ প্রতিধ্বনি ;
ছেলে ও মেয়েটি যায় সাগর পেরিয়ে কোন দেশে।
ছেলে ও মেয়েটি বলে : জল কোনো বস্তু নয়, জল
তোমার আমার মতো।
বৃষ্টি নামে বর্ষার ভেতর

তোমার ঘরের মতো বৃষ্টি হলো ছেলে আর মেয়ে
লিপি মুছে লিপি কাটে, রাজপুত্র পথের মানুষ।
মানুষের রাস্তা জল, মানুষের মুখের ভাষায়
কেমন উত্তাপ
বৃষ্টি নামে মাঠের ভেতর .
না আঁকা ছবির মতো দোল খায় স্থির অরণ্যানী।

## বিশ্বনাথ তেওয়ারী স্মরণে

সমীর রায়

লজ্জায় নরক বেয়ে তোমার ঘরে ঢুকে গেছি
কুড়িয়েছি পোড়া ডাইরি পার্টির কার্ড রিনিউঅ্যাল স্লিপ
টেক্সটাইল-ইউনিয়নের চাঁদার রসিদ
চোখ কিছু মন কিছু ভুলেছে আঁধারে
জলজ-উদ্ভিদ পারিনি কুড়োতে কোন রক্তের নদীর
কি করে পারবো ?
রক্ত বড় ঝড়ে উড়েছিলো
তাই ওরা তোমাকে পুড়িয়ে নক্ষত্রে জুড়ে দিলো

পাথরে দাঁড়িয়ে খুনী আমার বুকের জলে হাত ধুয়ে নিলো !

## শীতরাত্রি

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

হাড়কাঁপানো বাতাসে ক্রমশ বরফ হচ্ছে শরীর
ফায়ারপ্লেসে ছড়ানো চুলের
কথা ভাবতে ভাবতে
আমি চলেছি—
নিঃশব্দ মুহূর্তের সিঁড়ি
একটি একটি করে ভাঙতে ভাঙতে
আমি চলেছি
আরেক উষ্ণতার দিকে—

আমার সামনে
রাতের শিশিরে ভেসে যাচ্ছে বাড়ি

# ছড়া প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায়

দীপ : ছড়ার কর্ম আপনার প্রিয় কেন ?

অন্নদাশংকর : খামখেয়ালি চাল হলেও কমিউনিকেটিভ আর্টফর্ম হিসাবে ছড়াকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম।

দী : উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ সবক্ষেত্রেই আপনি বিচরণ করেছেন তবুও ছড়াই আপনার প্রথম প্রেম কেন ?

অ : শুধুমাত্র ছড়াই আমার প্রেম নয়। অন্য কর্মগুলিও আমার যথেষ্ট প্রিয়।

দী : আমার মনে হয় আপনার ছড়ার উৎস দায়বদ্ধতা। আপনার অভিমত কি ?

অ : দায়বদ্ধতা বললে অন্য এক সংজ্ঞা হয়ে যায়, আমি সেই অর্থে দায়বদ্ধ নই। আমি সরস্বতীর কাছে দায়বদ্ধ।

দী : অপ্রত্যাশিত মিল দেওয়া কি ছড়ার বাধ্যতামূলক শর্ত ?

অ : বাধ্যতামূলক শর্ত একটাই আছে, ছড়ায় ছন্দ থাকতে হবে। তবেই ছড়া পরিপূর্ণতা পাবে। অন্ত্যমিল না থাকলেও চলবে।

দী : যাকে বলে ননসেন্স রাইম, তাকে ছড়ার ক্ষেত্রে আপনি কতটা গুরুত্ব দেন ?

অ : খুবই গুরুত্ব দিই। যদি সত্যিই তা হয়ে ওঠে, সবাই গুরুত্ব দেবে।

দী : পুরোনো কালের ছেলেভুলোনো ছড়াগুলি আপনার লেখার কাজ করেছে কি ?

অ : খুব বেশী কাজ করেছে। সেই সব ছড়াগুলিই আমার জনপ্রিয়।

দী : ছড়ার ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ-আগম কি আপনার পছন্দ নই ?

অ : কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে অনেক বিদেশী শব্দ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকে। তাকে এড়িয়ে যাই কি করে ?

দী : ছড়া ও কবিতার মাঝখানে কোনো পার্থক্য আপনি স্বীকার করেন ?

অ : কোন সীমান্ত সমস্যা নেই। ছড়াও কবিতা হতে পারে। তবে কবিতা অনেক গভীর ও সেই তুলনায় ছড়া অনেক হাল্কা।

দী : তাৎক্ষনিকতাকে কি আপনি ছড়া লেখার উপকরণ মনে করেন ?

অ : একটা ঘটনা ঘটে গেল, সেই তাৎক্ষণিক ব্যাপার ছড়ার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি তো করবেই। তবে এধরনের ছড়া লেখা অনেক সহজ।

দী : ছড়াকার শব্দটির আজকাল খুব চল্ হয়েছে। আপনার কি প্রতিক্রিয়া ?

অ : ইংরিজিতে রাইমস্টার তো বলাই হয়। রবীন্দ্রনাথ ও অনেক ছড়া লিখেছেন, তাঁকে কি তোমরা ছড়াকার বলবে ? এ নিয়ে এত ভাবাভাবির দরকার নেই।

দী : নতুন কালের ছড়ালেখকদের ছড়া কেমন লাগে ?

অ : সব ছড়া কি উৎরোচ্ছে ? ভাল ছড়া নিশ্চয়ই ভাল লাগতেই হবে।

দী : আপনি অতি সম্প্রতি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিতরণী সভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ছড়ালেখায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

অ : না ঠিক তা নয়, আমি ওকে ছন্দে লেখায় অনুরোধ করেছিলাম।

দীপ : আমার ছড়া কেমন লাগছে ?

অন্নদাশংকর : তুমি যেসব ছড়া আমাকে শোনালে সেসব ছড়া আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি অবশ্য ভাল ছড়া লিখবে, এই আমার আশির্বাদ।

সাক্ষাৎকার : দীপ মুখোপাধ্যায়

# হাসান আজিজুল হকের গল্পের নাট্যরূপ

অমল রায়

ওপার বাংলার প্রথিতযশা বামপন্থী কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। পরিচয় পত্রে হাসান এই বাংলার কবি-শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে যে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, সেখানে এই প্রতিবেদকেরও উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সম্ভবতঃ নাট্যকর্মী হিসেবে আমি একাই সেই অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলাম। হাসানের সেইদিনের সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী ভাষণ আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। সভায় কিছু বলতে পারিনি লজ্জায়, কিন্তু সভাশেষে একান্তে আমাদের প্রিয় গল্পকারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম নিজের পরিচয় গোপন রেখেই—আমাদের এই বাংলায় নাট্যকর্মীদের সঙ্গে গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের সহধর্মী সংযোগ সর্বদাই বজায় থাকে, কেননা-এখানকার নাট্যকারেরা প্রায়শঃই কোনো গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে নাটক লিখে থাকেন, কিন্তু বাংলাদেশে তা হয় কি? অন্তত হাসানের কোনো গল্প অবলম্বনে সেখানে কোনো নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে কি? হাসানের যাবার তাড়া ছিল, তাই সংক্ষেপে একটি বাক্যেই আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটালেন যে, তিনি যতদূর জানেন, বাংলাদেশে তাঁর গল্পের কোনো নাট্যরূপ অভিনীত হয় নি।

হাসানের সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতার কয়েকদিনের মধ্যেই সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে মফঃস্বলের দুটি নাট্যদলের যৌথ নাট্যানুষ্ঠানে গিয়ে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল আমার। একটি নতুন নাট্যদল হাসান আজিজুল হকের গল্প অবলম্বনে সেখানে নাটক করল। সংবাদটি যদি আমার আগে জানা থাকতো, তবে পরিচয় পত্রেই আমি সগর্বে হাসান আজিজুল হককে

বলতে পারতাম বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা তাঁর গল্প নিয়ে নাটক করার ব্যাপারে অনাগ্রহী হলেও পশ্চিমবাংলায় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন কিন্তু মকে তাঁর গল্পকে আনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে, তা'ও কলকাতার কোনো নামী-দামী অভিজাত নাট্যসংস্থা নয়, মফঃস্বলের একটি ছোট্ট নাট্যদলও হাসানের গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করেছে—এথেকে একটা কথাই প্রমাণিত হয়, তাঁর গল্প এখানে আংশিক ভাবেও তৃণমূলস্তরে প্রচারিত হয়েছে, নাট্যকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে সেই গল্পের নাটক করতে।

গত ১৭ জানুয়ারী আমি সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে নবগঠিত নাট্যদল "প্রচ্ছদে"র প্রযোজনায় হাসান আজিজুল হকের "পাতালে-হাসপাতালে" গল্প-অবলম্বনে ভাস্কর লাহিড়ীকৃত একাঙ্ক নাটক "এমার্জেন্সী"র সম্ভবত প্রথম প্রদর্শনীটি দেখি। শুনেছি, তারপর থেকে "প্রচ্ছদ" হাসানের গল্পের এই নাট্যরূপটি নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করছেন। হাসানের এই গল্পটি পশ্চিমবাংলার "বিজ্ঞাপন পর্বে" প্রকাশিত হওয়া মাত্রেই আমাদের অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আমিও গল্পটি পড়েই বুঝেছিলাম অসামান্য এই গল্পটিতে নাটকীয় উপাদান কম নেই। নাট্যরূপদাতা ভাস্কর লাহিড়ীও এই উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার ক'রে আগাগোড়া টানটান একটি একাঙ্ক সৃষ্টি করেছেন।

তবে একটি ক্ষেত্রে নাট্যরূপদাতা স্বাধীনতা নিয়েছেন। হাসানের গল্পটির পটভূমি ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা দেশ। ভাস্কর নাটকটিকে বেঁধেছেন পশ্চিমবাংলার পরিবেশে, একেবারে হাল আমলের বামফ্রন্ট শাসনাধীন পশ্চিমবাংলায়। তবে এই পরিবর্তনের ফলে গল্পের মূল সুরটি মোটেই ব্যাহত হয়নি, কখনোই মনে হয়নি বাংলাদেশের বাস্তবতাকে জোর ক'রে পশ্চিম-বাংলার ছাঁচে চাপানো হয়েছে। তার কারণ সম্ভবতঃ এটাই—সাতচল্লিশের দেশবিভাজন সত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে অখণ্ড অবিভক্ত যে বাংলা, তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ অদ্যাবধি মূলত এক, সামান্য ইতরবিশেষ থাকলেও মূল ক্ষেত্রগুলিতে দুই বাংলার মানুষের সমস্যাও সংকট একজাতীয়। ফলে মূল গল্পের পটভূমি নাটকে পরিবর্তিত হলেও কখনোই তাকে আরোপিত বলা যাবে না। বহু বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা যায়, ওপারের গল্পকে এপারে আনলে সেই সমস্যা একেবারেই থাকে না। অথচ দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ আজ

আমাদের কাছে বিদেশ, বাংলাদেশী লেখকেরাও—মায় হাসান আজিজুল হক-সমেত প্রত্যেকেই এপারের মানুষের কাছেও বিদেশী লেখক।

"পাতালে-হাসপাতালে" গল্পটিতে হাসান বাংলাদেশের জনচিকিৎসা এবং তার হাসপাতালগুলির দুর্দশার যে ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার অবস্থায় কোনো গুণগত ফারাক নেই। ফলে পটভূমি পরিবর্তিত হলেও অন্তর্বস্তুটি এখানেও মর্মস্পর্শী থেকে গেছে। তদুপরি, নাট্যকার ও নির্দেশক ভাস্কর লাহিড়ী পশ্চিমবাংলার পরিবেশটিকে আরো বিশ্বাস্য করার জন্যে এই আমলের কিছু দুঃখজনক বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরেছেন, যথা হাসপাতালগুলির আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশের কর্মবিমুখতা, জনসাধারণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ইত্যাদি। ফলে নাটকটিতে ভিন্ন মাত্রাও সংযোজিত হয়েছে।

যে কোনো নাটকের প্রথম প্রযোজনাতেই একটু আলগা-পাহাড়া ভাব থাকে। এই নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এঁদের পক্ষে একটিই শ্লাঘার কথা যে, প্রথম প্রদর্শনজনিত ছোটো-খাটো ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে নাটকটিকে তাঁরা জমিয়ে দিতে পেরেছিলেন। দলগত অভিনয়ের মানও যথেষ্ট উঁচু। বিশেষত নির্মলবাবুর ভূমিকায় নাট্যকার-নির্দেশক ভাস্কর লাহিড়ী যথেষ্ট ভালো অভিনয় করেছেন, সমাপ্তি-অংশে তাঁর বিমূঢ় বেদনার্ত অভিব্যক্তি আমাদেরও বিষাদাচ্ছন্ন ক'রে তোলে। একমাত্র নারীচরিত্রে মানসী রায়ও যথাযথ। এ ছাড়া সুঅভিনয় করেছেন কালীপদ চ্যাটার্জি, শঙ্কর মণ্ডল, রাজা গাঙ্গুলী, শান্তি দাস, অমিয় মণ্ডল, শুভেন্দু মুখার্জি, তমাল দাস দুলাল দাস, প্রমুখ। সুব্রত কাঞ্জিলালের মঞ্চপরিকল্পনা ও দেবাশিস দাসের আবহও নাটকটিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গল্পসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। মফঃস্বলের একটি ছোটো দল যদি ওপার বাংলার একটি অসাধারণ গল্প নিয়ে কাজ করার সাহস দেখাতে পারেন, তবে কলকাতার দলগুলিরও বোধহয় কাহিনী নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের কথাশিল্পের দিকে একটু দৃষ্টিনিবদ্ধ করা উচিত। আর এভাবেই তো গড়ে উঠতে পারে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সংযোগসেতু।

## ঘাসফুলের গল্প

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সেই চল্লিশের দশক থেকে, যুক্ত আরও নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর মধ্যে রয়েছে আরও একটি সত্তা—সাহিত্যের প্রতি রয়েছে তাঁর প্রেম, তিনি সময় ও সুযোগ পেলে গল্প লিখতে ভালবাসেন, প্রবন্ধ এবং কবিতাও লেখেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মত নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তির কাছে সাহিত্যচর্চার জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ সহজলভ্য নয়, তাই জীবনের প্রান্তে এসে তাঁকে প্রকাশ করতে হল বিগত চল্লিশ বছর সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলির একটি সংকলন—'ঘাসফুল'। এটি প্রকাশ করার ব্যাপারেও মনে হয় তাঁর মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল, কেন না পুস্তকটির ভূমিকায় তিনি সঙ্কোচের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"আমার এই ঘাসফুলগুলি সাহিত্যের ফুলবাগে হয়ত স্থান পাবে না—।" না, এই সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রকৃতির জগতে গোলাপ-চন্দ্রমল্লিকা-ডালিয়ার যত সৌন্দর্যের যৌলুসই থাক, নানা বিচিত্র বর্ণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘাসফুলও তাদের নিজস্ব স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নিয়ে প্রকৃতির ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে রাখে। চন্দ্রশেখরবাবুর 'ঘাসফুল'-এর গল্পগুলিও তেমনি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র্যে রসজ্ঞ পাঠকের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

'ঘাসফুল'-এর সংগ্রহে মোট ষোলটি গল্প স্থান পেয়েছে। দু'তিনটি ছাড়া বাকি সব গল্পের বিষয়বস্তু সমাজের নিচুতলার অবহেলিত অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী। সেই সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যে-সব চরিত্রকে অবলম্বন করে, তারা অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত। সন্দেহ নেই, এদের জীবনের সঙ্গে লেখকের নিগূঢ় পরিচয় রয়েছে, থাকাই স্বাভাবিক, কেন না বিগত পাঁচ দশক তিনি এদের নিয়েই রাজনীতি করছেন, এদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে তাই তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে বাধা নেই, গল্পগুলি পড়ার আগে মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল বৈকি। আশঙ্কার কারণ আর কিছু নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সাহিত্যিক যখন সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন, তখন তাঁর মধ্যে একটা প্রবণতা সচেতন বা অচেতনভাবে কাজ করে যায় ফলে তাঁর কাহিনী ও চরিত্রগুলি তাঁর আদর্শগত ইচ্ছাপূরণের ছাঁচে বাঁধা পড়ে স্বতস্ফূর্ত বিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়। এতে শুধু সাহিত্যের রস ক্ষুণ্ণ হয় না, চরিত্রগুলি হয়ে ওঠে কৃত্রিম এবং অবাস্তব। কিন্তু সুখের

বিষয়, চন্দ্রশেখরবাবুর ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক প্রমানিত হয়েছে। 'ঘাসফুল'-এর গল্পগুলির মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক সত্তাই প্রাধান্য পেয়ে সেগুলিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আরো একটা বিষয়, তা হল লেখকের পরিমিতি বোধ বা সংযম, যে-গুন ছোট গল্পের সাফল্যের ব্যাপারে বিশেষ জরুরি। তাঁর গল্প বলার ভাষা ও ভঙ্গি খুব সরল। গল্প কেমনভাবে শুরু করতে হয় বা শেষ করতে হয়, তার রীতিপ্রকরণ চমৎকারভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন, ফলে অধিকাংশ গল্প হয়ে উঠেছে সরলভাবে লক্ষ্যভেদী ও নিটোল। বইটি শেষ করার পর মনে প্রশ্ন জাগে, জীবন, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও চন্দ্রশেখরবাবু এত কম লিখলেন কেন? অবশ্য কারণটা অনুমান করা শক্ত নয়, হয়ত রাজনীতিই তাঁর জীবনের ও সময়ের সিংহভাগ অধিকার করে রেখেছিল, সাহিত্যচর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার।

'ঘাসফুল'-এর গল্পগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই স্থানাভাবের দরুণ। তাই বইটি সম্পর্কে সাধারণ প্রতিক্রিয়ার কথাই বলা হল। গল্পগুলির মধ্যে অবশ্যই সবগুলির মান এক স্তরের নয়। তবে বেশির ভাগ গল্পই পাঠকের কাছে ভাল লাগবে, বিশেষভাবে—উপলব্ধি, পোড়াধান, গায়ক বৈরাগী, বাদামওয়ালা, বিচার, চৌকিদার ইত্যাদি। দরিদ্র মৃৎশিল্পী মদনর, ঋণের ফাঁদে বাঁধা পড়া চাষি জলহরি, দিনমজুর বিদুর, বৈরাগী লোচন দাস, বাদামবিক্রেতা ভূষন, নির্মম সামাজিক অবিচারের শিকার বাগদীর মেয়ে ঈশানী, গ্রামের চৌকিদার সিধু—এই সব সাধারণ নিচুস্তরের মানুষগুলি যারা শহরবাসী সাহিত্যে আজও উপেক্ষিত, তাঁদের মর্মে প্রবেশ করে গল্পকার তাদের আনন্দ ও বিষাদের মুহূর্তগুলিকে চয়ন করে এনে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, এবং এইসব চরিত্রের প্রেক্ষাপটে চিত্রায়িত হয়েছে যন্ত্রনাকাতর এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, যেখানে নিদারুণ প্রতিকূল পরিবেশ অসহায় মানুষের ওপর প্রতিনিয়ত আঘাত হেনে বিধ্বস্ত করলেও তাদের মন থেকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা মুছে ফেলতে পারে না। এই আকাঙ্ক্ষা শাশ্বত। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই ইতিহাস বিবর্তিত হয়।

রঞ্জন ধর

---

ঘাসফুল। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ইনডাসট্রিয়াল অর্গ্যান, আসানসোল-১। তিরিশ টাকা।

## রাত্রিতপস্বীর চিঠি অথবা একখানি কবিতার বই

এখন, এই অদ্ভুত ১৯৯৩-তে, এরকম আর বলবার উপায় নেই বোধহয় যে, 'আপনার গদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে পদ্যের প্রভাব অল্প'—যেমন বলেছিলেন একদিন সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে, চিঠিতে। এ-লেখা বুদ্ধদেব বা সুধীন্দ্রনাথ-বিষয়ক নয়, এমনকি গদ্যকাব্য আর গদ্যকবিতা নিয়ে কোন পুরনো ঝুটঝামেলাও নয় এর বিষয়। তবু এমনিই এই চিঠিটির কথা মনে পড়ে গেল আমার যখন, এই-তো শেষ হয়ে আসছে সন্ধেবেলা আর আমি চাইছি না ব্যাহত হোক আমার বসে থাকা আর, অন্ধকারে। মনে পড়ে গেল এবং দেখতে পাই অল্প একটু হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে বইয়ের পাতা, উড়ে যাচ্ছে আর ধীরে ধীরে নয় চকিতেই, ভেসে আসছে শব্দহীন দুটি পংক্তিতে ভাগ করা নীরবতা / 'আমি চাই উৎসর্গবিহীন / সব লেখা, সব প্রেরণার আগে তুমি'। মঞ্জুষের চক্রবর্তীর 'কবিতা ১৯৮৮-৯২', প্রথম বই ওঁর, আমার তো মনে হয় এর পাতাই ওল্টানো যায় না যদি-না পাঠক এ-দুটি পংক্তির মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারেন। এই চলে যাওয়ারও যে মেজাজ আছে একটা, এটা বোঝার জন্য চট্ করে আলো জ্বালিয়ে নেয়া যাক একবার। মুখোমুখি হওয়া যাক বইটির। মঞ্জুষেশ-র 'কবিতা ১৯৮৮-৯২'-র।

সম্পূর্ণ অন্য কারণেই এ-লেখার আরম্ভে সুধীন্দ্রনাথের ঐ চিঠির কথা তুলেছি, বলে রাখি এইবার। অন্য কারণে, কিন্তু কখনোই অকারণে নয়। কারণটি যে কি, তা কোন পাঠক যিনি বইটির পাতা ওল্টাবেন, তিনিও টের পাবেন, ও-চিঠির কথা এসে গেল কেবল এরই মুখোমুখি যে, এ-বইয়ের দুটি বিভাগে আলাদা করা সাতাশটি লেখা এবং একটি দীর্ঘ কবিতার মধ্যে নেহাৎ-ই দু-একখানি মাত্র বাদ দিলে বাকিগুলো গদ্যে লেখা, অন্তত চালের দিক থেকে—চলনের কথা আলাদা।

বাস্তবিকই, আমার কাছে পাঠক হিসাবে কবিতা কেবলমাত্র একরকম এবং তা প্রেমের কবিতা। আমার মনে হয়েছে, আর এই মনে হওয়া দৃঢ়ও হচ্ছে যতদিন যাচ্ছে যে, প্রেমের কবিতা বলতে আসলে কী বোঝায় জানি-ই না আমরা। আমাদের মধ্যে কারো-কারো ধারণা, কবিতায় সমসময়কে ধরতে হবে শক্ত করে, এবং এটা করতে গেলে প্রথমেই যা বাদ দিতে হবে তা হল প্রেম। এখন, এই-যে যাকে এরা সমসময় বলে ভাবছেন, ভেবে দেখলে মনে হয় না কি তা আসলে সমসময়ই নয় কোনভাবে, বা হলেও, সময়ের একটা কোণ। যেন-বা হীরের মতো তা বলসে উঠছে থেকেথেকেই, আলো পড়ে; কিন্তু হীরের এ কেবল একটা দিক, একটাই ধার, আর হীরের আরও ধার থাকে—না-থাকলে তা হীরে নয়। বুদ্ধদেব বসুর 'কংকাবতী'-র সমালোচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দ যে 'কঙ্কালমুণ্ডের টিটকারী'-র উল্লেখ করেছিলেন, এঁরা কেউ কেউ লেখায় অনেক পরিমাণে তারও আমদানি করে থাকেন। এতে কবিতার ঠিক কতটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বা হচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। অন্য আরেকদলও আছেন আবার, যাঁরা কবিতা বলতেই বোঝেন একরকম রক্তমাংসহীন, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন কোন নিরাবয়ব 'তোমাকে' উদ্দেশ করে কিছু বলে যাওয়া। যাঁরা এরকম করেন, কখনো কখনো মনে হয় না কি যে, তাঁরা 'প্রেম' যেমন বোঝেন না, শারীরিকতাও এঁদের সমান অ-ধরা। পাঠকরা যথেষ্ট বিভ্রান্ত বোধ করেন এঁদের সামনাসামনি, স্বভাবতই। কেন না কর্তাভজা-র এই দেশে এঁদেরই 'যথার্থ' বলে চালাবার প্রচেষ্টা তো কম চলে না। যাই হোক, বলার কথা এখানে এ-ই যে, খন্দুর প্রথম কাব্যবইতেই এ-দুয়ের কোনটিই নেই। এবং এ-ও যে, এ-বই প্রেমের কবিতারই সংকলন একটি, যা একইসঙ্গে সমসময়কে ছুঁয়ে রয়েছে। কতখানি উঁচু মার্গের শুদ্ধ কবিতার খাড়াই স্বর্গপথে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন খন্দু আমি বলতে যাব না, আমি কেবল বলছি, তিনি তাঁর মতো করে সমসময়কে স্পর্শ করেছেন, শব্দ-র পর শব্দ দিয়ে ক্রমাগত ছুঁয়ে গেছেন নিজেকে, এবং অকস্মাৎ দেখেছেন নিজের অভ্যন্তর হতেই 'হয়ে উঠল' সেই স্বর্ণাভা, যা নিজেকে সবকিছু বদলে তছনছ করে চুরমার করে অসম্ভব মায়ামমতার মধ্যে উচ্চারণ করতে পারে 'পৃথিবী এখন ঠিক ততো বড়, আমি তাকে যতোখানি জানি।' (পৃ-৩৫) এবং 'সমাজতান্ত্রিক বিবৃতিমালা'-র এই খন্দুই লিখে রেখেছেন, 'তাই এই বিপদে দুর্দিনে খুব কাছাকাছি পেতে নিচ্ছি সংসার, কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যায়, এ ওর মুখের দিকে

তাকাতেই মনে হয় স্বপ্ন বুঝি একদিন তোমার চোখের মতো হবে' (পৃ-৩৯)।

আমরা যে জগতে বাস করছি তা কোন সুন্দর জগত নয়—পৃথিবী আজও মানুষের বাসযোগ্য হয়নি—আমরা করে তুলিনি : এ-রকম মনে করতেন লুই বুন্নুয়েল। হ্যাঁ, সত্যিই তুলিনি আমরা, তবে ইচ্ছে করে নয়—নানা কারণবশত। আমার ধারণা, প্রকৃত কবিতা বলে যদি, থাকে কিছু, তাহলে তা ঐ কারণগুলোকে স্পষ্ট করে দেয় যার বিপরীতে কবিতায় মধ্যেই আবার ঘুরে যায় জীবনানন্দ কথিত সেই ধূসর প্রাসাদে, যেখানে অন্ধকার সিঁড়ি আছে, রঙিন কাচ আছে, আছে আধো-আঁধার, ধূ ধূ পথ আর সোনালি আলোর ঝলক—যেখানে দাঁড়িয়েই কেবল বলা যায়, 'ঘর আর বাহির বলে কিছু নেই, কাছে আর দূরে বলে কিছু নেই, শুধু একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর ধূ ধূ করছে দিগ্বিদিক—দেবতাদের পৃথিবীতে, দেবদূতদের পৃথিবীতে নেমে আসছে আতঙ্ক —কোন অসহ্য সুন্দরের মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা।' (পৃ-১৫) উচ্চারণ করা যায়, 'এমনই গানের দিনে খানিক বেলায় যেন জেগে উঠি পুনরায়,/দেখি তুমি শরীর উপচে পড়া আলো নিয়ে বসে আছ পাশে—' (পৃ—৬২)। জানানো হয় (অবশ্য এ-জানানো কোন শাণিত ঘোষণার মত নয় কিছু) 'বিশেষত, এখনই তোমাকে চাই, কমরেড ও লাদিমির ইলিচ, চাই নতুন প্রশিক্ষণ। আর পার্টি, এভাবেই ঈশানে ঘনাও তুমি পুনরায় কালো মেঘ, চাই বৃষ্টি, চাই নতুন শস্যের ভোর, শ্রমিকের সোনালি তারায় রাত্রি, বন্দরে নতুন আগুন।' (পৃ-৩৯)

তবে কি, মনে হতেই পারে কারো এ-আয়োজন আমার কেবল কস্তুর লেখার সুকুমার, সুন্দর, তরুণ দিকগুলিকেই আলো করে তুলতে, একমাত্র। হয়ত তাই খানিকটা। তা-ই, কেননা কস্তুর লেখায় যেসব দুর্বল দিক, কখনো-কখনো উপমায়, বানানেও খানিক, চেষ্টাকৃততায় বুদ্ধদেব বসুকে মনে পড়িয়ে দেওয়া, আমি সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি না, কারণ কস্তুর এ-প্রথম বই, প্রথম বইতেই তিনি আর কিছু না হলেও প্রমাণ করতে পেরেছেন ভালোবাসবার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে এবং তিনি জানেন কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়। নিজেকে করুণা করে চোখের জল ফেলা, যা আমাদের এখানকার বেশিরভাগ, কেবল প্রেমের কেন যে কোন ধরনের কবিতারই বৈশিষ্ট্য, এই কবি নিজেকে তা থেকে সরিয়ে নিতে পারলেন একেবারে শুরুতেই, এটা খুব কম কথা নয় বলেই আমি

মনে করছি। এবং এর ফলে যেটা হচ্ছে তা হল, মধুরেশ নিজেকে থিতু করে নিতে পারছেন তাঁর সমসময়কার কবিদের পাশাপাশি। থিতু করে নিতে পারছেন নিজের উচ্চারণে হয়ত নয় কিন্তু অবশ্যই অনুভবে, আর তা-ই বা কম কি। কম কি এ বইয়ের প্রকাশনা সৌন্দর্য, এর প্রচ্ছদ, যার আমূল এক-স্মার্ট ঝলকে বলতে গেলে এ-বই হাতে নিয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের উন্মাদপ্রতিম কাজগুলোকে, বাংলা প্রকাশনায় যারা এক অর্থে প্রায় তুলনারহিত।

মধুরেশ চক্রবর্তীর এ বই পাঠকের কাছে, আশা করা যাক, গ্রাহ্য হবে, আর না-হলেও ক্ষতি নেই—কবে আর একটা বই বড় সংখ্যায় পাঠকের মধ্যে একরকমভাবেই কাজ করতে পেরেছে।

চৈতালি চট্টোপাধ্যায়

---

কবিতা ১৯৮৮...৯২। মধুরেশ চক্রবর্তী। রক্তকরবী। পনের টাকা

## মার্কসীয় সাহিত্য-প্রকাশনার প্রবীণতম সংগঠক নিঃশব্দে চলে গেলেন

কমরেড সুরেন্দ্রনাথ দত্ত গত ৩ ফেব্রুয়ারি পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছেন। যিনি তিরিশের দশকের শেষে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, রেবতী বর্মণ, ধরণী গোস্বামী এবং কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধায়ক শ্রীগোপাল ঘোষ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি নামে মার্কসীয় পত্র-পত্রিকা প্রচার ও গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য ১৯৩৯ সালের ২৬ জুন ১২ নম্বর ওয়েলিংটন রোডে সর্বপ্রথম একটি দোকান খুলেছিলেন এবং যে দোকানটি তিনি স্বেচ্ছায় কমিউনিস্ট পার্টির হাতে তুলে দিয়ে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে কোম্পানী আইন অনুসারে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এ রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছিলেন, সেই মানুষটি প্রগতিশীল গ্রন্থাদি প্রকাশনার সঙ্গে আশি বছর বয়স পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেও আকস্মিক অর্থে নীরবে এবং নিঃশব্দে এই মর্ত্যপৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

না, সুরেনদার মৃত্যুর পর বাম-দক্ষিণ কোনো সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। কোনো রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও প্রকাশকদের সংস্থা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কোনো শোকসভারও আয়োজন করেছে বলে শুনিনি। অথচ, কমরেড সুরেন দত্ত কি এতই উপেক্ষণীয় ব্যক্তি কিংবা ব্রাত্য মানুষ ছিলেন?

আমরা তো জানি, তিরিশের দশকের গোড়ায় ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় এই তরুণ যুবকটি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ফলে, আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রচিত একটি নিবন্ধে সুরেন দত্ত নিজেই বলেছেন: 'রাজনৈতিক কারণে নানা জেল ঘুরে তিরিশের

দশকের শেষ দিকে কলকাতায় আসি এবং এখানে একটি বইয়ের দোকানে কাজ পাই।' এই সময় তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল: 'ভোরের দিকে নানা মেস-বাড়িতে ঘুরে রাজনৈতিক বই-পত্র বিক্রয় করা, দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত বইয়ের দোকান-এ কাজ করা, সন্ধের পরে বিল্ডিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাজ করা।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রখ্যাত শ্রমিকনেতা কমরেড ইসমাইল ছিলেন এই বিল্ডিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একজন প্রধান নেতা এবং তাঁর মাধ্যমেই কমরেড সুরেন দত্ত তৎকালীন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কালক্রমে একসময় সুরেন দত্ত-ও নির্বাচিত হয়েছিলেন পূর্বোক্ত ইউনিয়নের সম্পাদকের পদে।

এই সময়কালে, ১৯৩৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড মুজফ্ফর আহমদ্-এর সঙ্গে সুরেন দত্ত-র পরিচয় হয়। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ-ই তাঁকে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারের কথা বলেন এবং মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকা পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি বিক্রয় করার পরামর্শ দেন। এর কিছু দিন পরে যখন একটা বইয়ের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন সেই কাজে কমরেড সুরেন দত্ত কোন্ ভূমিকা পালন করেছিলেন সে-সম্পর্কে কমরেড আহ্মদ ন্যাশনাল বুক এজেন্সির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছেন, 'কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কমরেড সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে চাকরী করতেন। সরকারেরা দোকানের কর্মী কমাচ্ছিলেন। এই সূত্রে ১৯৩৯ সালের ১লা জুন তারিখে কমরেড সুরেন দত্তের ছাঁটাই হলো। ছাঁটাই হওয়াটা ভালো কথা নয়। কিন্তু কমরেড সুরেন দত্তের ছাঁটাইতে আমরা সেদিন খুব খুশী হয়েছিলেম। কারণ, আমরা নিজেদের দোকান খুলতে যাচ্ছিলাম।'

অতঃপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেই দোকানটি সম্পর্কে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ বলেছেন, 'আমাদের মূলধন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির শুভেচ্ছা; কমরেড সুরেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রম; আর, কমরেড রেবতীমোহন বর্মনের জোগাড় করা দুই শত টাকা।'

সুতরাং এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণে অন্যতম মূলধন রূপে ক্রিয়াশীল ছিল সুরেন দত্ত-রই শ্রম আর নিষ্ঠা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৪০ সালের প্রারম্ভেই ব্রিটিশ সরকার

পুনর্বার শুরু করে তীব্র দমন-পীড়ন। এই সময় কলকাতা এবং আশে-পাশের শিল্পাঞ্চলে কর্মরত বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীর উপর প্রদত্ত হয় বহিষ্কারের আদেশ। কমরেড সুরেন দত্তকেও ১৯৪০ সালের মে মাসে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে প্রথমে বর্ধমানে, পরে মাদারীপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় বেআইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ১৯৪২ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা প্রকাশ্যে কাজকর্ম শুরু করেন। কমরেড সুরেন দত্ত-ও মুক্ত হয়ে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে আবার চলে আসেন কলকাতায়। ইতিমধ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করেছেন পিপলস পাবলিশিং হাউস নামে একটি প্রকাশন-সংস্থা। পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিও ঐ ধরনের একটি নিজস্ব প্রকাশন-সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতায় আসার পর সুরেন দত্তকে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পার্টির এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তাঁকেই সেই বইয়ের দোকানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। সুরেন দত্ত ন্যাশনাল বুক এজেন্সি নামে প্রতিষ্ঠিত তাঁর দোকানটিকে এই কাজে ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলে পার্টি খুশি হয়ে গ্রহণ করে সেই প্রস্তাব। ফলে, ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের একটি প্রশস্ত ঘরে এন. বি. এ পুনর্বার তার যাত্রা শুরু করে। আর, ঐ বছরের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী রূপে নথিবদ্ধ হয়।

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জিকে চেয়ারম্যান এবং কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে নির্বাচিত করে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির যে ডাইরেক্টর-বোর্ড গঠিত হয় তার সদস্য ছিলেন কমরেড ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করার পর কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদসহ অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতা হয় গ্রেপ্তার-বরণ করেন অথবা আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। এই সময় কমরেড সুরেন দত্ত-র বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বের হয়। ফলে, তিনিও আত্মগোপন করেন। আর, ১৯৪৯ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির তৎকালীন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুনীল বসুকে বিনাবিচারে বন্দী করার পর পুলিশ হামলা চালিয়ে এন. বি. এ. সীল করে দেয়। এই সময় এখানেই

ছিল 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'পরিচয়'-এর মালিকানা-স্বত্ব কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের হাতেই সমর্পণ করেন। সেই সময় থেকে 'পরিচয়' বিক্রয় ও প্রচারের প্রধান দায়িত্ব বহন করে আসছিলেন এন. বি. এ-র পরিচালকবর্গ। সুরেন দত্ত ছিলেন এঁদেরই অন্যতম। আর, ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মত হলে এন. বি. এ যখন পুনর্বার খোলা হয় তখন থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রায় বারো বছর সুরেন দত্তই ছিলেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। কিন্তু ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হলে নভেম্বর মাসে তিনি আবার নিক্ষিপ্ত হন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তিনি যে-সময় ছিলেন এন. বি. এ-র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সেই সময়কালে 'পরিচয়'-কে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল প্রবীণ ও নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বাঙলার সংস্কৃতিকে তাঁদের প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ করেছেন। এইসব শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলের সঙ্গেই ছিল কমরেড সুরেন দত্ত-র ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক।

এরপর মতাদর্শগত বিরোধের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে বিভক্ত হলে সদ্য-কারামুক্ত সুরেন দত্ত সি. পি. আই (এম)-এ যোগ দেন এবং ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে কাজ করতে থাকেন। নকশাল-আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কমরেড সুরেন দত্ত নকশালপন্থীদের সমর্থন করতে থাকায় তিনি এবং কবি কমলেশ সেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে ১৯৬৮ সালে বিতাড়িত ও সি. পি. আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত হন।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল, এই দীর্ঘ সময় জুড়ে যে-মানুষটি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা-সংস্থার কাজে, তিনি সেই সংস্থা থেকে বিতাড়িত হয়ে কী মর্মযন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন আমার মতো তাঁর অনেক সহযোদ্ধাই সেদিন তা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে অদম্য মানসিকতার সঙ্গে তিনি আবার গড়ে তুলেছিলেন 'নিউ বুক সেন্টার' নামে মার্কসীয় ও প্রগতিশীল পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ও বিক্রয়ের বেশ বড় একটি সংস্থা। সত্তরের দশক থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অকৃতদার সুরেনদা এই সংস্থাটিকেই পুত্রজ্ঞানে লালন-পালন করেছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, প্রথম যৌবনে একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী, পরবর্তী সময়ে নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মী এবং যাঁর শ্রমকে অন্যতম মূলধন করে

## মৃত্যু যাঁকে অকালে ছিনিয়ে নিল

মৃত্যুর নির্মম হাত যাঁকে অকালে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তিনি আমাদের একান্ত আপনজন, 'পরিচয়' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত-র সহধর্মিণী শ্রীমতী অনুরাধা দাশগুপ্ত। পোশাকী নাম অনুরাধা হলেও 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর প্রায় সকলের কাছেই তিনি 'রত্না' নামেই ছিলেন সমধিক পরিচিত। মাত্র ৫২ বছর বয়সে গত ৯ ফেব্রুয়ারি ঘটেছে তাঁর অকাল প্রয়াণ। ফলে, তাঁকে যাঁরা আমরা জানতাম তাঁরা সত্যিই শোকস্তব্ধ এবং রুদ্ধকণ্ঠ। এই বেদনাঘন মুহূর্তে আমাদের সহযোদ্ধা অমিতাভসহ তাঁর পুত্র-কন্যা বুবুন ও মুনমুনকে আমরা কোন্ ভাষায় যে সান্ত্বনা দেবো সে-ভাষা সত্যিই আমার জানা নেই।

অমিতাভ যখন সত্তরের দশকে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে কলকাতার সেণ্ট পলস কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন তখন থেকেই 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর এবং রত্নার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ নিবিড় হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে অমিতাভ যেমন গ্রহণ করেছেন 'পরিচয়'-সম্পাদনার দায়িত্ব তেমনি তাঁর প্রয়াত পত্নী রত্না এবং পুত্র-কন্যাও 'পরিচয়'-এর বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীপরিবারেরই সদস্যে পরিণত হয়েছেন। ফলে, রত্না-র অকালমৃত্যু সমগ্র 'পরিচয়'-পরিবারকেই করেছে শোকাচ্ছন্ন ও যন্ত্রণাকাতর।

রত্না হয়তো সাহিত্যিক কিংবা লেখক ছিলেন না। কিন্তু তিনি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের স্বনামধন্য প্রয়োগাচার্য রূপে খ্যাত সতু সেন-এর মধ্যম কন্যা হিসেবে আশৈশব লালিত-পালিত হয়েছেন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। অমিতাভ-র মতো একটু বেপরোয়া বেহিসেবী কবিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নানা দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের মধ্যেও তাই তাঁর কবি-প্রতিভা বিকাশে যেমন তিনি সহায়ক হয়েছেন তেমনি তাঁদের পুত্র-কন্যাকেও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এতটুকু দ্বিধা করেননি।

আমরা জানি, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত-র বন্ধু এবং অনুরাগী শিল্পী-সাহিত্যিক কবির সংখ্যা অগণন। এবং তাঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন উভয় বাঙলারই বিভিন্ন অঞ্চলে। গত বারো বছর একেবারে পাশাপাশি দুটি বাড়িতে বসবাস করার ফলে আমি দেখেছি এবং জেনেছি, অমিতাভ-র সেইসব অনুরাগী বন্ধুদের অনেকেই এমন সময় বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন যখন রান্না করার মতো ঘরে আর কিছু নেই, অথচ হঠাৎ আগন্তুক অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করাও মানবিক কর্তব্য। রত্না কোনোদিন অর্ধভুক্ত থেকে, কোনোদিন অনাহারে থেকে তাঁর খাদ্যবস্তুই তুলে দিয়েছেন সেইসব অতিথিদের পাতে। এটা এক-আধদিন নয়; শুনেছি প্রায়শই ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা। হাসিমুখে, শান্তমনে সর্বংসহা রত্না সহ্য করেছেন ভালোবাসার এই অত্যাচার।

রত্না প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন খুবই শান্ত-স্নিগ্ধ মহিলা। আপন-পর সকলের সমব্যথী হতে দেখেছি তাঁকে। সহোদরাপ্রতিম যে-রত্নাকে আমি দীর্ঘ বারো বছর আমার রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে, বারান্দায় বসে কিংবা ছাদে বেড়াতে উঠে প্রায় প্রতিদিনই দেখেছি, মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত তাঁকে হঠাৎ অদৃশ্য করে দিলেও তাঁরস্মৃতি আমার মতো আরো অনেকের মনে অনেক—অনেককাল জাগরূক থাকবে। আমরা 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে অমিতাভ, ঝুমলা-বুবুন ও অন্যান্য শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে জানাই শব্দাতীত ভাষায় আমাদের অকৃত্রিম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি। সময়ের শুশ্রূষায় নিরাময় হোক শোকের ক্ষতমুখ, এইটুকু শুধু আজ কামনা করি।

ধনঞ্জয় দাশ

# বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণে 'পরিচয়' যুগ্ম-সংখ্যা রূপে আমরা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। আশাকরি সহৃদয় পাঠক ও গ্রাহকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা মার্জনা করবেন।

'পরিচয়'-এর পরবর্তী সংখ্যা বর্ধিত আকারে বিশিষ্ট লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবংগল্প কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে আগামী জুন মাসে প্রকাশিত হবে।

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ 'পরিচয়'

# ভ্রম সংশোধন

১৯৯২ সালের আগস্ট-অক্টোবর সংখ্যাটি ভ্রমক্রমে ১-৩ সংখ্যা রূপে মুদ্রিত হয়েছে। 'পরিচয়'-এর ঐ সংখ্যাটি হবে ৪-৫ সংখ্যা। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ<br>'পরিচয়'

স্মরণ

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
মল্লিকার্জুন মনসুর
মেনকা ঠাকুর
স্বেভোস্লাভ রোয়েরিখ
অখিল নিয়োগী ( স্বপনবুড়ো )
মৃণাল চৌধুরী
দীপক মজুমদার
আর্থার অ্যাশ
অড্রে হেপবার্ণ
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

## বিশেষ রচনা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর জন্মশতবর্ষ : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিন্দু মৌলবাদ ঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী

মুসলিম মৌলবাদ ঃ আজিজুল হক

বস্তুবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্যামল চক্রবর্তী / ধনঞ্জয় দাশ

# পরিচয়

গত শতকের বাংলা চলচ্চিত্র ঃ ধ্রুব গুপ্ত

আমাদের নাট্যচর্চা ঃ হিসাবী

গৃহস্থালি ঃ চন্দন সেন

---

গল্প • কাব্যনাট্য • কবিতাগুচ্ছ • আলোচনা

পুস্তক পরিচয় : সংস্কৃতি সংবাদ

"যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজ ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# জওহরলাল নেহরু

সর্বপল্লী গোপাল

বাংলা ভাষান্তর : অনুরাধা বিশ্বাস

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। জাতীয় জীবনে বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়ে যাও যে শুধু তাই নয় তিনি বিশ্বের দরবারে এশিয়ার জন্য নতুন সম্মানের আসন তৈরি করে দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি জওহরলালের পর্বতপ্রতিম দায়বদ্ধতা তাঁকে যেমন নিজের দেশে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁকে বিশিষ্ট আসনও করে দিয়েছে। এই কারণে চার্চিল তাঁকে বলেছিলেন, 'এশিয়ার আলো'।

এই জীবনী গ্রন্থের রচয়িতা সর্বপল্লী গোপালের সুযোগ হয়েছিল ভারতের বিদেশ দপ্তরে জওহরলাল নেহরুর অধীনে দশ বছর কাজ করার। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত এই গ্রন্থ শুধুমাত্র একটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিবরণী মাত্র নয়, তাঁর সময়ের এক সারপূর্ণ দলিলও বটে।

প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৫০ টাকা

সাহিত্য অকাদেমি
'জীবনতারা ভবন'
২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলকাতা ৭০০০৫৩

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

8/93-94.

পরিচয়-এর পরবর্তী সংখ্যা

# শারদীয়

৬২ বর্ষ ৯-১২, এপ্রিল—জুলাই, ১৯৯৩, বৈশাখ—শ্রাবণ, ১৪০০

প্রবন্ধ :



গল্প :



কাব্যনাটক :



কবিতাগুচ্ছ :



পুস্তক-সমালোচনা :

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

অনন্ত দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

সজল বসু

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

সজল বসু কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৩, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুবাদ

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১

উনিশ শতকের শুরুতে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে, উইলবারফোর্স এবং গ্রান্ট, ভারতে 'সত্য' খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য, সরকারের কাছে আবেদন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'সরকার বাহাদুর' জানতেন যে, হিন্দুদের সমর্থনের অভাবে, অথবা অবহেলায় অন্তই অষ্টাদশ শতকে দিকে দিকে মুঘল জমানার বাতি নিবে গেছে; তাই মিশনারিদের প্রশ্রয় দেওয়া, কিংবা সরকারিভাবে সমর্থন করা ঠিক হবে না। অতএব, বিধবাদের আগুনে পুড়িয়ে মারা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কুলীন ব্রাহ্মণের চিতায় উঠবার পূর্ব মুহূর্তেও ষোড়শী কন্যার পাণিগ্রহণ করা, কন্যা-সন্তানকে মেরে ফেলা, পিঠে বড়শি ঢুকিয়ে চরকী ঘোরান—এসব চলতে থাকল। কলকাতায় শূদ্র নব্য ধনীরা নবরত্ন কুলপতিরূপে জাতিমালা কাছারিতে সাক্ষাৎ বিক্রমাদিত্যের মতো শোভা পেতে থাকলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নির্বিঘ্নে, তৈলাধার কী পাত্র, না কী পাত্রই তৈলাধার,—এসব দার্শনিক বিচারে নিবিষ্ট থেকে দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করতে থাকলেন।

কিছুকাল পরে রামমোহন রায়, তাঁর সমর্থকগণ, তাঁর বিরোধীগণ এবং একাধিক খ্রীষ্টান মিশনারি হিন্দু ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত করেন। ব্রাহ্ম মতবাদকে মৌল হিন্দুধর্মরূপে সংস্থাপিত করতে চাইলেন রামমোহন। কট্টর হিন্দুরা তাঁকে 'পাষণ্ড' ভেবে 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে বই লিখে ফেলল। ওদিকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাণের 'ইয়ার্'-গোছের কিছু সবজান্তা মিশনারি হিন্দুধর্মের আদ্যশ্রাদ্ধ শুরু করল। তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন জেমস্ মিল-এর মতো 'উপযোগবাদী' ঐতিহাসিক। সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণ, সন্তান হত্যার নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি সংস্কার যেমন উপযোগ-বাদদ্বারা প্রভাবিত ছিল, তেমনি তার সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নাতীত স্থায়িত্বের বিষয়টি জড়িত ছিল।

রামমোহন ঔপনিষদিক-বৈদান্তিক ভাববাদের মহিমা ঘোষণা করলেন; সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের কথাও জোরাল ভাষায় বললেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেদান্তকে 'ভ্রান্ত' মত বলে, তার উপযোগিতাই অস্বীকার করেন। ওদিকে অনেক ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, এবং রুশ 'প্রাচ্যতত্ত্ববিদ' বেদ, উপনিষৎ, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য, স্মৃতি, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গভীর এবং ব্যাপক গবেষণার সূত্রপাত করেন। হিন্দুধর্মের এবং হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ দিলেন উইলসন্। তাতে প্রাচীন ভারতের 'হিন্দু' গৌরব একটি সন্দেহাতীত প্রত্যয়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় আর্যত্ব, বেদান্ত, হিন্দুত্ব একটি বিশেষ অর্থবহ নতুন মাত্রারূপে পরিস্ফুট হ'ল। ভারতের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের তত্ত্ব; তাই দেখে আলিগড়ের সৈয়দ্ আহ্‌মদ খাঁ বেজায় নারাজ হলেন। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন হ'লেও, সৈয়দ্ আহ্‌মদ খাঁ, আমীর আলি প্রভৃতি নেতারা মুসলমানদের তাতে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিলেন, কারণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব 'হিন্দু'-দের অধিকারেই ছিল। শিকাগোর ধর্মীয় পার্লামেন্টে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের উদারতা ব্যাখ্যা করে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন, তাতে 'বীর সন্ন্যাসী' রূপে তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করলেও খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ হিন্দুত্ব সম্পর্কে কঠোর মনোভাব বর্জন করল না। ক্রমশঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরমপন্থী রাজনীতি, এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দুত্বপ্রভাবিত হয়ে উঠল।

জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে ধর্মসমন্বয়ের তত্ত্বও ছিল। তার প্রধান প্রচারক ছিলেন কোন কোন ব্রাহ্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ। অদ্বৈতবাদকে বিবেকানন্দ 'সামাজিক সাম্যবাদ' বলে বর্ণনা করেন। অথচ, বিবেকানন্দ ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কেও গর্ব অনুভব করেন। তপন রায়চৌধুরী লিখেছেন: [১]

> His [ Vivekananda's ] radical outlook was also manifest in his attitude to Islam, especially its role in India. There are hints of pan-Asianism in his proud claim asserting the Islamic origins of modern European civilization. He contrasted Islam's civilizing role in history with Christianity's record of bigotry and persecution.

> His pride in the Mughal heritage was marked by highly charged emotions. To see the youthful 'Sannyasi' as a protagonist of Hindu revivalism with its connotation of social-political reaction is to misread his message

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একটি উদার মতবাদ রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীও প্রচার করেছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে 'হিন্দুধর্ম' এবং 'ইসলাম'—ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির চিন্তা স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে কখনই তেমন জনপ্রিয় ছিল না। রাজনীতির নামে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে; এমন কী, রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের দুরভিসন্ধিমূলক প্রভাবের জন্যই ১৯৪৭-এ দেশভাগ হয়ে গেল।

তারপরে বেশ কিছুকাল ধর্ম-প্রসঙ্গ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়নি। ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপেই পরিচিত। এখন আবার হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে নানাবিধ 'যুক্তিতর্কোপদেশ' শোনা যায়। খামোকা হিন্দুধর্ম নিয়ে এত চিৎকার চেঁচামেচি কেন? ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় শাসনতন্ত্র পর্যন্ত প্রায় নির্মূল হতে চলেছে; সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের "বিশ্বাস"-এর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে। রাজনীতির নৌকাগুলো ভবসাগরে ডুবছে, ভেসে উঠছে, আবার ডুবছে। ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী সেজে সামনে আসছে কিছু লোভী শিল্পপতি, কিছু জোচ্চোর, কিছু মারাত্মক দানব।

এসব তো ভাল কথা নয়।

২

একটি বিতর্কাতীত তথ্য হ'ল এই যে, হিন্দুধর্ম বিশ্বের অতি বিশিষ্ট একটি ধর্ম—বারবার কঠোর ভাবে, বিশ্রী ভাবে সমালোচিত হয়েছে, এখনও হয়। কিন্তু, হাতি কী মশার কামড় অনুভব করে? হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুগণ এ সব সমালোচনাকে গ্রাহ্য করে না। বুদ্ধির স্তরেও হিন্দুধর্মের সমর্থক এবং সমালোচকদের তর্ক-বিতর্কের নিদর্শন সামান্যই। এটিও বিতর্কাতীত তথ্য যে, ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালে এবং পরে বহু হিন্দু দেবালয় ভাঙা হয়েছে। যে সব হিন্দু দেবতার অসীম ক্ষমতা কল্পিত এবং নানাভাবে প্রচারিত এবং প্রচারিত হয়েছিল, তাঁরাই কী তাঁদেরই মন্দির ভাঙা আটকাতে পারলেন? এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ না করে, হিন্দুরা

আবার নতুন নতুন মন্দির বানিয়েছে। মন্দির ভাঙা হয়েছে বার বার; মন্দির নির্মাণ করাও হয়েছে বারবার। শেষ পর্যন্ত মন্দির ভাঙা উন্মত্ততার অবসান হয়; কারণ নিতান্ত উন্মাদেরও ক্লান্তি আসে।

পরে কিছু খ্রীষ্টান মিশনারি এবং পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক হিন্দুধর্মের আদ্যশ্রাদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু এই শ্রাদ্ধ আদ্যভাগেই নিষ্পন্ন হয়েছে; তা বৃষোৎসর্গ, তোরণ কিংবা দানসাগর শ্রাদ্ধ হয়নি। তার কারণ ছিল এই যে, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারের জন্যও পদাবলী কীর্তন এবং খোল-করতাল ব্যবহার করা হ'তে থাকে; খ্রীষ্টানরাও জলে স্থলে জাত-বিচার শুরু করে। খ্রীষ্টান্ পুরোহিতদের খ্রীষ্টানী মন্ত্র হিন্দু জনসাধারণ শুনেও শোনেনি। কাঁহাতক আর মোটা মোটা বাইবেল মাগ্‌না বিলানো যায়।

খ্রীষ্টের জন্মেরও ছ'শ বছর আগে, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি 'শ্রমণ'-সম্প্রদায়, পরে চার্বাকমতাবলম্বীগণ হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু আচারবিচার সম্পর্কে বহু নেতিবাচক ভাষ্য রচনা করেছিল। কিন্তু, ক্রমশঃ তারাও হিন্দুধর্ম দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়।

অথচ, করুক তো কেউ ইসলামের নিন্দা। তার চামড়া খুলে নেওয়া হবে। ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক কলহে একে অপরের গলা কাটতে দ্বিধা করে না। কিন্তু, করুক তো কেউ ইসলামের নিন্দা। তখন সুন্নি এবং শিয়ারা একত্রিত হ'য়ে তার গলা কাটবে।

এটাই কী এখন হিন্দুদের অথবা হিন্দুবাদের আদর্শ হবে? না কী তা কখনও হিন্দুদের আদর্শ ছিল?

তা হ'লে প্রশ্ন, ঠিক এখনই কিছু লোক, কিছু দল / গোষ্ঠী খামোকা অযোধ্যার একটি পুরানো মসজিদে, পৌরাণিক অবতার শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি নির্ধারণ করতঃ সেই মসজিদেই শ্রীরামের মন্দির বানাতে চায় কেন? বোম্বাই সহরে নির্মিত হ'ল 'রামরথ'; তাতে আরোহণ করলেন একজন রাজনৈতিক নেতা। এরই বা অর্থ কী?

এটা কী হিন্দুধর্মের কোন নতুন ব্যাখ্যা অথবা পরিণাম? এটা কী রাজনীতি? এটা কী 'চতুর্বর্গ'-মূলক কোন নতুন আচারানুষ্ঠান? এটা কী 'হিন্দু মৌলবাদ'? এটা কী স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

৩

আমি একথা বারবার বলেও লজ্জা পাই না যে, আমিও একজন হিন্দু,

এবং জন্মসূত্রে যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ। আমাদের বাড়িতে বেশ বড় টোল ছিল। সেখানে পাণিনির ব্যাকরণ, নব্যন্যায়, স্মৃতি, এবং ভক্তিশাস্ত্র পড়ানো হ'ত। আমার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতগণ শিক্ষার্থীদের সমস্ত খরচ বহন করতেন; কোন জমিদারের অথবা সরকারের কাছ থেকে তাঁরা আর্থিক সাহায্য নেননি। গৃহে শালগ্রাম ঠাকুর অধিষ্ঠিত ছিলেন; প্রতিদিনই তাঁর পূজার্চনা হ'ত; সন্ধ্যায় নামকীর্তন হ'ত। খুব ধুমধাম করে সরস্বতীর আরাধনা করা হ'ত। আমার পরিবার হিন্দুত্বের এবং পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র বিক্রমপুরেই প্রসিদ্ধ ছিল। আমি নিজে আধুনিক ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্র। সম্ভবতঃ পারিবারিক প্রভাবের জন্যই, আমি নিজের চেষ্টায় সামান্য সংস্কৃত শিখেছি, এবং বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি অতি বিশিষ্ট হিন্দু-সম্প্রদায়ের ইতিহাস জানতে চেষ্টা করেছি, এবং এখনও সেই চেষ্টা করছি। নিতান্তই অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন আমি; তাই হিন্দুধর্ম যে ঠিক কী, তা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি।

কিন্তু, প্রায় দুর্জ্ঞেয় এই বিরাট বিষয়টি সম্পর্কে ভাবনাহীন অজ্ঞানতাই মহাসুখের কারণ,—তা আমি মেনে নিতে পারি নি। অথচ প্রশ্ন,—আজ যাঁরা হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব, হিন্দু-বিশ্বাসের সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নানাবিধ 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' শুরু করেছেন; মানুষকে ধর্মান্ধ করে দিয়ে, নিজেরা প্রায় মরুদ্যানে বসে খেজুর খাচ্ছেন; তাঁরাও কী এতাবৎ-কাল পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের কোন সুস্পষ্ট, সর্বজনগ্রাহ্য, সুপ্রমাণিত, যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞা অথবা ব্যাখ্যা সংস্থাপিত করতে পেরেছেন?

হিন্দুধর্ম মানে কী শ্রীরাম? হিন্দুধর্ম মানে কী বজরঙবলী? হিন্দুধর্ম মানে কী অযোধ্যার একটি প্রাচীন মসজিদের স্থলে শ্রীরামের মন্দির নির্মাণ? অথবা, সেই মন্দির নির্মাণের জন্য "করসেবা"? "করসেবা"র তত্ত্ব তো অমৃতশহরের স্বর্ণমন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে। বলি—শিখরা কী "হিন্দু"?

একজন পণ্ডিত হিন্দুধর্মের সত্যার্থ-নিরূপণ করে লিখেছেন:[২]

> Hinduism is a title applied to that form of religion which prevails among the vast majority of the population of the Indian Empire. Brahmanism, which is the term generally used to designate the higher and more philosophical form of modern Hinduism, is more

> properly restricted to that development of the faith which, under Brahman influence, succeeded to Vedism, or the animistic worship of the grater powers of nature.

লক্ষণীয়. এই সঙ্গার্থে 'Hinduism' অর্থ, তিনটি সংশ্লিষ্ট ধর্ম, যথা (ক) ভারতীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকের ধর্ম হিন্দুধর্ম ; (খ) আধুনিক হিন্দু-ধর্মের অন্তর্গত উচ্চতর এবং দার্শনিক স্তরের ব্রাহ্মণ্যবাদ, এবং (গ) ব্রাহ্মণ্য-বাদের পূর্ববর্তী বেদবাদ, যার ভিত্তি ছিল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপাসনা।

যিনি এই সঙ্গার্থ নির্ণয় করেছেন তিনি পণ্ডিত হ'লেও ভারতীয় এবং হিন্দু ছিলেন না। তাই এ সঙ্গার্থ স্পষ্ট নয়। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন স্তর ছিল এবং তাদের ক্রমবিকাশ হয়েছিল, তা এই পণ্ডিত জানতেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের স্তর অনেক ; মাত্র তিনটি তো নয়। তা অনুমান করে এই লেখক আমাদের জানালেন : [৩]

> The molecular character of Hinduism is due to the varieties of race and culture in the population, the localization of its deities resulting from the worship of the guardian spirits of the isolated communities which formed their settlements in its jungles.

অর্থাৎ, হিন্দুধর্মের একটি "আনবিক" ( molecular ) চরিত্র রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে বহু জাতির এবং সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। দেবদেবীদের 'স্থানীয়তা' ( localization ) সুস্পষ্ট। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সমাজে 'অভিভাবক-দেবতাগণ' পূজিত হন। এই সব বিচ্ছিন্ন সমাজ জঙ্গলাবৃত অঞ্চল সমূহে উপনিবেশ গঠন করে।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে ভীল, কোল, মুণ্ডা, গণ্ড, বড়ো, মুরিয়া, সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতি সমূহের ধর্মবিশ্বাসও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত। কিন্তু এ ধরণের ব্যাখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বিনয়কুমার সরকার মেনে নিতে পারেননি।[৩ক] হরপ্রসাদ এই যুক্তি দিলেন যে, অন্ততঃ বাঙালাদেশে লোকস্তরে প্রচলিত অনেক ধর্মবিশ্বাসই ঠিক হিন্দু নয় ; বরং পচাগলা বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। বিনয়কুমার এই যুক্তি দিলেন যে, মুসলমানগণ যখন বাঙালাদেশ দখল করল তখন, এবং তার পরেও. নিম্নবর্গের বাঙালিরা 'আর্য'-

ধর্মদ্বারা প্রভাবিত হলেও, যথার্থ 'হিন্দু' ছিল না; কাজেই, ইসলামধর্মে তাদের ধর্মান্তরণের এই অর্থ ছিল না যে, বাঙালি হিন্দুদের মুসলমান করা হ'ল।

তাই যদি হয়, তবে হিন্দুধর্ম আসলে কী? কী তার চরিত্র? স্পষ্টতঃ হিন্দুধর্ম 'আনবিক', 'molecular', বহুত্বর বিশিষ্ট ধর্ম। যে ব্রাহ্মণ গলায় উপবীত ধারণ করে ত্রিসন্ধ্যানুষ্ঠান করেন, তিনিও হিন্দু। তেমনি যে হারাণ বাগদি পাঁয়রা বলি দিয়ে বাবা পঞ্চানন্দকে সন্তুষ্ট করেন, তিনিও হিন্দু। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন স্তর নির্ণয়ের জন্য, নির্মলকুমার বসু, রবার্ট রেড্ফিল্ড, এবং মিল্টন্ সিঙ্গার একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁদের মতে, হিন্দুধর্মের মাত্র দুটি সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্য আছে। একটি 'বৃহৎ ঐতিহ্য'। তাতে ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা এবং গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ প্রথিত। অপরটি 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য'। তাতে পঞ্চানন্দের পূজা আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই দুটি ঐতিহ্যের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হ'তে পারে। একটি তাত্ত্ব অনুসারে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—পঞ্চানন্দ না কী একজন 'কুচনী'র সঙ্গে শিবের অবৈধ মিলনজাত সন্তান। শিবের সন্তান; তাই অবৈধ হওয়ার জন্য তিনি গণেশের মতো ব্রাহ্মণদের দেবতা না হয়ে, গ্রামদেবতা হয়ে গ্রামের বটতলায় স্থান পেলেন।[৩খ]

ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঐতিহ্যদ্বয়ের সংশ্লেষ এবং বিশিষ্টতা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু, এই ঐতিহ্যদ্বয়ের সংশ্লেষের এই তত্ত্ব সম্প্রদায়ভিত্তিক, জাতিবর্ণভিত্তিক, এবং আর্থ-সামাজিক বিভিন্নতাকে স্পষ্ট করে না, তার উপরে প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। অথচ, হিন্দুধর্মে, এবং হিন্দু সমাজে নানান রকমের বিভিন্নতা ছিল। তাত্ত্বিক প্রলেপ মাখিয়ে তাকে বাগ্ না করে দেওয়া যায় না।

৪

মোক্ষমূলর্, মনিয়ার্ উইলিয়ামস্, বেবর, হপ্কিন্স্, জিমার, লুই রেনো, গোণ্ডা প্রভৃতি বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ; কানে, রাধাকৃষ্ণন, ভাণ্ডারকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি স্বদেশী ভারততত্ত্ববিদ—উভয় ধরণের ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের 'বৃহৎ ঐতিহ্য' সম্পর্কে গভীর এবং ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তাঁদের দেওয়া হিন্দুধর্মের বিবরণ প্রধানতঃ 'ব্রাহ্মণ্য' হিন্দুধর্মের বিবরণ।

অবশ্য হিন্দুধর্মের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'ঐতিহ্য' সম্পর্কেও গবেষণা হয়েছে।

সে গবেষণা এখনও চলছে। কিন্তু দেখা যায়, প্রথম থেকেই হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যই হিন্দুধর্মের বিবরণে এবং তাত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, দয়ানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, ভগ্নী নিবেদিতা, স্বামী প্রণবানন্দ—হিন্দুধর্মের এবং হিন্দুত্বের জনপ্রিয় ব্যাখ্যাতাগণ প্রায় কিছুই লেখেননি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙালার 'ব্রত' সম্পর্কে কিছুটা উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে সব ব্রত প্রধানতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদের ব্রত। অগণিত 'নীচ'-জাতির পূজা-পার্বণ ব্রত উপাসনা সম্পর্কে উচ্চ হিন্দুদের নাসিকাকুঞ্চন অবহেলা করা যায় না। আজও যাঁরা 'হিন্দুত্ব' নিয়ে বড়াই করেন, তাঁদের মধ্যেও কারু কারু নাক বেশ উঁচু। একজন লিখেছেন :[৪]

> অভ্যাভূত আর্যপ্রতিভা সেই সমস্ত মত-পথ, আচার-প্রথা ও শ্রেণী-সম্প্রদায়গুলিকে এমন ভাবে পরিপাক করে আত্মসত্তায় মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছে যে আজ আর তাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এটা মিথ্যা প্রচার, কারণ হিন্দুধর্মে কেবলমাত্র 'আর্যপ্রতিভাই' নেই, 'অনার্য প্রতিভা'ও আছে। দু'ধারে দুটো গরু নিয়ে, বিশিষ্ট ভাবে, বিশ হাত বিশিষ্ট, যে হাসমুখ মানুষটি মাদুরায় মন্দিরের দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছে, সে কোথাকার আর্য? হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশে তথাকথিত 'অনার্য'দের অবদানকে অস্বীকার করার অর্থ, হিন্দুধর্মের তিন চতুর্থাংশকেই অস্বীকার করা। এই তথাকথিত 'আর্যবাদ'কেই আমরা আধুনিক 'হিন্দুবাদ' বলতে পারি।

অথচ 'হিন্দু' শব্দটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ সমূহে নেই। 'হি [ন] দুস্' শব্দটি পারস্য-সম্রাট দারিয়ুসের একটি লিপিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬-তে উৎকীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী গ্রিক সাহিত্যে 'হোদু' কথাটি 'হিন্দু' অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'হ [ন] দুস' কথাটির অর্থ হিন্দুধর্ম নয়; তার অর্থ সিন্ধুনদ এবং তার শাখানদীগুলোর তীরবর্তী অধিবাসীগণ। 'সিন্ধু'র 'স' স্থানে, পারস্য এবং গ্রিক ভাষায় 'হ' উচ্চারিত হয়েছে। তা না হ'লে 'হিন্দু'-ধর্ম, 'সিন্ধু'-ধর্মরূপেই পরিচিত এবং প্রচারিত হ'ত। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-ও লিখেছেন যে 'হিন্দু' কথাটির ভৌগলিক অভিধাই প্রধান; ধর্মীয় ব্যঞ্জনা অপ্রধান।[৫]

৫

সুবিখ্যাত 'অমরকোষ'-এ 'ধর্মঃ', 'ধর্মচিন্তা', 'ধর্মধ্বজিন্', 'ধর্মপত্তন',

'ধর্মরাজ', 'ধর্মসংহিত' প্রভৃতি শব্দার্থ নির্ণয় করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কোন কোন শব্দের অর্থ এইরূপ :৬

১. 'বেদবিহিত যজ্ঞাদির নাম ত্রয়ীধর্ম'

২. 'ধর্মঃ', 'পুণ্য' ; 'যম অর্থাৎ শরীর সাধনাপেক্ষ কর্ম' ; 'ন্যায়' , 'স্বভাব' ; 'আচার' ; 'সোমপানকর্ত্তা'

৩. 'ধর্ম-বিষয়ক চিন্তার নাম উপাধি'

৪. 'উপার্জনার্থ জটাভস্মধারী ব্যক্তির নাম ধর্মধ্বজিন্ ; লিঙ্গবৃত্তি'।

আমার মনে হয়েছে, এখন যাঁরা হিন্দুত্ব, হিন্দুধর্ম, রামশীলা, রামমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মারাত্মক আন্দোলন শুরু করেছেন, তাঁরা সেই 'জটাভস্মধারী', এবং জটাভস্মহীন, 'ধর্মধ্বজিন্' ; রাজনৈতিক এবং আর্থিক শক্তির 'উপার্জন'-ই তাঁদের লক্ষ্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব সংরক্ষণশীল হিন্দুনেতা রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান রচিত হয়েছিল। সেখানে 'ধর্ম' কথাটির অর্থ বহু উদ্ধৃতিসহ সুনির্ণীত হয়েছে, যেমন :৭

১. 'ধর্ম' ; "ধরতি লোকান্ ভ্রিয়তে পুণ্যাত্মভিঃ ইতি বা"। এখানে 'লোকান্', অথবা 'পুণ্যাত্মা' কেবলমাত্র 'হিন্দু' বোঝায় না।

২. 'ধর্ম' ; "ন্যায়ঃ স্বভাবঃ আচারঃ অহিংসা, উপনিষৎ"

৩. 'ধর্ম' ; "প্রাণায়ামস্তথাধ্যানং প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
স্মরনঞ্চৈব যোগেঽস্মিন্ পঞ্চধর্মাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

৪. 'বরাহপুরাণ'-মতে ব্রহ্মদ্বারা সৃষ্ট ধর্ম
"ব্রহ্মচর্য্যেন সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাঽপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভঃ।
অহিংসয়া সুশান্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।"

৫. 'বামণপুরাণ' [ ১১ অধ্যায় ]—মতে দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, শাস্তব, গুহ্যক, রাক্ষস প্রভৃতির আলাদা আলাদা 'ধর্ম' আছে।

৬. 'মৎস্যপুরাণ' অনুসারে, অদ্রোহ, অলোভ, দম, দয়া, তপঃ, ব্রহ্মচর্য, সত্য, অক্রোশ, ক্ষমা, ধৃতি—এসবই 'সনাতন ধর্ম'।

৭ 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-মতে 'বেদবিহিত' ধর্মই মঙ্গলকর।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে কোন শাশ্বত মূল্যবোধ এবং সে-সব মূল্যবোধের অভ্যাস 'ধর্ম' শব্দের অভিধাতে, লক্ষণাতে, এবং ব্যঞ্জনাতে প্রাধান্য পেয়েছে। তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সদাচারমূলক বৃহৎ ঐতিহ্য। এখানে সুস্পষ্ট ভাবে কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা বলা হয়নি।

কিন্তু, যদি ধর্মের এসব আভিধানিক অথবা পৌরাণিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করি, তবে হিন্দু-ধর্মের অনেক রকমের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঐতিহ্য অধর্মের অথবা অধার্মিকতার নিদর্শনরূপে মেনে নিতে হয়। মানুষ যেহেতু মৌলিক বিচারে 'স্তন্যপায়ী জীব' মাত্র, তাই তার মস্তিষ্ক অবিশ্বাস্য ভাবে উন্নত এবং পরিণত হলেও তার মধ্যে পশুত্বের উপাদান নিতান্ত কম নয়। সেই স্বাভাবিক পশুত্বই তার নগ্ন, হিংস্র রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় যুদ্ধে, আনবিক ধ্বংসাস্ত্রের আস্ফালনে, ধর্মের দাঙ্গাতে, পুঁজিবাদীদের সীমাহীন লোভে, লম্পটের পাশবিক লালসায় এবং বিভিন্ন ধর্মমতের দৈবিক কিংবা দেহবাদী ব্যাখ্যাতে। সব ধর্মমতেও এই পশুত্ব নিন্দিত এবং পরিত্যক্ত হয়; আবার সব ধর্মতেই তা মাঝে মাঝে তার কুৎসিত রূপ নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে; তার কারণ, মানুষের সভ্যতা যেমন সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন হতে পারেনি, তেমনি মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত কোন ধর্মমতও সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন হ'তে পারে না। তাই পূর্বে উল্লিখিত মহিমান্বিত 'আর্য প্রতিভা' হিন্দুধর্ম ক্ষেত্র থেকে পশুত্বকে বিতাড়িত করতে পারেনি; তাকে মেনে নিয়েছে, এবং তার আধ্যাত্মিক / ভাববাদী ভাষ্য তৈরি করেছে। যিনি গীতায় সহস্র সূর্যের মতো প্রদীপ্ত, সেই কৃষ্ণ-বাসুদেব বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে যে 'অষ্টকালীন' লীলা করেন, তাতে আর যাই থাক, ব্রহ্মচর্য কিংবা তপঃ ছিল না। বামাচারী, 'পরমগহন' কৌলধর্ম স্পষ্টতঃ 'পঞ্চম-কারাত্মক' ধর্ম; 'রহস্যপূজাপদ্ধতি'[৮] নামক গ্রন্থানুসারে শ্রীরামচন্দ্র, সাধনসঙ্গিনী সীতার সাহায্যে এই ধর্মের বিশিষ্ট ধার্মিক হয়ে ওঠেন। আরো কথা আছে। 'অক্রোধ' যদি ধর্ম হয়, তবে রাম কেন রাবণকে হত্যা করেন? 'সংযম' যদি ধর্ম হয়, তবে ব্রহ্মা কেন অজাচারে লিপ্ত হন? 'ক্ষুদ্র' ঐতিহ্যের কথা না হয় নাই বললাম; 'বৃহৎ' ঐতিহ্যতেও আমরা হানাহানি, মারামারি, লাম্পট্য প্রভৃতি অপরাধের কতোই না নিদর্শন দেখতে পাই। 'সদাচার'-যে অবস্থার এবং সময়ের আপেক্ষিকতার উপরে নির্ভরশীল,

তা দেখাবার জন্য সম্মানীয় দেবতাদের সম্বন্ধেও কত না অশ্লীল কাহিনী বলা হয়েছে।

সম্ভবতঃ পরবর্তী বৈদিক যুগেই তন্ত্রের এবং অভ্যাসের ক্ষেত্রে এসব পতন দেখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতাগণ বৃহৎ ঐতিহ্যে মনুষ্যত্বের, সভ্যতার, সদাচারের আদর্শ সংস্থাপিত করেছেন। এই আদর্শ সন্ন্যাসের আদর্শের সঙ্গে সমন্বিত হ'ল। বলা হ'ল:

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে শান্ত, জ্ঞানী সাধকগণ, জীবনদাবানল দগ্ধ সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে বাস করেন। তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তপস্যাতে মগ্ন হয়ে যান। এ সব নিরাসক্ত, নির্লোভ সাধক সূর্যদ্বার পথে, সূর্যের অপার্থিব জ্যোতির্ময় তোরণ পার হয়ে সেখানে যান, যেখানে আছেন সেই অব্যয়াত্মা, অমৃতময় পুরুষ।

আমাদের লালন ফকিরও তো সর্বহারা ফকির। কিন্তু, তাঁর অসাধারণ সব গীতিকবিতায় জ্ঞানের এবং শান্তির বাণী আছে। তিনি না হিন্দু না মুসলমান। কিন্তু, তিনি 'আঠার মোকামের মাঝে', 'আয়না মহলে' রূপহীন ঈশ্বরের অপার্থিব 'নূর' অথবা দীপ্তি দেখেছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের আলোকের মতো স্নিগ্ধ, আনন্দময় এই দীপ্তি। আধুনিক 'হিন্দুবাদ'-এর প্রবক্তাগণ কী এই শান্ত, বিদ্বান, 'ভৈক্ষ্যচর্যাচরন্ত' লালন ফকীরকে, অথবা কবীরের মতো 'ব্রাত্য' মহাপুরুষকে স্বীকৃতি দিতে পারেন? হয়তো তাঁরা তা দিতে কিছুটা ইতঃস্ততঃ করবেন, কেন না, এর সঙ্গে 'মণ্ডল কমিশন'-এর বিতর্কিত প্রতিবেদনটি জড়িয়ে আছে।

৬.

আজকাল কোন কোন মার্কসবাদী দল 'হিন্দু মৌলবাদ' শব্দগুচ্ছ'টি প্রায়শঃ ব্যবহার করেন। কিন্তু কথাগুটির অর্থ পরিষ্কার নয়। লক্ষণীয়, 'Fundamentalism' অথবা 'মৌলবাদ' শব্দটি সুবিখ্যাত Encyclcpaedia of Religion And Ethics গ্রন্থে নেই। মেরিয়াম্-ওয়েবষ্টার-এর বিখ্যাত ইংরেজি অভিধানে শব্দটির অর্থ এইরূপ:[?]

a movement in 20th century Protestantism emphasizing as fundamental the literal inerracy of the scriptures, the second coming of Jesus Christ, the Virgin birth physical resurrection and substitutionary atonement.

অর্থাৎ, Fundamentalism বিশ শতকের খ্রিষ্টান প্রটেষ্টান্ট ধর্মের একটি আন্দোলন।

এ আন্দোলনের মৌলিক ধারণা—

শাস্ত্র সমূহের সাহিত্যিক অভ্রান্ততা
খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব
খ্রিষ্টের জননীর কৌমার্য
খ্রিষ্টের শরীরী পুনরুত্থান, এবং
পাপীদের ত্রাণের জন্য তাঁর প্রায়শ্চিত্য।

প্রটেষ্টান্ট ধর্মের এই বিশিষ্ট পরিভাষা এখন ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কেও প্রযুক্ত হচ্ছে। Fundamentalism-এর সংস্কৃত অনুবাদ 'মৌলবাদ'। একজন পণ্ডিত না কী 'মৌলবাদ'-এর স্থলে 'ভৈত্তিকতা' শব্দটি ব্যবহার করতে চান। অথচ, Fundament-কথাটির একটি অর্থ পায়ু। তাই Fundamentalism-কে পায়বীয়বাদ বললে ব্যাকরণের বিচারে দোষ হয়না, কিন্তু ভদ্রতায় বাঁধে।

হিন্দুধর্ম 'মৌলবাদী' কী না, তা বিচার করার আগে কিছু তথ্য আলোচ্য। ধর্মীয় মৌলবাদের সুদৃঢ় শাস্ত্রীয় 'ভৈত্তিকতা' থাকা প্রয়োজনীয়। এধরণের ভৈত্তিক শাস্ত্র বাইবেল এবং কোরান। বাইবেলের এবং কোরানের বহু রকমের ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ব্যাখ্যার এবং ভাষ্যের গুরুত্ব, কখনই মূল শাস্ত্র গ্রন্থের গুরুত্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। শাস্ত্রের সাহিত্যিক অভ্রান্ততা খ্রিষ্টান ধর্মের এবং ইসলামের মৌলতম তত্ত্ব। এসব তত্ত্ব যিশুখ্রিষ্ট এবং হজরত মুহম্মদ প্রচার করেন।

অথচ, দাবী করা হয়েছে যে, হিন্দুধর্ম যে হেতু কোন বিশেষ 'পুরুষ' অথবা মানুষ প্রচার করেননি, তাই এ ধর্ম 'অপৌরুষেয়'। কিন্তু, বহু 'পুরুষ'ই এ ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচার করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন মনু, ব্যাস, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, বিবেকানন্দ,-এ সকল মহাত্মা। কাজেই সঙ্কর্থে হিন্দুধর্ম কখনই 'অপৌরুষেয়' ছিল না। এক কথায় হিন্দুধর্ম কোন একটি শাস্ত্রের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে একবৈধিক হয়নি। তার বহুরকমের সংগঠন ছিল,

এবং আছে। বহুরকমের ধর্মবিশ্বাস হিন্দুধর্মরূপে পরিচিত। প্রাচীন হিন্দুধর্মের সঙ্গে নবীন হিন্দুধর্মের মিশ্রণ, পাশাপাশি অবস্থান, অথবা একটি ধর্মমত থেকে আর একটি ধর্মমতের তাত্ত্বিক দূরত্ব কিংবা নৈকট্য—এসবই দেখা যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রস্থান ভেদের আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরস্থ সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতার বিরোধী ছিলেন। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য-ঘোষণাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি লিখেছিলেন :[১০]

> হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের
> পরিচয়কে বোঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ
> ধর্ম। কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে।
> হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।
> ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদ নদী অরণ্য পর্বতের মধ্যদিয়া, অন্তর এবং বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের এই কবিত্বময় ভাষ্য কারু কারু পছন্দ হয় নি। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বৈশাখে 'ব্রাহ্মণ সমাজ' নামক পত্রিকাতে লেখা হল :[১১]

> 'রবীন্দ্রনাথ! বার্দ্ধক্যেও বুদ্ধি ফিরিল না! পৃথিবী ঘুরিয়াও মানব চরিত্র বুঝিলে না? ...বিলাতে একটা সভায় দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বল দেখি—আমার পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম সত্য, দেবতা সত্য, সাধন তপস্যা দেবপূজা শ্রাদ্ধতর্পণ যাহা কিছু সব সত্য, তুমি দেখিবে তোমার কবি-সাম্রাজ্য কর্পূরের মতো উড়িয়া গিয়াছে, তোমার সভ্যতা রসাতলে ডুবিয়াছে, তুমি একটি বর্ব্বর বনিয়া গিয়াছ...তোমার মুখে কি উদারতার কথা সাজে?

সে যাই হোক্, যে অর্থে প্রটেষ্টাণ্ট্-দের একটি বিশেষ মত মৌলবাদী, অথবা ইসলামের কোন ভাষ্য মৌলবাদী, সে অর্থে উপরে উক্ত 'ব্রাহ্মণ সমাজ'ও হিন্দুধর্মকে মৌলবাদী করে তুলতে পারত না; এখনও কারু পক্ষে সে বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। 'ভিক্ষাচর্যা'-রত উচ্চস্তরের হিন্দু সাধকগণ অব্যয়াত্মা 'পুরুষ'-এর কথা ভাবতেন। তাও যেমন হিন্দুধর্ম; তেমনি গরীব রিক্সা-

চালকদের. অথবা মুটে-মজুরদের গৃহিনীগণ স্বামীর, এবং পুত্র কন্যার মঙ্গলের জন্য, শোভাবাজারের ঘাটে, গঙ্গাতে, যে ফুল মালা এবং প্রদীপ ভাসিয়ে দেন, তাও হিন্দুধর্ম। ব্রহ্মবাদী সাধকদের ঔপনিষদিক প্রার্থনা যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, তেমনি এই সব ফুল মালা প্রদীপ কূলহারা নদীর স্রোতে কোন মহাসাগরের দিকে ভেসে যায়।

কোন 'আর্য' হিন্দুবাদের উদ্ভবের পরে হিন্দুধর্মের সমগ্র বৈচিত্র্যকে একমাত্র বেদান্তের বন্ধনীতে বাঁধা হয়েছিল। বৈদান্তিক হিন্দুবাদ, আর এখানকার 'হিন্দু' দোকানদারদের রামের এবং হনুমানের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা কখনই, কিছুতেই এক নয়। বেদান্ত অত্যন্ত কঠিন; তার পরিভাষা কঠিন, তার যুক্তি বহুস্তর তর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত; তার অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব দুর্বোধ্য। কিন্তু বেদান্তে যে সর্বজনীনতা, যে গভীর অনুভূতি সমৃদ্ধ পবিত্রতা এবং উদারতা আছে, তাকে কোন যুক্তির সাহায্যেই ছোট করে দেখা যায় না। সেই সর্বজনীনতা, পবিত্রতা, উদারতা হিন্দুদের কোন আধুনিক তত্ত্বে আছে কী না, থাকলেও কতখানি আছে, তা বিচার করে দেখা হয় না।

হিন্দুধর্ম 'সনাতন' ধর্মরূপে পরিচিত। কিন্তু, বেদ-সমূহ বিভিন্ন, স্মৃতি-সমূহ বিভিন্ন। 'মহাভারত'-এ বলা হয়েছে, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ; শ্রুতিও বিভিন্ন; এমন কোন ঋষি নেই, যাঁর মত প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। ধর্মতত্ত্ব গুহাতে নিহিত, অথবা দুর্জ্ঞেয়। অতএব, 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা'।

মতের একতাস্থাপনে মীমাংসাদর্শনের খুব বেশি গুরুত্ব ছিল। হিন্দু দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ লিখেছেন:[১২]

> তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সম্বন্ধে তখনও সম্পূর্ণরূপে সংশয়শূন্য হইতে পারেন নাই। জৈমিনি মুনি চিত্তের বিশুদ্ধি ও স্থিরতা সিদ্ধির উপায়ভূত কর্মানুষ্ঠানের উপযোগিতা সংস্থাপনপূর্বক বেদের নিত্যতা, অপৌরুষেয়তা ও স্বতঃপ্রমাণতা রূপ দৃঢ় ভিত্তির উপরে কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব মীমাংসা সমাপ্ত করিলেন।

'পূর্ব মীমাংসা' যে 'সংশয়-সমাকুল নাস্তিক' দলের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ডভিত্তিক মৌলবাদরূপে এক সময়ে ব্যাখ্যাত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে কৃষ্ণ মিশ্র যতি-বিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক রূপক-নাটকে। নাটকটি একাদশ শতকে রচিত হয়েছিল।

এই নাটকে বলা হয়েছে যে, ষড়্দর্শনে স্থানে স্থানে যে মতভেদ প্রকটিত

হয়েছে. তা ছিল 'অবান্তর' : "যেন বেদপ্রসূতানাং তেষ্যামবান্তর বিরোধেঽপি বেদসংরক্ষনায়ব নাস্তিক পক্ষ প্রতিক্ষেপণায় শাস্ত্রানাং সাহিত্যমেব। আগমানাঞ্চ তত্ত্বং বিচারয়তামবিরোধ এব।" অর্থাৎ, যাঁরা একই বংশজাত, তাদের মধ্যে বিরোধ থাকতেই পারে। কিন্তু নাস্তিকদের "প্রতিক্ষেপণ"-এর জন্য তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়। আগমতত্ত্ব বিচারে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। তাই,

> সাংখ্যন্যায় কণাদ ভবিত মহাতায়াদি শাস্ত্রৈর্বৃতা
> স্ফুর্জন্যায় সহস্র বাহুনিকরৈঃ উদ্ভোতয়ন্তী দিশঃ।
> মীমাংসা সমরোৎসুকা বিরতবজ্র্বের্দ্ কান্তাননা
> বাগ্‌দেব্যাঃ পুরতস্ত্রয়ী ত্রিনয়না কাত্যায়নীবাশরা।[১৩]

অর্থাৎ, সাংখ্য, ন্যায় কণাদভাষ্য প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে, ন্যায়শাস্ত্রের সহস্রবাহুর দ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করে, ধর্মরূপ চাঁদবদনী, এবং তিনটি বেদরূপ ত্রিনয়না, যুদ্ধের জন্য উৎসুকা মীমাংসা, দুর্গার মতো সরস্বতীর সামনে আবির্ভূতা হলেন।

এই শক্তিরূপা মীমাংসার সঙ্গে কী পাষণ্ড মতবাদ সমূহ যুদ্ধ করে পারে। তাদের খণ্ডবিখণ্ড রক্তমাংসে যুদ্ধস্থল পূর্ণ হল। ফলে,

> সৌ গতাস্তাবৎ সিন্ধু পাঞ্চাব পারসিক মাগধান্ধ্র হূণ বঙ্গ কলিঙ্গাদীন্ ম্লেচ্ছ প্রায়ান্ প্রবিষ্টাঃ। পাষণ্ড দিগম্বর কাপালিকাদয়স্তু পামরবহুলেষু পাঞ্চালমালবাভীরাবর্ত ভূমিষু সাগরোপান্ত নিগূঢ়ং সঞ্চরন্তি। ন্যায়ানু-দুগত মীমাংসয়াবগাঢ় প্রহার জর্জরীকৃতা নাস্তিক তর্কাস্তেবা মেবাগমা-নামনুশরণং প্রয়াতাঃ।[১৪]

বৌদ্ধগণ সিন্ধু পাঞ্জাব পারসিক মগধ অন্ধ্র হূণ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করল। পাষণ্ড দিগম্বর সিদ্ধান্ত কাপালিক প্রভৃতি সমুদ্রের উপকূলবর্তী কৃষক-বহুল অঞ্চলে, পাঞ্চালে, মালবে, আভীরে, আবর্তে প্রবেশ করল। সেখানে তারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করতে থাকল। নাস্তিক এবং তার্কিক-গণ ন্যায়ানুগত মীমাংসার প্রগাঢ় প্রহারে জর্জরিত হয়ে পাষণ্ডাগম শাস্ত্রের অনুগমন করল।

আর দাবী করা হচ্ছে,—বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মমতও 'হিন্দু' ধর্মমত। কারণ, তারা "গ্রন্থরূপী" বেদকে না মানলেও, "জ্ঞানরূপী" বেদ, অথবা কতগুলো বৈদিক সিদ্ধান্ত মানে। যদি তাই হয়, তবে চাঁদবদনী ত্রিনয়না

মীমাংসা তাদের এমন প্রচণ্ড প্রহার কেন করল, আর কেনই বা তারা দেশান্তরী হ'ল? পরে আরও তথ্যদ্বারা প্রমাণ করা যাবে যে, এই আধুনিক সর্বজনীনতার প্রচারের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

লক্ষনীয়, হিন্দু ষড়দর্শন, এবং তাদের ভাষ্য সমূহ অশিক্ষিত, বর্ণপরিচয়হীন 'ইতর' হিন্দুদের জন্য পরিকল্পিত হয়নি। তারা এসব ব্রাহ্মণ্য ভাষ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে অবজ্ঞা করে, ভৌগলিক পরিবেশ, সামাজিক সংস্থান, এবং 'জাতি' অনুসারে, অসংখ্য দেবতার, পূজাপার্বণের, এবং ধর্মকৃত্যের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সুকুমার সেন প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, রাম-সীতা-কাহিনীর সব জড়ো পঁয়তাল্লিশটি বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট রূপ আছে। কোনটা মানব?

ব্রাহ্মণগণ, অথবা ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে সাংস্কৃতিক উপযোজন অথবা acculturation-এর প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্বক বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। জাতিভিত্তিক ধর্মকৃত্য স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত উপাদানগুলোকে 'এক' করা যায় কী না, তা নিয়ে প্রথম থেকেই ভাবনা ছিল। 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা'। কিন্তু মহাজন অনেক; তাঁদের চিন্তাও ভিন্ন। তাই শেষ পর্যন্ত সেই অব্যয়াত্ম পরম পুরুষ ব্রহ্মণ-এর চিন্তা করা হয়। অথচ, তার পরেও, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর দুর্বল হয়ে পড়েননি। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বৈষ্ণবীয়, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ভাষ্য দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের লতাপাতা রইল। সম্ভবতঃ একটি সুপ্রাচীন ধর্মরূপে এই চিরসবুজ লতাপাতা ফলপুষ্প শোভিত হিন্দুধর্ম একারণেই এখনো প্রাণবান। তার প্রাণশক্তি ষড়দর্শনে নেই, আছে তার অন্তর্নিহিত অসামান্য সৃষ্টিশীলতায়। কিছুকাল পূর্বেও সন্তোষী মাতা নামে একজন জনপ্রিয় দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে; তাঁকে রুপালী পর্দাতেও দেখান হয়েছে।

কোন কোন গোপনীয় তান্ত্রিক সাধনে সিদ্ধ দুঃসাহসী সাধক, অন্ধকার অমানিশায় গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, অসংখ্য দেবীমূর্তি এবং যক্ষিণী দেখতে পান। তাঁরা কেউ হন তাঁর স্ত্রী, কেউ হন তাঁর প্রণয়িনী, কেউ হন দাসী। এঁদের সকলেরই কোন না কোন নাম আছে। বৃন্দাবনের সব গোপিনী শ্রীকৃষ্ণের 'অংশকলা', অতএব অর্ধ-দেবতা। শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা হ'ল:

যেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্

যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।[১৫]

অর্থাৎ, বালক যেমন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ববিভ্রম দর্শনে নন্দিত হয়, তেমনি রমেশ ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে রমণ করেন। অথচ, এই রমেশই গীতায় ঘোষণা করেছেন :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।[১৬]

শ্রীকৃষ্ণ বললেন :

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্মবিভাগশঃ [১৭]

অর্থৎ, গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্বর্ণ্য আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। লক্ষণীয়, শ্রীকৃষ্ণ এই 'বিভাগ' বলতে বর্ণভেদের জন্মসূত্রের কথা বলেননি। কিন্তু 'চাতুর্বর্ণ্য' জন্মসূত্রের সঙ্গেই সংযুক্ত হ'ল, এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি জন্মসূত্র নিয়ন্ত্রিত চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ অনুসারে স্থির করা হ'ল।

একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য হিন্দু 'কমিউনিটি'র তত্ত্ব এখন প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসে একাধিক 'কমিউনিটি'-র অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের পূর্বকালীন ভারতীয় সভ্যতাকে 'হিন্দু'-সভ্যতারূপে নয়া হিন্দুবাদী ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু আসলে তখন বহু ধর্মসম্প্রদায় ছিল। রমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন :[১৮]

> …it would seem that the reality perhaps lay in looking at it [ Hinduism ] as a cluster of distinctive sects and cults, observing common civilisational symbols, but with belief and ritual ranging from atheism to animism, and a variety of religious organisations identifying themselves by location, language, and caste. Even the sense of religious identity seems to have related more closely to sect than to a dominant Hindu community.

৭

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, 'হিন্দু কমিউনিটি' না থাকলেও, হিন্দুধর্মের কতগুলো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং সেগুলো অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের

উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

(ক) হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যে, অথবা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে, সদাচারের উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্বোক্ত 'শব্দকল্পদ্রুম'-অভিধানেও 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য সদাচারাদর্শের আলোকে বিবৃত হয়েছে। সদাচার হিন্দুধর্মের প্রায় প্রতিটি স্তরেই অল্প-বিস্তর গুরুত্ব পেয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধারা অনুসারে জীবনাচরণে 'হিন্দুত্ব', সদাচার বোঝায়। সদাচারে সভ্যতার অগ্রগতি হয়। এটা বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'মহাভারত' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: 'ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে। তার মর্মগ্রন্থি বারংবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে; দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর, কিন্তু [ মহাভারত ] এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে⋯সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হোত, তাহলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত।'[১৯] অবশ্য সদাচারের যেমন কতগুলো সাধারণ ব্যাখ্যা আছে, তেমন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাও আছে। অথচ, সাধারণীকৃত সদাচার বৌদ্ধ এবং জৈনরাও মেনে নিয়েছিলেন।

(খ) হিন্দুধর্মের আরও একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক উপযোজন। এই উপযোজনের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম অসাধারণভাবে ধারাবাহিক, এবং এখনও পরিবর্ধমান। অথচ, আধুনিক সংস্কারপন্থী হিন্দুবাদীরা 'আর্যতা', এবং 'সদাচার'-এর নামে সেই ধারাবাহিকতাকে একটি বিশেষ স্তরে এনে স্থৈতিক ( static ) করে ফেলতে চায়। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি লিখেছেন:[২০]

India shows extraordinary continuity of culture. The violent breaks known to have occurred in the political and theological superstructure have not prevented long survival of observances that have no sanction in the official Brahmin works, hence can only have originated in the most primitive stages of

human society ; moreover, the Hindu scriptures and even more the observances sanctified in practice by brahmanism, show adoption of non-brahmin local rites. That is, the process of assimilation was mutual, a peculiar characteristic of India.

অর্থাৎ, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে বহু সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটলেও, যে সব ধর্মাচরণ এবং ধর্মবিশ্বাস প্রাগৈতিহাসিক, তা বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আবার ধর্মশাস্ত্রেও অব্রাহ্মণ্য এবং স্থানীয় পূজাপার্বণ স্বীকৃত হয়েছে। উভয়তঃ এই উপযোজনের প্রক্রিয়া ভারতীয় সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তার ফলে, হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত পড়লেও, তার 'আণবিক' (Molecular) চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। তা বহিরাগত ধর্মবিশ্বাসকেও প্রভাবিত করতে পারে। লক্ষণীয়, আধুনিক হিন্দুবাদীগণ ব্রাহ্মণ্যতা, নিষ্ঠা, এবং সদাচারের উপরে খুব বেশি জোর দিলেও মনে করেন যে, 'জগতের অন্যান্য ধর্মগুলি বৈদিক ধর্মের দূর প্রতিধ্বনি মাত্র' ; কিন্তু, যদি বলা হয়, পার্শী, ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মও হিন্দুধর্ম, তবে তাতেও তাঁদের আপত্তি নেই।[২১]

(গ) হিন্দুদের সংখ্যাতীত পূজাপার্বণ এবং ব্রত আছে। সমগ্র ভারতে প্রচলিত হিন্দু-পূজা পার্বণের পূর্ণ তালিকা এখনও প্রস্তুত করা হয় নি। গ্রাম-সমাজে প্রচলিত হিন্দুধর্মের বেশ কিছু ইতিবাচক বিশিষ্টতা দেখা যায়। একজন নৃতাত্ত্বিক বহু দিন ধরে উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে লিখেছেন যে, গ্রামীণ হিন্দুধর্ম পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে ; সামাজিক সদাচার শক্তিশালী করে ; ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে ; গ্রামের নরনারী নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে ; গ্রামের অর্থনীতির বিকাশ হয় ; এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয় ; ভৃত্যরা পুরস্কার পায় ; ভরণীয় বর্গ রক্ষিত হয় ; সম্পত্তির বিনিময় শান্তিপূর্ণ হয় ; নতুন নতুন মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ; গ্রামদেবতার পূজার মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষিত হয়। কৃষিকেন্দ্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গ্রামবাসীর মনে সাহস এবং আশা আনে। অশোক মিত্র-সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ

ও মেলা' [ পাঁচ খণ্ড ] পাঠ করলে এই নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত সমূহের সমর্থনে বহু যুক্তি এবং তথ্য পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতেই গ্রাম্য-সমাজ-ব্যবস্থায় এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী হিন্দুধর্মের প্রভাব দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। কিন্তু এই হিন্দুধর্ম কোন অর্থেই মৌলবাদী কিংবা সংকীর্ণ অর্থে সাম্প্রদায়িক নয়।

(ঘ) হিন্দুধর্মীয় ভাবনায়, প্রায় সর্বকালেই, কান্তিবিচার, এবং গভীর সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। "রামায়ণ হল কাব্য, কবির সৃষ্ট রচনা," লিখেছেন সুকুমার সেন[২২] হিন্দুধর্মের অনেকাংশই কবিতা। ধর্মমিশ্রিত নন্দনতত্ত্ব সাহিত্যের এবং শিল্পকলার উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে। হিন্দুধর্মে নিরাকার, নির্গুণ, সাকার, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভাবনা আছে। নিরাকার ঈশ্বরের বহু-বিধ বিবরণই কবিত্বগীতময়; অনেক ক্ষেত্রেই তা সুগভীর তাৎপর্যবহ ভাববাদ। সাকার এবং সগুণ ঈশ্বর ভাবনা থেকে উৎসারিত হয়েছে অনন্যসাধারণ মন্দির নির্মাণ শিল্প, মূর্তিবিদ্যা, চিত্র এবং বাদ্য কলা, এবং সঙ্গীত। এ সব অসাধারণ শিল্পকলায় সমৃদ্ধ ভারতের সভ্যতা এবং বিবিধ সংস্কৃতি গৌরবোজ্জ্বল।

(ঙ) এ কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, সব রকমের হিন্দুধর্মের মৌল ভাব হ'ল আশার ভাব। সেখানে বলা হয়েছে, ধর্ম অথবা মূল্যবোধের সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। হিন্দুধর্ম প্রতি স্তরেই আশাবাদী। এই অনন্ত আশাবাদ বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বের ভাবনায় প্রতিফলিত হ'ল। বৌদ্ধকাহিনীতে রাম ছিলেন, "মহাসত্ত্ব" অথবা বোধিসত্ত্বদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই আশাবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত নান্দনিক তত্ত্ব অনুসারে কখনও ট্র্যাজেডি হয় না। এই ধর্মে অর্থ এবং কামও চতুর্বর্গের দু'টি বর্গ।

৮

মৌলবাদী না হ'লেও হিন্দুধর্মের সুদীর্ঘ সাম্প্রদায়িক ইতিহাস আছে। তাকে কোন হিন্দুবাদ দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।

ঋক্বেদ প্রাচীনতম হিন্দুধর্মগ্রন্থ। অসাধারণ তার ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, এবং সাহিত্যিক গুরুত্ব। তাই, আর কোন প্রমাণ মনে না পড়লে, পূর্বকথীয়

পণ্ডিতগণ বলতেন, "ব্যাদে আছে।" অধুনা একজন বাঙালি সাধু বেদের 'সাম্যবাদ' প্রচার করছেন। তার ফলে কংগ্রেস-নেতা এবং কমিউনিস্ট-নেতা সমভাবেই তাঁর কৃপাপ্রার্থী।

অথচ, ঋগ্বেদে দেখি, বহিরাগত আর্য-দেবতা ইন্দ্র শত শত নগর ধ্বংস করছেন; স্ত্রী-হত্যা করছেন; এমন কী গর্ভিনী স্ত্রীলোককেও হত্যা করছেন। ঋগ্বেদ মতে যারা 'দাস', 'দস্যু' এবং 'পণি' অর্থাৎ বহিরাগত আর্যদের ভারতীয় প্রতিরোধক, তারাই পাপী। তাদের ধ্বংস করলেও ইন্দ্রের পাপ হয় না, বরঞ্চ মহিমা বৃদ্ধি পায়। একই রকমের আর্যতত্ত্ব শিরোধার্য করে জার্মানির নাৎসি-আর্যরা লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে নির্বিচারে হত্যা করে। আজ যাঁরা বাবরি মসজিদ নির্মাণ, মুসলমানদের চারবার বিবাহ করে বংশ বৃদ্ধি করা, রামশীলা স্থাপন প্রভৃতি অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে ইসলাম-বিরোধী জিগির তুলেছেন, তাঁরা কী একবারও ভাবেন, বহিরাগত আর্যদের দুর্দান্ত নেতা ইন্দ্র কত শত ভারতীয় উপনিবেশ, গ্রাম, নগর ধ্বংস করেছিলেন, কী ভাবে গণহত্যা চালিয়েছিলেন? ইন্দ্র, 'যুবা, মেধাবী, প্রভূত বলসম্পন্ন'; তাঁর 'উদর সোমরস পানে সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত', 'বৃত্রের মাতা তির্যক্ ভাবে রহিল; ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করিলেন'; 'যিনি কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্যাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই হৃষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্রের সহিত স্তুতি অর্পণ কর'।[২৩] এ সব বিবরণ থেকে যদি আমরা ঐতিহাসিক ব্যাশাম্-এর কথার প্রতিধ্বনি করে 'barbaric culture of the Aryans, with a disorderly pantheon of Celestial deities' বলে ঋক্ বৈদিক কৃষ্টির অর্থ নির্ণয় করি, তবে বোধ হয় অপরাধ হয় না।[২৪]

একটা সময় এল, যখন নরহিংসামূলক এবং প্রাণীহিংসামূলক বৈদিক যাগযজ্ঞ আর তেমন প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হল না। তখন উদ্ভাবিত হ'ল ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদ; কর্মকাণ্ড সমালোচিত হ'ল। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডকে পটভূমিকায় অন্তরালে রেখে ব্রহ্মকে সামনে নিয়ে আসা হ'ল। 'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ'-এ বলা হ'ল:[২৫]

> দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ
> স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।

অর্থাৎ, ব্রহ্মের দুই রূপ: মূর্ত ও অমূর্ত; মর ও অমর; পরিচ্ছিন্ন ও

অপরিচ্ছন্ন ; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। এই ব্রহ্মকে জানাই পরম জ্ঞান 'ছান্দোগ্য উপনিষৎ'-এ তত্ত্ব উচ্চারিত হ'ল।

ব্রহ্মের স্বরূপ জানাই হিন্দুধর্মের উচ্চতম দর্শনরূপে সম্মানিত বেদান্তের বিষয় বস্তু। এই ব্রহ্মণ্ সর্বভূতান্তরাত্মা। তিনি দেব-দেবীতে আছেন, মানুষ পশু-কীট-পতঙ্গে আছেন, দুর্লক্ষ্য 'ভাইরাস'-এ আছেন, পাথরেও আছেন। সর্ব-সমন্বয়ের এমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তত্ত্ব আর কোন ধর্মমতে স্পষ্ট নয়। শোনা যায়, এই তত্ত্বের প্রভাবেই বিরাট বৈয়াকরণিক পাণিনি একটি মাত্র সূত্রে যারা কুকুরকে, যুবককে এবং ইন্দ্রকে বুঝিয়েছিলেন :

অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে / শ্বানম্ যুবানম্ মঘবানমাহ।

হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ প্রথম থেকেই বৈদান্তিক মতবাদের অসাধারণ গুরুত্ব, তাৎপর্য, এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মের সমতা চিত্তাকর্ষক ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। এই ভাষা 'দিস্তরশঃ অপাণিনীয়, ও অপ্রচলিত (archaic), এবং ভাবাভঙ্গিও অত্যন্ত প্রাচীন'।[২৬] প্রাচীনত্বের প্রতি হিন্দুরা মমতা বোধ করেন জেনে, এ রকম প্রাচীন ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন :

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।[২৭]

হে জিতনিদ্র অর্জুন! আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান।

কৃষ্ণ যদি ব্রহ্ম হন, তবে শিবও তাই, এবং দুর্গাও তাই। বেদান্তের শৈব এবং বৈষ্ণব একাধিক ভাষ্য রচিত হয়েছিল। জীবনাচরণের ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তার অভাব, আর্থিক নিরাপত্তা এবং শান্তি না থাকলে, 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা', এই দুটি মাত্র কথার ব্যাখ্যায় যে পরিমাণে তাত্ত্বের লতাপাতা জমানো হয়েছে, তা সম্ভাব্য হ'ত না। আবার এটাও দেখা গেল যে, বেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাতাগণ কোন না কোন ভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরু। তাঁদের বেদান্তভাষ্য হিন্দুত্বের বৃহৎ ঐতিহ্যকে অবিশ্বাস্যভাবে পরিপূর্ণ করে তুলল। প্রসঙ্গতঃ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর একটি মন্তব্য যথেষ্ট অর্থবহ ; তিনি লিখেছেন :[২৮]

মুসলমান-শাসন সময়েও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ফলে দার্শনিক মতবাদ বিস্তার লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বলেন মুসলমান সময়ে শৃঙ্খলা ছিল

না, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। মুসলমান শাসন সময়েই মধুসূদন সরস্বতী, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতি মহামনীষা-সম্পন্ন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র দার্শনিকের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু যদি শুধু একথাই বলা হ'ত যে ব্রহ্ম নিরাকার, অরূপ [ বাইবেলে এবং কোরাণে ঈশ্বর নিরাকার ], তবে সম্ভবতঃ হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা যেত। কিন্তু, তা বলাই সম্ভব হ'ল না। বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য—হিন্দু পঞ্চোপাসনার এই পাঁচ দেবতা—এবং মূর্ত দেবতা—ব্রহ্মার সমান হয়ে উঠলেন। প্রকৃত বেদান্তবাদীগণ বলেন, এটা প্রতীকের উপাসনা মাত্র; বিবেকানন্দের ভাষায়,

> প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। …সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।[২৯]

কিন্তু, এই ধরণের 'শাঙ্কর ভাষ্য' সর্বগ্রাহ্য হয়নি; এমন কী মনুষ্যদেহধারী গুরুকেও 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়নি।

বৌদ্ধ এবং জৈন-ক্ষপণকগণ এসব বাগ্‌বিতণ্ডায় দেখে হিন্দুদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে কী মার খেয়েছিল, তা কৃষ্ণমিশ্র যতি-প্রণীত পূর্বে উল্লিখিত বিবরণে দেখা যায়। সেই নাটকেই এক স্থানে দেখি,—সুন্দরী কাপালিকাকে সঙ্গে নিয়ে এক কাপালিক এসেছে; তাঁকে দেখে উলঙ্গ এক ক্ষপণক মস্করা শুরু করেছে। তখন সেই মায়াময় কাপালিক,

খড়্গমাকৃষ্য,

> এতৎ করাল করবাল নিকৃত্ত কণ্ঠ
> নালোচ্ছল বহল ফেনিলবুদ্বুদৌ ঘৈঃ।
> সার্ধং ডমড্ডমরুভাং কৃতিহূতভূত
> বর্গেন ভর্গগৃহিনীং রুধি রৈর্ধি নোমি॥[৩০]

খড়্গ তুলে বলছে: এই শাণিত তরবারি দিয়ে তোর কণ্ঠনালী কেটে ফেলে, সেখান থেকে বার হওয়া বুদ্বুদ ফেনযুক্ত রক্তপ্রবাহের দ্বারা, ডমরুর ডাকক্তিতে আহূত ভূতগণের সঙ্গে আগতা, ভর্গগৃহিনী মহাভৈরবীকে সন্তুষ্ট করব।

'দিব্যাবদান' গ্রন্থে পুষ্যমিত্র শুঙ্গকে একজন বৌদ্ধ-পীড়ক বলা হয়েছে। গৌড়দেশের রাজা, শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্ক বোধগয়ার বোধিদ্রুম পর্যন্ত কেটে

ফেললেন। বৌদ্ধ সম্রাট, বৈশ্য-জাতীয় হর্ষবর্ধন, একটি বৌদ্ধ স্তম্ভকে ধ্বংস করার অভিযোগে, বহু ব্রাহ্মণকে হয় কারারুদ্ধ করলেন, নয় তো একেবারেই খতম করলেন। স্থানীয় প্রভাবশালী শৈবদের, এবং গান্ধার দেশের ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায়, কাশ্মীরের হূণ-শাসক মিহিরগুল সেখানকার বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলিকে ধ্বংস করেন। দক্ষিণ ভারতে না কী আট হাজার জৈনকে শূলদণ্ড দেওয়া হয়। বৌদ্ধ-দর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার সূত্রপাত করেন চারটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কিছু গোঁড়া হিন্দু তাঁকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে বিদ্রূপ করেন। বৈষ্ণবরা মথুরা-অঞ্চলে জৈন মূর্তি ভেঙে তাতে বৈষ্ণব মূর্তি উৎকীর্ণ করে। এই সাম্প্রদায়িকতা অষ্টাদশ শতকেও প্রবল ছিল। 'কোশলপুর' নামক স্থানে ধর্মস্থানগুলোর অধিকার এবং তীর্থ-যাত্রীদের প্রণামী ও দানের বখ্রা নিয়ে বৈষ্ণবদের সঙ্গে সশস্ত্র শৈবদের দাঙ্গা হয় আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে। এই দাঙ্গাতে বৈরাগী-বৈষ্ণবরা প্রচণ্ড মার খায়।[৩১]

৯

পূর্বেই বলেছি, হিন্দু চতুর্বর্গচিন্তাবলির একটি সংগঠক-উপাদান কাম, অথবা Libido। কাম অন্য সব বিখ্যাত ধর্মেও অল্প-বিস্তর আছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের অনেক স্তরে কাম যুগযুগান্ত ধরে যে কী অপ্রতিহত প্রভাব প্রতি-পত্তি বিস্তার করেছে, তা একটি সুবৃহৎ নিবন্ধেই পূর্ণভাবে প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এখানে বিষয়টি সম্পর্কে সামান্যভাবে দু'চারটি তথ্য দেওয়া যায়।

কাম বেদেও আছে। ঋগ্বেদে যৌন প্রস্তাবনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু, যজুর্বেদে বাজসনেয়ি সংহিতার ২৩ অধ্যায়ে, ২১ থেকে ২৯ কণ্ডিকাতে যা বলা হয়েছে, তা ছাপার অযোগ্য। যাঁরা বৈদিক কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বড় গলায় ফলাও করেন, তাঁদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবলমাত্র ২১ কণ্ডিকা, এবং মহীধর-কৃত সেই কণ্ডিকার ভাষ্য উদ্ধৃত করি :

উৎসক্থ্যা অবগুদং বৈ হি সমাঞ্জ চরয়া বৃষণ্‌
যঃ স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ।

হে বৃষণ্‌। সেক্তঃ অশ্ব, মহিষ্যা গুদমেব গুদোপরি রেতো বৈহি বীর্যং ধারয়। কীদৃশ্যাঃ উৎসক্থ্যাঃ উৎ ঊর্ধ্বে সক্থিনী ঊরু যস্যাঃ সা। উৎসক্থী তস্যাঃ। কথং তদাহ। অঞ্জিং লিঙ্গং সমারয়। ...যোঞ্জি : স্ত্রীণাং জীবভোজন :

জীবয়তি জীবঃ তোজয়তি তোজনঃ জীবশ্চাসৌ তোজনশ্চ জীবতোজনঃ।
যস্মিন লিঙ্গে যোনৌ প্রবিষ্টে স্ত্রীয়ো জীবতি তোগাশ্চ লভন্তে তং প্রবেশয়।

এটি অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি অনুষ্ঠান। এটা অবশ্যই বলা উচিত যে, বহুবিধ বৈদিক ক্রিয়াকর্মেই যৌনতা নেই; থাকলেও তা অবদমিত। কিন্তু, যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানেই যৌনতার প্রবল সংক্রাম ঘটে, তখন ক্রমশঃ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসেও যে তার সংক্রাম ঘটবে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়। কামের ভাববাদী তত্ত্ব আছে; আবার বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামসূত্র'-ও আছে। হিন্দু শক্তোপাসনার ঐতিহ্যেও কামভাবনা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মহাপুরাণে এবং উপপুরাণে যৌন-কাহিনী হামেশাই দেখা যায়। পতঞ্জলি বললেন যে, চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধই প্রকৃষ্ট যোগ। কিন্তু, তাঁর কথা কে শোনে। শেষ পর্যন্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধমূলক যোগতন্ত্র হঠযোগে রূপান্তরিত হ'ল। বিস্পষ্টনীললৌললোচনা কাপালিনীর সঙ্গে নির্বিচারে কীরূপ অশ্লীল ধর্মাচরণ করা হ'ত, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন পূর্বে উক্ত কৃষ্ণ মিশ্র যতি। হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যে সদাচারবিরুদ্ধ অনেক তত্ত্ব আছে, অনেক অসভ্যতার বিবরণ আছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধরা খোলাখুলি ভাবেই 'antinomian', অথবা ধর্মীয় সামাজিক সদাচারের বিরোধী হয়ে পড়েন। 'হেবজ্রতন্ত্র' নামক গ্রন্থে স্বয়ং 'ভগবান' [ অর্থাৎ হেবজ্র ] বলছেন : [৩২]

> তুমি প্রাণী হত্যা করবে। মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি, তাও তুমি নেবে। পরস্ত্রীকে সেবন করবে। স্নান, শৌচ করবে না। মন্ত্র জপ করবে না। ধ্যান করবে না। বন্ধুদের ভালবাসবে না। কাষ্ঠপাষাণনির্মিত দেবপূজনের দরকার নেই।

এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ antinomianism মারাত্মক হয়ে পড়ল। চারদিকে আগুন জ্বলছে। কোথাও বা ভয়ঙ্কর বক্ত প্রাণী মানুষের মাংস খাচ্ছে। পিশাচ-পিশাচী ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে পাহারা দিচ্ছে। মাঝখানে ভীষণদর্শন হেবজ্র উলঙ্গিনী নৈরাত্মার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অথবা বসে যৌন-সঙ্গমে ব্যাপৃত। তাঁদের চোখে মুখে অবর্ণনীয় লালসা দেখা যায়। এই হ'ল তিব্বতীয় বজ্রযানী বৌদ্ধ ছবি, যার একটি সংকলন গিউসেপ্ তুচ্চির Tibetan Painted Scrolls এর তিনটি বিশাল খণ্ডে দেখা যেতে পারে।

হিন্দু বামাচারে antinomianism-এর বাহ্যিক প্রকাশ প্রায়শঃ দেখা

যায় না। খাজুরাহো কিংবা কোনারকের মন্দিরগুলোতে যৌনতা প্রকাশিত, তাতে মানবপূজনতত্ত্ব নেই। কিন্তু তাতে প্রশ্নাতীত ভোগবাদ অভিব্যক্তি। একদিকে ইসলামের সমর্থকগণ অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে। অন্যদিকে হিন্দু রাজারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আর মৈথুনশিল্পে মন্দিরগুলোকে ভরিয়ে দিচ্ছেন। আদিরসাত্মক সংস্কৃত কাব্য লেখা হচ্ছে, এবং দেবদেবীদের নৈশ-জীবনের বর্ণনামূলক সুভাষিত কবিতা রচিত হচ্ছে। এই অবক্ষয় ধর্ম থেকেই এল, এবং এই অবক্ষয়ের জন্যই "হিন্দু"-ভারতে ইসলামের রাজনৈতিক অধিকার সহজে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মৈথুন শিল্প সম্পর্কে 'বামপন্থী' বলে পরিচিত মুল্কুরাজ আনন্দ আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে কতই না উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই শিল্পে যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের অভাব সূচিত হয়েছিল,—ঐতিহাসিক পানিক্কার-এর এই মূল্যায়ন না মেনে উপায় থাকে না।[৩৩]

১০

ধর্মের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উপযোজন হয়েছে, কিন্তু তা ব্রাহ্মণদের এবং জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য কখনই সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়নি। ব্রাহ্মণত্ব এবং শূদ্রত্ব বলতে যে কী বোঝায়, তা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আমি নিজে ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরূপে, শূদ্র শিষ্যের গৃহে, নয় দশ বৎসর বয়সে, উপনয়ন হওয়ার পূর্বেই, পিতামহতুল্য, শিক্ষিত এবং ধনী শূদ্র শিষ্য দ্বারা যে ভাবে সম্পূজিত হয়েছি ; যে ভাবে সেই শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধ শূদ্র আমার মতো শিশুর পাদোদক খেলেন ; যে ভাবে সেই সম্পন্ন শূদ্র-গৃহের লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো মাতৃসমা গৃহিনী নিজের হাতে আমার পা ধুইয়ে, নিজেরই সুদীর্ঘ, ঘন কেশ দ্বারা তা মুছিয়ে দিলেন ; যে ভাবে তিনি আমার কাছ থেকে একটু দূরে বসে, আমাকে দিয়ে নিরামিষ রান্না করিয়ে, হাত পাখার বাতাস করতে করতে আমাকে খাওয়ালেন ; যে ভাবে সম্পন্ন গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও, বাড়ির কর্তা আমার মতো নাবালকের কাছে দীনহীন কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তা আগুনের আখরে আমার হৃদয়ে লেখা আছে। এই অসাধারণ, কল্পনাতীত শ্রদ্ধার, সভ্যতার, ভদ্রতার কী প্রতিদান আমি দিতে পেরেছি ? কী প্রতিদান দেওয়া সম্ভব ছিল আমার পক্ষে ? তথাকথিত শূদ্রদের ঋণ—যা যুগযুগান্ত ধরে কেবলই জমেছে—ব্রাহ্মণরা কী কোন কালেও শোধ করতে পারবেন ?

পরে দেখলাম, স্মৃতিতে এবং পুরাণে কলঙ্ক-লিপ্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে—যারা চাষ করে; যারা কুটির শিল্পে নিযুক্ত; যাঁরা কামার, কুমার, তেলি, শুঁড়ি, চর্মকার, চণ্ডাল; তারা হিন্দুদের মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশ—শূদ্র, অন্ত্যজ, ইংরেজি ভাষায় 'বাস্টার্ড', তাদের পঞ্চানন্দ ধরনের উপাস্য দেবতাও 'বাসটার্ড'। মনুর ভাষায়, রঘুনন্দনের ভাষায়, "দ্বিজ"দের "শুশ্রূষা" করাই তাদের প্রধান ধর্মীয় কৃত্য। অবশ্য বলতেই হয়,—আধুনিক 'হিন্দুবাদ' এসব অধম্ম তত্ত্ব মানে না। কিন্তু বালগঙ্গাধর টিলক তা মানতেন। বিহারের, উত্তর প্রদেশের, অন্ধ্র প্রদেশের, তামিলনাড়ুর, কর্ণাটকের, মধ্যপ্রদেশের উচ্চ-বর্ণের জমিদারগণ তা মানে, 'বাসটার্ড'দের ঘরবাড়ি অগ্নিদগ্ধ করে, তাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করে, তাদের গুলি করে মারে।

যাঁরা আজ বাবরি মসজিদে রামজন্মস্থান দেখছেন; নাগাল্যাণ্ডে, মিজোরামে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, দ্রাবিড়ে অন্ত্যজদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তোলপাড় করছেন, রাম রথে পদ্মফুল নিয়ে অশ্বমেধের অশ্বের মতো ভারতভ্রমণ করছেন; মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করতে চাইছেন, এবং তাতে শ্রীকৃষ্ণকেই রথের সারথী করতে চাইছেন, সেই সব 'ধর্মধ্বজিন্'-দের মধ্যে ক'জন দিনান্তে সেই অধ্যাত্মা, সর্বভূতান্তরাত্মা পরম ব্রহ্মণ্-এর কথা ভাবেন? তাঁরা কী একবারও ভাবেন যে, যখন সোমনাথের মন্দির লুন্ঠিত হচ্ছিল, বাবরি মসজিদ নির্মিত হচ্ছিল, তখনও প্রচলিত স্মৃতির বিধানে হিন্দুধর্মে এবং সমাজে চাষী, মজুর, তাঁতী, কামার, কুমার, তেলী, মুচি, শুঁড়ি, চণ্ডাল, "কীরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দ পুক্কশা" ছিল অন্ত্যজ, শঙ্কর, জারজ 'বাসটার্ড'? একদিকে ইসলামের মৌলবাদ, যা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত, বেগবান তুর্কি, আরব্য, ইরানীয়-অশ্ববাহিত; অন্যদিকে স্মার্ত, ব্রাহ্মণ্য ভেদবাদ, যা স্মৃতিশাস্ত্র-শোভিত। এই দুই দানবিকতার নিষ্পেষণে 'শূদ্র'-দের যে কী দুরবস্থা হয়েছিল, তা কী এখনকার রামসেবকগণ কল্পনাও করতে পারেন। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ কখনই ইসলামি মৌলবাদের 'অভিঘাতে' বিপন্ন শূদ্রদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেননি। তার কারণ কী এই যে, ব্রাহ্মণ্যতা এবং ইসলামি মৌলবাদ ভারতের শূদ্রদের বিরুদ্ধে গাঁঠছড়া বেঁধেছিল?

গুপ্ত-সাম্রাজ্যবাদের সময় থেকেই, বাঙালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু 'ব্রাহ্মণ' উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ

কেউ মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন। বাঙালি ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামের অতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, "বালবলভীভুজঙ্গ" ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি পর্যন্ত রচনা করা হয়েছিল। ভট্ট ভবদেব শুধু যে খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তাই নয়; তিনি ধনী ছিলেন, মন্দির বানিয়েছিলেন, দীঘি খনন করেছিলেন এবং জন-হিতকর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।— হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

ব্রাহ্মণদের অবস্থাটা হঠাৎ পালটে গেল বখ্তিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের পরে। মুসলমানরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধন করল না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে, কোন রকমে টিকে থাকা, হিন্দু রাজ্য মিথিলাতে, নব্যস্মৃতি উদ্ভাবিত হয়, তার ঐতিহ্য সমগ্র পূর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে, চৈতন্যের আবির্ভাবের সময়ে কিংবা তার কিছু পরে, রঘুনন্দন আঠাশটি স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করেন। নব্যস্মৃতিতে ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় এবং সামাজিক অধিকার রক্ষিত হল। শুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্ত অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব পেল।

যেহেতু বাঙালাদেশে 'আর্যীকরণ কখনোই আর্য সমাজ ব্যবস্থানুযায়ী হয় নাই, সেইজন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র লইয়া যে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজ, বাংলা দেশে তাহার প্রচলন নাই'।[৩৪] সম্ভবতঃ এ কারণেই রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মধ্যে আর কোন বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি? তাঁর মতে হিন্দু, হয় ব্রাহ্মণ, নয় তো দ্বিজশুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্র। শূদ্রদের ধর্মীয় অধিকার, স্ত্রীলোকদের ধর্মীয় অধিকারের মতোই নিতান্ত সীমাবদ্ধ। জার্মান সাহেব মোক্ষমূলর ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই 'ভট্ট' উপাধি লাভ করলেন, এবং প্রায় প্রাচীন ভট্ট ভবদেবের মতোই সম্মাননীয় হয়ে উঠলেন। অথচ, প্রযৌক্তিক অর্থে 'শূদ্র' রমেশচন্দ্র দত্ত যখন ঋক্‌বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলেন, তখন শশধর তর্কচূড়ামণি লিখেছিলেন যে শূদ্র-কৃত ঋক্‌বেদের অনুবাদ 'বেদের অচিন্তনীয় অবমাননা'।[৩৪ক]

আজ যাঁরা মুসলমানের চার বিয়ে নিয়ে নানান্ কথা বলছেন, তাঁরা কী জানেন যে, কুলীন-ব্রাহ্মণ শতাধিক বিবাহ করে সহস্রাধিক সন্তানের জন্ম দিতে পারত? আজ যাঁরা বলেন যে, জাতপাত নিয়ে গোলমাল করা প্রকৃত হিন্দুত্ব নয়, তাঁরাও কী সর্বাংশে দেশাচারমূলক ঐতিহ্যকে সর্বাংশে বর্জন করতে পারেন? স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত তাঁর কোন কোন শূদ্র-শিষ্যের গলায় পৈতা ঝুলিয়ে তাঁদের দ্বিজত্ব দেন। ব্রাহ্মণ্যতার এমনি মহিমা যে, বৈদান্তিক

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পর্যন্ত কয়েকগাছা সুতোকে হিন্দু সভ্যতার 'দুর্লক্ষ্য প্রতীক বলে' মনে করতেন। এই সেদিনও দেশাচারের নামে রাজস্থানে 'সতী'-পোড়ানো হয়েছে।

১১

ইসলামের অভিঘাতে, স্মৃতিশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডে যখন সমগ্র হিন্দুত্ব এবং হিন্দু সমাজব্যবস্থা নিতান্ত বিপন্ন, তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। অথচ, দাক্ষিণাত্যে শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। শৈব ভক্তরা স্থানীয় বৌদ্ধ এবং জৈনদের তাড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে, উত্তর ভারতে, বাঙালা দেশে, অসমে প্রচারিত বিবিধ 'সগুণ' 'নির্গুণ' ভক্তির তত্ত্বে একটি আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের ভাবাদর্শ ছিল; বলা হয়েছিল, ভক্ত চণ্ডাল অভক্ত দ্বিজ থেকে শ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ ভক্তির অভ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং স্বতন্ত্র 'ভাব' স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু দেখা যায়, ভক্তির প্রচারকগণের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বৈশ্য-জাতির নানক, এবং 'জোলা' মুসলমান কবীর যে ভাবে ভক্তির তাৎপর্য বিচার করেছিলেন, ব্রাহ্মণ একনাথ এবং চৈতন্য সে ভাবে তা করেননি। ঈশ্বরের রূপকল্পনা থেকেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়, একথা 'নির্গুণ'-বাদী সন্তগণ খুব ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন। কিন্তু অনেক ভক্ত চোখের সামনে মূর্তি না দেখলে অসুবিধা বোধ করেন। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত ভক্তির নামে মূর্তিপূজাকেই প্রাধান্য দিলেন।

'সগুণ' এবং 'নির্গুণ' মতবাদমূলক ভক্তির বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদান্তের উদার অদ্বৈত মতো ভক্তির তত্ত্ব সাংস্কৃতিক উপযোজনকে শক্তিশালী করে; আঞ্চলিক ভাষার ও সাহিত্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে; শূদ্রদের হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের মধ্যে আকর্ষণ করে; স্বাক্ষরতা এবং সমাজচেতনা বৃদ্ধি করে; এবং অবশ্যই মৌলবাদী ইসলামের অভিঘাতকে দুর্বল করে দেয়। ভারতে ইসলামের 'ধর্মযুদ্ধ' অথবা 'জিহাদ'-এর মানববিদ্বেষী তত্ত্ব ভক্তির আন্দোলনের জন্যই অভ্যাসে পরিণত হতে পারেনি; কিন্তু 'জিহাদ' মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে।

কিন্তু ভক্তি, যাবতীয় ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, এক ধরণের ভাববাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, এবং হয়তো ইতিবাচক অর্থেই কিছুটা অস্পষ্ট, সংমিশ্রিত গৌণবাদ। সর্বত্রই ক্রমশঃ ভক্তির ক্ষেত্রে আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ-বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। শোনা যায়, রামানন্দ কবীরের গুরু ছিলেন। সেই রামানন্দের নামে তৈরি করা রাজস্থানের নাথদ্বারে রামানন্দী মন্দিরে এবং মঠে অস্পৃশ্য-দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। উচ্চবর্ণের বাঙালি বৈষ্ণবরা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র তৈরি করলেন, তাতে বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্মের নামে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের গৌরবই বিঘোষিত হয়েছে। তিন খণ্ডে প্রকাশিত হিন্দুস্মৃতির গ্রন্থ 'ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি'তে বৈষ্ণবাচারের বিবরণ বিশিষ্ট হয়ে আছে।

অনেকে এ-পর্যন্ত এই রচনা পড়ে ভাবতে পারেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হয়েও, আমি সর্বত্র ব্রহ্মদৈত্যকেই দেখতে পাচ্ছি। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে ব্রাহ্মণদের অবদানকে অস্বীকার করার, ছোট করে দেখার সাধ্য আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির থাকাই সম্ভব নয়। তা করা হ'লে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্যতায় বিধৃত যে অমূল্য সদাচারের, সভ্যতার এবং উদারতার আদর্শ আছে, তাও আমার বিচারে শ্রদ্ধেয়, কারণ সদাচার, সংযম, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অথচ, ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্ররূপে এটাও বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চ সংস্কৃতি নিম্নস্তরের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত, আপ্লুত, আচ্ছন্ন করে। অতএব ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংক্রাম, সঞ্চার, প্রভাববিস্তার দুর্নিবার ছিল। এটা কোন দুঃখের কারণ নয়। ভক্তির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যতার প্রভাবের বহু ইতিবাচক ফলও বিবেচ্য। কিন্তু, ভক্তির তত্ত্ব অনুসারে ব্রাহ্মণ যদি 'গুরু' হন, তা হ'লে যে তার কী পরিণাম হয়, তা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি বিবরণে পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অবশ্য, শুধু ব্রাহ্মণ গুরু কেন, যে কোন জাতির গুরুই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সমান হয়ে উঠলেন। গুরুর বাক্যই গুরু হয়ে উঠল। এই গুরুর নির্দেশ অযৌক্তিক এবং কখন কখন অসভ্য হলেও শিরোধার্য হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ যখন অনিশ্চিত, সমস্যাই যখন প্রবল, প্রশ্ন যখন উত্তরহীন, মৃত্যুই যখন ধ্রুব, তখন গুরুর বাক্যই গুরু; বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স বেবর্-এর স্মরণীয় ভাষায়, এই গুরুবাদমূলক উদ্ধারতত্ত্বে গুরু একজন 'ডিমাগোগ্', অথবা শিষ্যদের 'নেতা'। গুরুবাক্য মেনে নিতে হলে বিচার-

যুক্তিকে, rationalism-কে ধামাচাপা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। গুরুবাদ সম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করল।

১২

হিন্দুধর্মে সাংস্কৃতিক উপযোজনমূলক সমন্বয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্য। এই পাঁচজন উপাস্য দেবতা হলেন বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য এবং গণেশ। শঙ্করাচার্য-বিরচিত স্তবাবলীতে এ-ধরণের সমন্বয়মূলক চিন্তাধারা স্পষ্ট। কোন কোন উপপুরাণেও তা দেখা যায়। কিন্তু পঞ্চোপাসনা অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনাকে বাধা দেয়নি। লৌকিক দেবদেবীগণের মধ্যে মাতৃদেবতাদের প্রাধান্য বিশেষ অর্থবহ। অসংখ্য গ্রামদেবতা আছেন। এঁরাই হিন্দুদের তথাকথিত 'তেত্রিশ কোটি' দেবদেবী। বিনয়কুমার সরকারের অবচেতনে স্থিত 'আর্যত্ব' এই অবস্থাকে সহজে মেনে নিতে পারল না। তিনি এই দেবদেবীর উদ্ভাবনাকে বললেন Pariahnisation of the Aryans।[৩৫]

লক্ষণীয়, যখনই এসব দেবদেবীদের মধ্যে কেউ কেউ শাক্তর বর্ণহিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন, তখনই তিনি কিছুটা প্রাধান্য অথবা স্বীকৃতি পেয়েছেন, এবং তখনই তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বিশিষ্ট "কাল্ট্" গড়ে উঠেছে, এবং কোথাও কোথাও 'কাল্ট্'-কে কেন্দ্র করেই উপনিবেশ এবং সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ অবস্থা বাঙালা দেশে বিশেষ ভাবেই দেখা যায়। এক একটি 'কাল্ট্'-কে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য-সমূহ রচিত হয়েছে বাঙালা দেশে; রাম-'কাল্ট্'-এর একটি বিখ্যাত হিন্দী মঙ্গলকাব্য ভক্ত তুলসীদাস বিরচিত 'রামচরিত-মানস'। বাঙালা দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট রচয়িতাগণ ব্রাহ্মণ। যেখানে 'কাল্ট্', সেখানেই উপাস্য / উপাস্যা দেবদেবীর প্রশ্নাতীত মাহাত্ম্য, এবং সেখানেই পৌরোহিত্যমূলক সাম্প্রদায়িকতা দ্রষ্টব্য। কোন বিশেষ দেবতা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হ'লে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়, তার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন প্রতিভাশালী কবি ভারতচন্দ্র।

দ্বিতীয় 'পাতশাহ' [বাদশাহ্] দেবতার নিন্দা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন; 'বিশেষে বামন জাতি বড় দাগাদার'। বলেছিলেন:

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই
সুন্নত দেওয়াই আর-কলমা পড়াই।[৩৬]

তিনি আরও বলেছিলেন :

অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কঁহা ভূত
নহি তুরে করলা দো টুক।
না হোয় সুরত যে কে কলমা পড়াঁও লেকে
জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক।[৩৭]

হিন্দুদের এই মারাত্মক বিপদ দেখে ক্রুদ্ধা চণ্ডী খাস দিল্লীতেই ভূতের উপদ্রব শুরু করলেন :[৩৮]

ডাকিনী যোগিনী শখিনী পেত্নিনী গুহ্যক দানব দানা
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস সমরে দিলেক হানা।
টাকরে চাপড়ে কাঁচড়ে কামড়ে মারিছে যবন সেনা।
রক্তের পাথারে ভৈরব সাঁতারে গগনে উঠিছে ফেনা।

১৩

এই আলোচনা আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন অনুভব করি না। হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকায় ভালমন্দ দু'টি দিক এই প্রবন্ধে সামান্যভাবে আলোচনা করেছি। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের বস্তুবাদী দার্শনিকগণ সাধারণ ভাবে ধর্মের, এবং বিশেষভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের, খুব নিন্দা করেন। কিন্তু, মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা কখনই উপেক্ষনীয় নয়। ভারতীয় সভ্যতার বহু রকমের উপাদান হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। হিন্দু ধর্মকে অগ্রাহ্য করলে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার অর্থ এবং প্রকৃতি ভাল করে বোঝা যাবে না। ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলামের অবদানও অনস্বীকার্য।

কিন্তু, এ কথাও বোঝা দরকার যে, ধর্মবিশ্বাসের বাস্তবতা, এবং রাজনৈতিক সামাজিক বাস্তবতা এক হয় না। তাদের এক করবার জন্য অনেকে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, এই দুই বাস্তবতার দ্বৈততা কখনও দ্রবীভূত হয়ে একটি অদ্বৈত সত্তার উৎপত্তি হয় নি। মৌলবাদী ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও "খ্রিষ্টানী" প্রযুক্তির এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উপরে নির্ভরশীল।

এ কথাও বোঝা দরকার যে, ঠিক এখনই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু-জাগরণের 'বিশ্বাস', হিন্দুবাদ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হচ্ছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হঠাৎ এমন কী ঘটনা ঘটল যে এখনি বাবরি মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণ করতেই হবে? হিন্দু ধর্মের এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ এমন কী সঙ্কট দেখা দিল, যার নিরসনের জন্য এটা করা জরুরি? সে

রকমের কোন মারাত্মক সংকট যদি থাকে, তবে তার বাহ্যিক লক্ষণ গুলো কী ? ভারতীয় জনতা দলের, অথবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কথাই কী হিন্দুমাত্রই মেনে নিতে বাধ্য ?

এই নিবন্ধ বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক Fernand Brandel-এর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি :[৩১]

> When Hinduism stood up against Islam in the eighteenth Century, it opend up a vacuum into which the British conquest could misinuate itself……But religion alone cannot stand for a whole culture. which also represents thought, way of life in every sense of the term, literature, art, ideology, intellectual developments : a culture is made up of a multitude of goods, both material and spiritual……And indeed no recognizable cultural boundary exists which is not living evidence of a multitude of processes,

## সূত্রনির্দেশ ।

১. Sister Nivedita, the **Master as I saw Him** [Calcutta, 1966 ], p. 204 ; Tapan Raychaudhuri, **Europe Reconsidered : perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal** [ Delhi, 1988 ], p 338

২. James Hastings, ed. **Encyclopaedia of Religion And Ethics**, Vol. IV ( Edinburgh, 1981 ), pp. 686-714.

৩ তদেব, p. 689.

৩ক. দ্রষ্টব্য ; Haraprasad Sastri, **Discovery of Living Buddhism in Bengal** [ Calcutta, 1897 ] ; Benoy Kumar Sarkar, **Folk Element In Hindu Culture** [ London, 1917 ]

৩

৩খ. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'রামেশ্বর রচনাবলী', (কলিকাতা, ১৩৭১) পৃ. ৩২৪

৪. স্বামী অদ্বৈতানন্দ, 'হিন্দু ধর্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য', [কলিকাতা, ১৩৯২], পৃ. ২৪

৫. S. Radhakrishnan, The Hindu View of Life [London. 1965], p. 12

৬. গুরুনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত, 'অমরকোষ বা অমরার্থচন্দ্রিকা', [কলিকাতা, ১৯৮৮]; পৃ. ৬২, ৩৬৫, ৮০, ২২৫, ২৬৩, ১৫, ৩০, ৩৩৯, ৬৩

৭. রাধাকান্ত দেব, 'শব্দকল্পদ্রুমঃ', [দিল্লী, ১৯৮৮], দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩-৩৮৫

৮. নিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, 'মহন্ত পূজাপদ্ধতি', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯. Webster's Seventh New Collegiate Dictionary [Calcutta, 1969], p. 338

১০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৫

১১. আদিত্য ওহদেদার, 'রবীন্দ্র বিদূষণ ইতিবৃত্ত' [কলিকাতা, ১৯৮৬], পৃ. ৯০

১২. দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, 'শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ-প্রবন্ধ' [কলিকাতা, ১৩২৯], ২, পৃ. ১৮

১৩. কৃষ্ণ মিশ্র যতি, 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ম্', অনিলচন্দ্র বসু সম্পাদিত [কলিকাতা, ১৯৭৯] পৃ. ১৪৬

১৪. তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৮

১৫. 'ভাগবতপুরাণ', স্কন্ধ ১০, ৩৩ অধ্যায়, শ্লোক ১৭

১৬. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এবং স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত-অনূদিত, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', (কলিকাতা ১৩৬৪), ১৮ অধ্যায়, শ্লোক ৬৬, পৃ. ৩৯৯

১৭. তদেব চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক-১৩, পৃ. ১০৭

১৮. Romila Thapar, "Imagined Religious communities? Ancient History and the Modern Search for a

Hindu Identity', Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, p, 32

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্রষ্টব্য : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ',

২০. Damodar Dharmananda Kosambi, **An Introduction to the Study of Indian History** [ Bombay, 1975 ], p. 20

২১. 'হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮–২১

২১ক. M. E. Opler, 'The place of Religion in a North Indian Village', **South eastern** Journal **of Anthropology**, 1959, vol. 15, No. 3, pp. 219-26 ; দ্রষ্টব্য, 'The Great Tradition of Hinduism in the City of Madras', in **Anthropology of Folk Religion**, ed. C. Leslie [ New York, 1960 ] ; Max Weber, **The Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism**, Translated by Hans H. Gerth and Don Martindale, The Free-Press of Glencoe, Illinois ( 1960 ) ; V. Elwin, **Myths of Middle India**, Oxford University Press ( 1940 ), introduction ; দ্রষ্টব্য, Ramakanta Chakraborty, "Problems and Perspectives of a Marxist Critique of Hinduism", Society ann change, July-September, 1983

২২. দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেন, 'রামকথার প্রাক্‌-ইতিহাস' [ কলিকাতা, ১৯৯০ ] পৃ. ২

২৩. 'ঋগ্বেদ-সংহিতা', বঙ্গানুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত [ কলিকাতা ], ১৯৬৩ ], পৃ. ৪, ১।৮।৭ ; পৃ. ১৮, ৩২।৯ ; পৃ. ৬৯, ১০১।১

২৪. A. L. Basham, **History and Doctrines of the Ajivikas** ( Delhi, 1981 ), p. 4

২৫. স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, 'উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, [ কলিকাতা ১৩৮২ ), পৃ. ১৫৫, ২।৩।১

২৬. 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ২৩

২৭. তদেব, পৃ, ২২৯, শ্লোক : ২০
২৮. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' [ কলিকাতা, ১৩১২ ] পৃ. ৬৯
২৯. স্বামী বিবেকানন্দ, 'ভক্তিযোগ', [ কলিকাতা, ১৩৮১ ], পৃ. ৪২
৩০. 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্', প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৬
৩১. এসব তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, রামশরণ শর্মা, 'সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা' [ কলিকাতা, ১৯৯০ ]
৩২. The Hevajra Tantra : A Critical Study, ed. D. L. Shellgrove [ London, 1959 ), in two volumes. vol II. p 56

প্রাণিনশ্চ ত্বয়া ঘাত্যা বক্তব্যং চ মৃষাবচঃ ।
অদত্তান্ চ ত্বয়া গ্রাহ্যম্ সেবনম্ পরযোষিতঃ ॥ ইত্যাদি

৩৩. M. R. Anand, Kamakala [ Geneva, 1958 ] ; W. D, O'Flaherty, Sexual Metaphor and Animal Symbols in Indian Mythology [Delhi, 1981] ; K. M. Panikkar, A Survey of Indian History [ Calcutta, 1954 ], 1946 ; C. V, Vaidya, Downfall of Hindu India [ Delhi, reprint, 1986 ], pp 400-403
৩৪. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব', সংক্ষেপিত সংস্করণ, [ কলিকাতা, ১৩৭৩ ], পৃ, ১৩৪
৩৪ক 'বঙ্গবাসী' [ পত্রিকা ] ভাদ্র ৭, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ
৩৫. দ্রষ্টব্য, বিনয়কুমার সরকার, [ পুস্তিকা ] 'বাংলায় দেশী-বিদেশী' : 'বঙ্গ-সংস্কৃতির লেনদেন' [ কলিকাতা, ১৯৪২ ]
৩৬ 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস [ কলিকাতা, ১৩৬৯ ], পৃ, ৩০৬
৩৭. তদেব, ৩১০
৩৮. তদেব, ৩১৩
৩৯. Fernand Brandel, Civilization And Capitalism : 15th 18th Century : The Perspective of the Work [ London, 1988 ], vol-3, pp. 65 66

# বুড়ি

চিত্ত ঘোষাল

নতুন নগর পত্তনের বিশেষ খানদানী এই অঞ্চলটায় আলাদা আলাদা মানুষেরা তাঁদের আলাদা আলাদা কৃতিত্ব, আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনাময় ব্যক্তিত্ব, আলাদা আলাদা আভিজাত্য নিয়ে আলাদা আলাদা বাড়িতে অত্যন্ত আলাদা আলাদা ভাবে বাস করেন। বেশির ভাগ বাড়ির সামনেই নেমপ্লেটে কৃতী গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর নাম কৃতিত্বসহ বিজ্ঞাপিত। যেটুকু মেলামেশা তা স্ট্যাটাসের সমতা মাথায় রেখেই।

স্ট্যাটাসে খাটো প্রতিবেশীদের সম্পর্কে অজ্ঞতা এখানকার আভিজাত্যের অন্যতম লক্ষণ। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় রিটায়ার্ড কর্নেল পি. কে. দত্ত। তাঁর পরিচিতি স্ট্যাটাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। কর্নেল দত্ত নামটাই চলে। কখনো কখনো পি. কে-টা যুক্ত হয়। কিন্তু পি. কে. যে কিসের আদ্যক্ষর তা কেউ জানে না। কর্নেল দত্ত-ও জানানো পছন্দ করেন না। নিজের পরিচয় দিতে তিনি বলেন—কর্নেল দত্ত, কর্নেল পি. কে. দত্ত। তাঁর চুলের কাট, গোঁফের ছাঁট, বাড়ির গড়ন, এবং সর্বোপরি তাঁর মেজাজ সবই 'মিলিটারি-সুলভ' শব্দটির অনুষঙ্গের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর মিলিটারি গ্রীন রঙের বাড়িটার নাম ব্যাটেল ফ্রন্ট। কোনো নবাগত যদি ব্যাটেল ফ্রন্ট বা কর্নেল দত্তকে খুঁজতে এসে প্রতিবেশীর অভিজাত অজ্ঞতার পরিচয় পায় এবং কর্নেল দত্ত যদি সে খবর পান তবে অবশ্যই সেই প্রতিবেশীকে তাঁর মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। বলা বাহুল্য, সেটা তেমন সুখকর নয়। বিশেষত কোনো মিতবাক অভিজাত ব্যক্তির পক্ষে।

শোনা যায়, রণক্ষেত্রে বীরদর্পে পদচারণা করেছেন কর্নেল দত্ত। এখানেও নানা ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। একদিন সকালে তিনি তাঁর বাইশ বছরের (সাধারণত কুকুরের আয়ু বারো-চোদ্দ বছর) প্রিয় অ্যালসেশিয়ান জর্জকে নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় একটি অজ্ঞাতকুলশীল নেড়ির বাচ্চা জর্জের পেছনের বাঁ পায়ে কামড়ে দেয়। অতিবৃদ্ধ জর্জের বাধা দেবার বা প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা নেই। তার হয়ে প্রতিশোধ নেন কর্নেল

দত্ত স্বয়ং। তৎক্ষণাৎ বাড়ি গিয়ে তিনি রিভলভার নিয়ে আসেন এবং নেড়ির বাচ্চাটিকে গুলি করে মারেন। শহরের অন্য এলাকা হলে হয়তো এ নিয়ে একটা হৈ চৈ বেধে যেত। কর্নেল দত্ত-র বাড়ি ঘেরাও হয়ে যেতে পারত, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হতে পারতেন, আরো যা যা হতে পারত তা নিয়ে হাজার অনুমান সম্ভব, তবে তার কোনোটাই যে কর্নেল দত্ত-র পক্ষে সম্মানজনক হতো না, তা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু এখানে শুধু বিত্তবান অভিজাত সজ্জনদের বাস বলেই বিরল কয়েকজন পথচারীর হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো আর আশপাশের জানলায় কয়েকটি কৌতূহলী মুখের আবির্ভাবই শুধু ঘটেছিল। ভদ্র অভিজাত এলাকায় বসবাসের নানান সুবিধার অন্যতম এটাই।

এহেন কর্নেল দত্ত-র মেজাজের পারদ কাল থেকে কেবলই চড়ছে। কারণ তাঁর বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে বুড়িকে কাল সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বুড়ির বয়স দশ-এগারো। হাসনাবাদের ওদিকের এক গরিব দিন-মজুরের আটটি কন্যাসন্তানের ষষ্ঠ বুড়ি। একবার ছোটখাট কিছু মেরামতির কাজের জন্য রাস্তা থেকে একজন ছুতোরকে ডেকে এনেছিলেন কর্নেল। কথায় কথায় কর্নেল-গিন্নি তাকে বলেছিলেন একটি কাজের মেয়ের জন্য। সে-ই এনে হাজির করেছিল একদিন বুড়ি আর বুড়ির বাবাকে।

কর্নেল-গিন্নি কর্নেলের একেবারে বিপরীত। কর্নেল যেমন শক্তিসামর্থ্যে প্রবল, গিন্নি তেমনি পলকা। কর্নেলের পদভারে মেদিনী কাঁপে, কর্নেল-গিন্নির পা মাটিতে পড়ছে কি পড়ছে না, বোঝা মুশকিল। কর্নেলের গলায় মেঘের গর্জন, গিন্নির গলায় হালকা হাওয়ার শব্দ। তিনি কথাই বলেন প্রায় ফিস-ফিস করে, তার ওপর আছে বারোমেসে হাঁপানি। বুড়ি নিখোঁজ হওয়ায় তিনি শয্যা নিয়েছেন।

কর্নেলের দুই মেয়ে তা-বড় তা-বড় দুই জামাইয়ের সংসার করছে। একজন হোনোলুলুতে, আরেকজন হেলসিঙ্কিতে। ছেলে বোস্টনে কম্প্যুটার এঞ্জিনীয়ার। এখানে দু'জনের সংসার। তাও ঠিকে লোকের ভরসায় চালাতে পারেন না গিন্নি। বুড়িকে তাই সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাইপাসের দু'ধারে গরিব মানুষের অভাব নেই। তাদের ঘরেও বুড়ির মতো মেয়ে অঢেল। কাজ পেলে তারাও করে। কিন্তু এত কাছে থেকে চব্বিশ ঘণ্টার লোক নেওয়ায় কর্নেলের সায় নেই। ছুতোনাতায় আসবে যাবে, এ তিনি পছন্দ করেন না।

দিনকাল ভালো না, কোন্‌টা যে কোন্‌ মতলবে বাড়িতে ঢুকবে তার ঠিক কি। বুড়িকে নিয়ে ওসব ঝামেলা নেই। বুড়ির বাপ তিন মাস পরে পরে এসে মেয়েকে দেখে যায়, অমনি তিন মাসের মাইনের টাকাও নিয়ে যায়। কর্নেল মাইনে দেন ভালো। মাসে দেড়শো টাকা। খাওয়াদাওয়া জামা কাপড় তো আছেই। অসুখ-বিসুখ হলেও কি আর অমনি ফেলে রাখেন? ডাক্তার হয়তো ডাকেন না, কিন্তু ওষুধের দোকানে জিজ্ঞেস করে বড়ি-টড়ি কিনে এনে দেন। তাতেই বেশ কাজ হয়। অর্থাৎ, বুড়ির কোনো অযত্ন-অবহেলা এখানে হয়নি। তবে মেয়েটা পালালো কেন?

যতই নিজেকে এই প্রশ্নটা করেন কর্নেল ততই উত্তপ্ত হয় তাঁর মেজাজ। অবশ্য তাঁর যা করণীয় সবই তিনি করেছেন। কাল সকালে মর্নিং-ওয়াক থেকে ফিরে এসে গিন্নির কাছে তিনি প্রথম শোনেন বুড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না। কর্নেল অনাবশ্যক লোক জড়ো করে গবেষণা করা পছন্দ করেন না। ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করার পরও যখন বুড়ি ফিরে এল তখন না তিনি টেলিফোনে প্রথমে লোকাল থানাকে জানালেন, তারপর লালবাজারে মিসিং পার্সন্‌স্‌ স্কোয়াডকে। দুই জায়গাতেই তিনি ঘটনার গুরুত্ব এবং তাঁর নিজের গুরুত্ব যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বিকেলে থানার ও. সি. জিপে করে এসে হাজির।

—স্যার, মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে আপনার সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। ও. সি-র নিবেদনে সম্ভ্রম।

ও. সি লোকটা কোথায় কিভাবে কথা বলতে হয় জানে দেখে খুশি হন কর্নেল।

—মেয়েটা সম্পর্কে যা জানেন…

কর্নেল বুড়ির এ বাড়িতে আসার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানান ও. সি-কে। ওর চেহারার একটা বর্ণনাও।

শুনে ও. সি. বলে —ওর দেশের ঠিকানা আপনার কাছে আছে কি?

—না। রাখা উচিত ছিল অবশ্য…

—না না স্যার, তাতে কি হয়েছে। আচ্ছা, মেয়েটার কোনো ছবি কি আছে আপনাদের কাছে?

—না, ও. সি-র বোকামি সস্নেহে মার্জনা করেন কর্নেল, ব্যাখ্যাও দেন, কাজের লোকের ছবি তোলার মতো… কি যেন শব্দটা… হ্যাঁ, আদিখ্যেতা,

ওসব আদিখ্যেতা আমরা পছন্দ করি না। কাজের লোকের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করা উচিত নয়। যার যেটা জায়গা সেখানেই তাকে রাখা ঠিক। কি বলেন?

—নিশ্চয়। আপনাদের ফ্যামিলি এ্যালবামে ওর ছবি থাকবে তা আমি বলিনি। মানে, অ্যাকসিডেন্টালি যদি···

—না, তেমন অ্যাক্সিডেন্টও আমার বাড়িতে ঘটে না।

—মুশকিল হলো, ও. সি. চিন্তিত, এদের চেহারা সাধারণত এত ননডিসক্রিপ্ট যে ছবি-টবি একটা না থাকলে খুঁজে বের করা শক্ত। আপনি অবশ্য চেহারার একটা বর্ণনা দিয়েছেন··যাই তা বাই, মেয়েটা কেন পালালো বলে মনে হয় আপনার।

—ক্যান্ট গেস, ধাপ করেন কর্নেল, এত আরামে ছিল···টু বি ফ্র্যাঙ্ক, আমার মিসেস আদরযত্নের এত বাড়াবাড়ি করতেন যে আমি মাঝে মাঝে বিরক্তই হতাম।

—তবু ওর মনে কোনো কষ্ট-টষ্ট···মানে সে রকম কি মনে হতো আপনার?

—ডু ইউ মিন টু সে আমরা ওকে কষ্ট দিতাম? কর্নেলের মুখ থমথমে।

—না না স্যার, চতুর ও. সি. ব্যাপারটা সামলে নেয়, আমি ভাবছিলাম ওর বাড়ির কথা। অনেক সময় বাচ্চারা এরকম করে, হয়তো বাড়ির জন্য মন কেমন করছে, পালালো। শিশু-মনস্তত্ত্ব একটা অদ্ভুত সাবজেক্ট।

—অ্যাবসার্ড। বাড়িতে খেতে পেত না। এখানে রীতিমতো হেভি ব্রেকফাস্ট. লাঞ্চ ডিনার ছাড়াও বিকেলে টিফিন। মাত্র এক বছর হলো এসেছে, এর মধ্যে তিন সেট নতুন ফ্রক আর প্যান্ট পেয়েছে। এরপরেও বাড়ির জন্য মন খারাপ করতে পারে?

—না, নিশ্চয়ই না।

ও. সি-র কপালে পরিকল্পিত ভাঁজ দেখা দেয়। এ সময় ভাঁজগুলো আনতে না পারলে তার মুখে হাসি দেখা দিতে পারত এবং তার ফল ভালো হতো না।

—হুঁ, ও. সি-র কপালের ভাঁজগুলো আরো গভীর হয়. আচ্ছা স্যার, কেউ ভাগিয়ে নেয়নি তো?

—ভাগিয়ে? অ্যাবসার্ড, তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বেঁকে যায় কর্নেলের. আমার

বাড়ি থেকে ভাগিয়ে নেবে আমার কাজের মেয়েকে! অ্যাবসার্ড।

—তবু যদি ···

—ইম্‌পসিবল। ওর বাইরে বেরুনোর পারমিশন ছিল না।. বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ ছিল। অ্যাণ্ড, অ্যাজ ইউ নো, মাই অর্ডারস আর মেন্ট টু বি ওবেড।

—তাহলে তো প্রবলেমটা একটু জটিল হয়ে গেল স্যার।

সহসা কর্নেলের আত্মবিশ্বাসের গভীর মার্চে সামান্য একটু চিড় দেখা দেয় এবং তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় ক্ষীণ সন্দেহ। বুড়ি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পেলেও বদরু ধোপার সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখা গেছে। বদরু সপ্তাহে একদিন আসে, ধোয়া কাপড়চোপড় দিয়ে ময়লা কাপড় নিয়ে যায়। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে বুড়ি কথা বলত। কর্নেল দেখেছেন। অবশ্য দেখেছেন অনেকটা দূর থেকেই, ওদের নিকটবর্তী হওয়া তাঁকে মানায় না। এবং দূরত্বের কারণে ওদের কথাবার্তার একটি বর্ণও কখনো তাঁর কর্ণগোচর হয়নি। কর্নেল ধারে কাছে আছেন জানলেও তাঁর কাজের লোকদের চলাফেরা কণ্ঠস্বর এমনিতেই আড়ষ্ট হয়ে যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোকই কুঁকড়ে যায়, যেমন এখন এই ডাগড়াই ও. সি. টা, আর কোথায় সামান্য একটা ধোপা আর পুচকে এক নোকরাণী। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা ওরা বলত কি? বললেও তার সঙ্গে বুড়ির নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্পর্ক কি সম্ভব? বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্নটাকে দেখতে থাকেন কর্নেল।

সমরাঙ্গনে কর্নেল। আক্রমণের নির্দেশ দেবার আগে মানচিত্রে দৃষ্টি স্থির। গোপনে রসিক ও. সি. কর্নেলের মুখে এই চিত্র দেখে এবং অপেক্ষায় থাকে। চিত্র পালটায়। নিপাট গাম্ভীর্যে অনিশ্চয়তার খাঁচড় পড়ে। একটু যেন টাল খায় ব্যক্তিত্ব। হঠাৎ হঠাৎ হানা দেয় বিরক্তি ও অস্বস্তির দু'একটা ভাঁজ। ও. সি-র মনে যুগপৎ খেলা করে রসবোধ ও পুলিসী সন্দেহ। এবং পুলিসী ভাষায় সে ভাবে—শালা খিটকেল কাউকে সন্দেহ করছে, কিন্তু সেটা বলা ঠিক হবে কি হবে না তা-ই নিয়ে দোটানায়। মেয়েটার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত ডজ্জাটা, কে জানে! এসব প্রশ্নও করা যাবে না। ব্যাটার ব্যাক-গ্রাউণ্ড বড্ড ভারি।

স্বভাববিরুদ্ধ ইতস্তত ভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত মুখ খোলেন কর্নেল—এক বদরু

ধোপা···বাইরের লোকের মধ্যে এক ওর সঙ্গেই বুড়ি দু'একটা কথা বলত।

—কি ধরনের কথাবার্তা ওদের মধ্যে হতো স্যার?

—তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সপ্তাহে একদিন, আই মিন বৃহস্পতিবার, বদরু আসে। বারান্দার ঐ কোণাটায় বসে। বুড়ি ওর কাছ থেকে ধোয়া জামাকাপড় নিয়ে ঘরে রেখে ময়লা কাপড়-জামা এনে ওকে দিত। বদরু সামান্য লেখাপড়া জানে। ও শুনে শুনে একটা খাতায় লিখে দিত। খাতাটা মিসেসের কাছে থাকে। এসবের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথা হতে আমি দেখেছি। আমার মনে হয় কাজের কথাই। অন্য কিছুও হতে পারে, আমি জানি না।

—বদরুকে একবার পেলে সুবিধা হতো। ও. সি. ভাবনার ভাণ করে।

—সে তো বৃহস্পতিবারের আগে হচ্ছে না, আজ সবে শনিবার।

—আজই হবে স্যার, আপনি ওর ঠিকানাটা দিন।

—ঠিকানা? কর্নেলকে বিব্রত দেখায়, ঠিকানা তো রাখিনি। আই মিন ঠিকানা বলতে যা বোঝায়, একটা রাস্তা, একটা নম্বর, এসব লোকের সাধারণত থাকে না।

—এরিয়াটা বলতে পারলেও আমরা ঠিক খুঁজে বের করব।

—বাইপাসের ওপাশটায় থাকে বলেছিল। এখানে অনেকেরই বাড়ির কাপড় কাচে, তাই বিশেষ খোঁজখবর করিনি।

একটু যেন ম্লান দেখায় কর্নেলকে। ও. সি-র মনে হয় কর্নেলের মিলিটারি কর্তব্যবোধ ও মেজাজ নিজের এই অসতর্কতাকে ক্ষমা করতে পারছে না।

—ঠিক আছে স্যার, এতেই হবে। বদরুকে আমরা দু'ঘণ্টার মধ্যে ধরে থানায় নিয়ে যাব। দেখা যাক কি বলে। আচ্ছা স্যার, নমস্কার।

—নমস্কার।

পুলিস সাধারণত সক্রিয় হতে ভালোবাসে না। কিন্তু হলে খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খুঁজে বের করার মতো দুঃসাধ্য ঘটনাও ঘটিয়ে ফেলতে পারে নিমেষে। আর এ তো বাইপাসের পাশের ঝোপড়ি থেকে বদরু ধোপার পাত্তা লাগানো। দু'ঘণ্টারও কম সময়ে ও. সি-র সামনে হাজির জোড়হস্ত বদরু ধোপা।

লোকটার আন্দাজ নেবার চেষ্টা করে হতাশ হয় ও. সি। রোদে-পোড়া

কালো ছোটখাট চেহারায় হাড় আর চামড়াই বেশি। মাংস যেটুকু আছে তা বেশ পাকানো। খাটে, খেটে খায়। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু মুখখানা নিয়েই ও সি-র সমস্যা। অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ, সে কারণেই এ মুখের অন্তরালে মন নামে যে বস্তুটি আছে তার মাপ নেয়া অত্যন্ত কঠিন। মুখ দেখে লোভ হিংসা রাগ কুটিলতা পড়া গেলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এই সোজা সাধারণ মুখগুলো বড় জটিল, এদের বুঝে ওঠা দায়। লোকটাকে নিয়ে, আসলে এই কেসটাকে নিয়েই. ও. সি-র এত মাথা ঘামাতে হত না। কিন্তু কর্নেল সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। রিটায়ার্ড হলেও কর্নেলের ক্ষমতাও কম না।

অতএব বদরু ধোপা নামক এই আসামী সূত্রটিকে নিয়েই আরম্ভ হয় ও. সি-র তদন্ত।

—তুমি বদরু ধোপা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি কর্নেল সাহেবের বাড়ির কাপড় কাচ?

—আইজ্ঞে হ্যাঁ। ওখেনে আরো অনেক বাড়ির কাচি।

—তোমার পুরো নামটা কি?

—আইজ্ঞে শেখ বদরুদ্দিন।

—অ্যাঁ! তুমি মোচরমান!

—আইজ্ঞে হ্যাঁ।

—যাদের বাড়ির কাপড় কাচ তারা জানে তুমি মোচরমান?

—আইজ্ঞে না। তারা জানে আমি ধোপা।

—আচ্ছা গাধা তো!

—আইজ্ঞে হ্যাঁ।

—গাধা বললাম তাতেও আইজ্ঞে হ্যাঁ!

—আইজ্ঞে, আমরা হলাম গে গরিবমানুষ। গাধা আর আমরা কি তের? গাধার হেঁদু-মোচরমান হয় না। আমাদেরও ভদ্দরলোকদের মতো অত বেশি হয় না। গাধা বোঝা টানতি পারলি ধোপা তারে চেনে, খেতি দেয়। কাপড় ভালো কাচতি পারলি বাবুরাও তেমনি বদরু ধোপারে চিনতি পারে। হেঁদু না মোচরমান তা জানতি চায় না।

—হুঁ, বুদ্ধি যে একেবারে নেই পেটে তা নয়। তা, দেশ কোথায়?

—আইজ্ঞে, বাংলাদেশ, খুলনের কাছে।

—বর্ডার-টপকানো মাল ?

—আইজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেশ ছেড়ে মরতে এখানে কেন ?

—ভাশ না ছাড়লিই মরতাম আইজ্ঞে। এখেনে কোনোমতে দুটো জুটি যায়।

—তোমরা বেআইনী অনুপ্রবেশকারী সেটা জান ?

—আইজ্ঞে না। সেত্তা কি ?

—থাক, জেনে আর দরকার নেই। কাজের কথা শোন এবার। কর্নেল সাহেবের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে তাকে চেন তুমি ?

—আইজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ি বড় ভালো মাইয়ে।

—বুড়িকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তুমি জান ?

—আইজ্ঞে না। গেল বিষ্যুতবারেও অরে দেখলাম, কাপড় দিল, কথা হল।

ও. সি-র চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে বদরুর মুখের সহজপাঠের পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করতে থাকে। বুড়িকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে লোকটার যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক ছিল তা যেন হয়নি। আর পাঁচটা মামুলী কথার মতোই মুখের চেহারা, গলার স্বর। ব্যাটা কি খেলছে ? না, এটাই ওর ধরন ?

—বুড়ির সঙ্গে তোমার কি নিয়ে কথা হত ? ও. সি জিজ্ঞেস করে।

—যেমন হয় আর কি।

—তবু শুনি।

—কাজের কথা, সুখদুঃখের কথা।

—ঐটুকু মেয়ের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা ? ও. সি যেন একটা ক্লু পায়।

—গরিবের মাইয়ে তো···ওদের বাচ্চাকাল ঠেনেই অনেক সইত্তি হয়। আর সইত্তি হলিই জানত্তি পারে, শিখতেও।

—হুঁ। বুড়ি কি পালিয়েছে না ওকে কেউ ভাগিয়ে নিয়েছে ? হুম্ করে প্রশ্নটা ছোঁড়ে ও. সি।

—আমি কি কইয়ে জানব বড়বাবু ?

—কর্নেল সাহেবের বাড়িতে কেমন ছিল বুড়ি ?

—আজ্ঞে গরিবের হিসেবে খুব ভালো, মাথাটা অদ্ভুতভাবে নাড়ায় বদরু, খেত ভালো, পরতি পেত ভালো। তবে মাঝে মাঝে পেটানটা সাহেবের হাতে একটু বেশি হইয়ে যেত, এই যা…

—থামলে কেন? বল।

—গেল বিষ্যুৎবারে আমি গেইলাম। তার আগের দিনই সাহেব ওরে বেদম মার দিইল। বুড়ির হাতে কালসিটে দেখিছি।

—বুড়ির বাপ জানত না যে সাহেব ওকে মারধর করে?

—জানলি কি হবে? দেড়শো টাকা মাইনে ঐটুকুন মাইয়েরে কে দেয়। টাকাটা তো বাপেরই সংসারে যায়। মারধর একটু খেলি কি মাইয়ে পইটকে যাবে। গরিবের অত আহ্লাদে হলি চলে না।

—বুড়ি কালসিটে দেখিয়ে কি বলেছিল তোমাকে?

—আইজ্ঞে, বলিছিল, বদরু দাদা, অমন মারলি আমি মইরে যাব।

—তুমি কি বলেছিলে তখন?

—বলিছিলাম, বালাই ষাট, গরিবের মাইয়ে তুমি, আরো কত মার খাবা, মার খাতি খাতি বড় হবা। এডা জানবা, গরিবের পেরান খুব শক্ত, সে অভাবে বাঁচে, বড়লোকের পেটান খাইয়েও মরে না।

এসব কথা বলার সময় বদরু খোশার মুখের কোনো ভাবান্তর হয় না। ক্রমেই যেন লোকটা গভীর রহস্যময় হয়ে উঠছে। ও. সি-র মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। বদরু খোশার সঙ্গে বুড়ির অন্তর্ধানের যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়।

—তুমি বুড়ির গ্রাম চেন? গ্রামের নাম জান? ও. সি লক্ষ্যে পৌছবার জন্য মুখটাকে যথাসম্ভব বদরুর মতোই ভাবলেশহীন করে তোলে।

—আইজ্ঞে না।

—বুড়ি কি পালিয়ে একলা দেশে যেতে পারবে বলে মনে হয় তোমার?

—আইজ্ঞে না। মাইয়েটা অত চালাকচতুর না।

—বুড়ি কি তাহলে কোনো গিরিস্তের লোকের সঙ্গে ভেগেছে?

—ছি ছি, কি যে বলেন আইজ্ঞে, ও যে দুধের বাচ্চা।

—তাহলে বদরু, পুলিসী দক্ষতায় আচমকা মুখে ক্রূরতা ফোটায় ও. সি, তুমিই মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছ।

—আইজ্ঞে না, মা-কালীর দিব্যি, ক্রিতদাসের ক্ষেমে গড়ায় সাধ নাই বড়বাবু।

—হুশ্‌ শালা, হাসি চাপতে মুখটাকে আরো কুটিল করে ও. সি, মোচরমান হয়ে কালীর বিবৃতি ?

—আইজ্ঞে, অবোস। বেশ, আল্লার কিরে।

—তা চাঁদু, কিডন্যাপ জানলে কি করে ?

—আরো জানি বড়বাবু, আমরা গরিবমানুষ, চোর-ডাকাত গুণ্ডা হ্যাচড় হৈহ্‌ মোচরমান সব একসঙ্গে বসত। কত নতুন নতুন বাক্যি শুনি। দু'একটা মনে এইটকে যায়।

—তা, তোমাকে এখন আমি এইটকে রাখছি না। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়বে না। মিথ্যে বলে থাকলে কিন্তু মরেছ। যাও।

বদরু খোশা চলে যেতে সাব-ইন্সপেক্টর বিশুবাবুকে ডেকে ও. সি বলে—নজরে রেখো। লোকটাকে একদম বুঝতে পারলাম না।

বিশুবাবু হাত চালাতে বড় ভালোবাসে, উপরির মতোই আনন্দ পায়, বলে—যদি বলেন ধরে লাগাই কচুয়া।

—না হে না, দিনকাল ভালো না। এ লোক হয় ভীষণ সরল, নয় নম্বরী খোড়েল। শেষে কিসে কি হয়ে যাবে।

পরের তিনদিন কাজ বেশি এগোয় না। ও. সি মোটামুটি ধরে নিয়েছে তার দায়িত্ব শেষ। এবার যা করার করুক মিসিং পার্সন্‌স্‌ স্কোয়াড। বিশু-বাবুর লোকজন অবশ্য বদরু খোশার ওপর নজর রেখেছে। অস্বাভাবিক কিছু তাদের চোখে পড়েনি। ওর কোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও নেই। কর্নেল এর মধ্যে বার তিনেক ফোন করেছিলেন। ও. সি নম্রস্বরে জানিয়েছে—তদন্ত চলছে। শেষের বার কর্নেল বেশ ধমকের সুরেই কথা বলেছেন। এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েও ও. সিকে সেটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। কর্নেল বলে কথা। মনে মনে কয়েকটা পছন্দসই খিস্তি দেয়া ছাড়া তার করার কিছু ছিল না।

চারদিনের মাথায় ডি. সি থানায় এসে হাজির। ও. সি-র চেয়ারে বসে সামনে দাঁড়ানো ও. সিকে ব্যাজার মুখে বলেন—অমরমাধববাবু, কর্নেল দত্তর বাড়ির কাজের মেয়ের কেসটা কতদূর ?

—আমাদের যা করার সবই করেছি স্যার। কর্নেল মেয়েটার দেশের ঠিকানা, ছবি কিছুই দিতে পারেননি। মেয়েটা বাড়ি থেকে বেরুতে পারত না। কর্নেল আর মিসেস কর্নেল ছাড়া…

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, ডি. সি ও. সিকে বাধা দেন, কর্নেলের স্ত্রী কি মিসেস কর্নেল ? আমার স্ত্রীকে কি আপনি মিসেস ডি. সি বলেন ?

ডি. সি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে খুঁতখুঁতে, এটা জানা থাকায় লজ্জিত হয় ও. সি।

—না স্যার, স্লিপ অব টাঙ। আমি বলছিলাম কর্নেল আর কর্নেলের মিসেস ছাড়া আর একটামাত্র লোকের সঙ্গে বুড়ি, মানে ঐ কাজের মেয়েটা, কথা বলতে পারত। সে কর্নেলের বাড়ির ধোপা—বদরু। তাকে আমরা জেরা করেছি। ওয়াচে রেখেছি। কিন্তু স্যার···

—তা বললে হবে না। সি. পি কেসটায় ইন্টারেস্ট নিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়ামের এক অফিসার আবার সি. পি.কে···। ব্যাপার কোথায় বুঝতে পারছেন ?

—আমাদের লাইন অব অ্যাকশনটা যদি একটু সাজেস্ট করেন স্যার···

—দেখি, ফাইলটা দেখি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।

ডি. সি ফাইলটা খুঁটিয়ে পড়ে বলেন—দেখুন, আমার বিশ্বাস বাইপাসের ধারের কোনো ঝোপড়িতেই মেয়েটাকে পাওয়া যাবে। মেয়ে পাচার চক্রের কাজ বলে মনে হচ্ছে না। আপনার ফাইলে দেখছি বদরু ধোপার কোনো খারাপ রেকর্ডও নেই। মেয়েটার সঙ্গে অন্য কারো যোগাযোগও ছিল না। সে ক্ষেত্রে আর একটাই সম্ভাবনা থাকে। মেয়েটা মার খেয়ে পালিয়েছে। এ কাজে অবশ্য বদরু ধোপার হাত থাকতেও পারে। ঝুপড়িগুলো খুঁজুন। পেয়ে যাবেন।

অগত্যা বিশুবাবুকে থানার চার্জে রেখে লোকজন নিয়ে ওয়ারলেস ভ্যানে বেরিয়ে পড়ে ও. সি। বদরু ধোপাকেও তুলে নেয়া হয় বুড়িকে আইডেনটিফিকেশনের জন্য। কর্নেলকে তো এ কাজের জন্য সঙ্গে থাকতে বলা যায় না।

এলাকাটা ও. সির চেনা। চেনা বলা ঠিক নয়, দেখা, বহুবার দেখা। প্রায় তিন কিলোমিটার ধরে রাস্তার দু'পাশে কোথাও ফাঁকা জমি পড়ে নেই। নানান জিনিসে তৈরি নানান চেহারার শয়ে শয়ে ঝোপড়ি। কোনো কোনোটা ঘরের চেহারাও পেয়েছে, মাটির দেয়ালের ওপর যা হোক কিছুর ছাউনি। নিকনো উঠোন, তুলসীতলাও চোখে পড়ে। গাছের গায়ে, ফুটপাথে ঘুঁটে শুকোয়। পেটিপড়া ন্যাংটো কালো কালো বাচ্চাগুলো কিচিরমিচির করে। কোথাও একটা চাকাভাঙা সাইকেল রিকশ কেতরে পড়ে

আছে। এসবের সঙ্গে মানানসই চায়ের দোকানে বাঁশের মাচার ওপর তক্তাপাতা বেঞ্চি। হেঁটো নোংরা ধুতির খুঁট গায়ে চিমড়ে-পোড়া বুড়ো বংঙদার-টিশার্ট-পরা কেয়ারি চুলের ছোকরার বাপান্ত করে। বাপ-ব্যাটাই হবে।

কোথা থেকে শুরু করা যায়? চিন্তায় পড়ে ও. সি। না, তবে বেশি সময় নষ্ট করা চলবেনা। শালা কর্নেল!

প্রথম ঝোপড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ও. সি। সঙ্গে বদরু বোশা আর দু'জন সেপাই। বাকি লোকজন দূরে দাঁড় করানো ওয়্যারলেস ভ্যানে।

অল্পবয়সী একটি বৌ পুলিস দেখে ভয়ে ভয়ে ঝোপড়ির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল।

—এই, শোন।

ও. সি-র ডাকে বৌ থামে। ঘোমটা টেনে কোলকুঁজো হয়ে দাঁড়ায়।

—তোমাদের ঘরে বুড়ি নামে কোনো মেয়ে আছে? গলায় পুলিসী সুর যাতে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখে ও. সি।

বৌ কথা বলে না, ঘাড় হেলিয়ে জানায়, আছে।

—নিয়ে এসো তো দেখি। কোনো ভয় নেই, যাও।

প্রথম ঝোপড়িতেই বুড়ি। চাপা উত্তেজনায় ও. সি ভেতরে ভেতরে কাঁপে।

কৌতূহলের সঙ্গে ভয় মেশানো মুখগুলো এখানে-সেখানে উঁকি দেয়। কয়েক জোড়া ধুলোমাখা পা বা সস্তার চটি গলানো, সন্তর্পণে এগোয়, দূরত্ব রেখে থামে। ও সি দেখে চোখের পাশ দিয়ে। রাস্তার দু'ধারের ঝোপড়িগুলোতে গুজবের আগুন ছড়িয়ে পড়তে বড় জোর এক ঘন্টা। বুড়ি যদি থেকেও থাকে এখানে কোথাও, ততক্ষণে সরিয়ে দেবে এরা। এক যদি কপাল ভালো হয়, শুরুর দিকেই পাত্তা লেগে যায়...। এই মেয়েটাই যদি হয় সেই বুড়ি?

ও. সি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য করেনি। বৌটি ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ও. সি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বৌ আস্তে খুক করে কাশির মতো একটা শব্দ করে।

—ওঃ, ও. সি তাকায়, কোথায় বুড়ি?

—এই যে। বৌ কোলের মেয়েকে দেখিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ায়।

বছর খানেকের হাস্যমুখী ন্যাংটা বুড়ি ওপর পাটির সদ্য-গজানো দু'খানা দাঁত দেখিয়ে হাস্য করে এবং বলে—তা তা তা…

এখন তার কি করা উচিত বুঝতে না পেরে অথবা স্বাভাবিক কোনো প্রবণতায়- ও সি বুড়ির গাল টিপে দিতেই বুড়ি তার জামার নাগাল পেয়ে একটা চকচকে বোতাম খামচে ধরে।

ও সি কনস্টেবল ও বদরু দোগার সামনে বুড়ির এই কাণ্ডে লজ্জা পায়, বলে—ছাড়্, ছাড়্।

বুড়ি মুঠি আরো শক্ত করে, দাঁত দু'খানা আবার দেখায় ও প্রবলভাবে মাথা নাড়ে— ন ন ন ন ন।

অগত্যা নিরুপায় ও. সি-কে হাত ঘুরিয়ে বলতে হয়—হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব।

বুড়ি তখন ও. সি-র জামার বোতাম ছেড়ে হাত ঘোরায় ও দগ দগ দগ দগ শব্দের সঙ্গে ও. সি-কে আবার একখানা মাড়ি-দেখানো হাস্য উপহার দেয়।

বুড়িকে আবার আদর করার ইচ্ছা দমন করে ও. সি দারোগা-সুলভ আত্মসংযমের কঠিন পরীক্ষায় কোনোক্রমে উত্তীর্ণ হয়। সার্চ পার্টি এগোয়।

ও. সি চিন্তিত। ডি. সি-র মাথায় শব্দের ঠিকঠাক ব্যবহার ছাড়া আর কিছু আছে কি? ও সি-র সন্দেহ হয়। এভাবে ঝোপড়ি টু ঝোপড়ি বুড়িকে খুঁজে বেড়ানো একটা অবাস্তব আইডিয়া। সমস্ত এলাকাটা ঘিরে ফেলে কুম্বিং অপারেশন চালালে রেজাল্ট পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা ডি. সি-র অনেক ওপরের এক্তিয়ার। তুচ্ছ একটা মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ডি. সি এ রকম প্রস্তাব নিয়ে গেলে ডি. সি-কে ওঁরা ছুটি নিতে বাধ্য করবেন। কিন্তু ও. সি এখন করে কি? এখানকার লোকজনকে জড়ো করে বুড়ির বর্ণনা দিয়ে খোঁজখবর করা মানেই আরো তাড়াতাড়ি খবরটা চাউর হয়ে যাওয়া। তার চেয়ে আসল বৃত্তান্ত গোপন রেখেই ঝোপড়ি টু ঝোপড়ি অনুসন্ধান চলুক। কাজ না হোক, বদলি তো হতে হবে না।

পাঁচখানা ঝোপড়ি পরেই আবার এক বুড়ির সন্ধান মেলে।

ঝোপড়ির সামনে পোড়া কাঠির মতো এক বুড়ো উবু হয়ে বসে দু'আঙুলে ঠোঁটে বিড়ি টিপে ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়ছে। পাটের ফেসোর মতো একমাথা চুল। ঘোলাটে চোখে তামাম দুনিয়ার প্রতি ঘেন্না আর বিরক্তি।

সতর্কতা হিসেবে ও. সি ঠিক করেছে প্রশ্ন করার সময় সে শুধু বুড়ির

নামটাই ব্যবহার করবে। কত বয়েস, কেমন দেখতে ইত্যাদি খবর দিয়ে কোন্ বুড়িকে সে খুঁজছে সেটা বুঝতে দেবে না।

বিনয়ের বিগ্রহ ও. সি বুড়োকে জিজ্ঞেস করে—এখানে বুড়ি নামে কেউ থাকে?

—থাকে।

বুড়োর বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হয় না। ভালো করে ও. সি-র দিকে তাকায় না পর্যন্ত। পুলিসকে এত তাচ্ছিল্য করতে ও. সি জীবনে কাউকে দেখেনি।

বিস্ময় চেপে রেখে বলে—একবার ডেকে দিন তো।

বুড়োর ঘাড় সামান্য ঘোরে—বুড়ি, তোর বাপ এইয়েছে। বাইরি আয়।

—কোন্ ভ্যাকরার ব্যাটা আবার জ্বালাতি আল।

বলতে বলতে ঝোপড়ি থেকে যে বেরিয়ে আসে সে যে বুড়োর একান্তই নিজস্ব বুড়ি তা বয়স-চেহারা-ভঙ্গিতেই প্রকাশ। ছুঁচনে লক্ষ্মীর মিল।

—ঠিক আছে। আপনি যান। ও. সি আর দাঁড়ানো সমীচীন মনে করে না।

এক জায়গায় বাচ্চারা চু কিত কিত খেলছিল। একঝাঁক ছেলেমেয়ে। ও. সি সেদিকে এগোতে থাকে। কাছাকাছি হতে পুলিস দেখে নিমেষে সব ভোঁ ভাঁ।

—এঃ, সব পালাল। কমসে কম তিন-চারটে বুড়ি ছেল এখেনে। বদরু ঘোষার গলায় আক্ষেপ। এতক্ষণ তার মুখ থেকে একটিও শব্দ বেরোয় নি।

—তার মানে? চাপা রাগী গলায় ও. সি বলে, ইয়ার্কি হচ্ছে?

—আইজ্ঞে, যদি রাগ না করেন একটা কথা বলি।

—দরকারি বিষয় না হলে বলো না। আমার মেজাজ এখন খুব খাট্টা।

—আইজ্ঞে, গরিবের ঘরে বুড়ি পুঁটি খেঁদি টেঁপি এই রকম নামই বেশি হয় আমি দেখিছি। তার মধ্যি আবার বুড়িই এক নম্বরে। তাই বলতিছেলাম

—থাক, আর বলতে হবে না। তোমার পরামর্শ নিয়ে আমি সরকারী কাজ চালাব না। ও. সি পা বাড়ায়।

—সেভা ঠিক। বদরু নিঃশব্দে ও. সি-কে অনুসরণ করে।

তিন ঘন্টায় চুণো আঠারোটা ঝোপড়িতে চুঁ মেরে ছত্তিরিশটা বুড়ির সন্ধান মেলে। তার মধ্যে আটটার বয়স নিখোঁজ বুড়ির মতো। ও সি

জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তুষ্ট হয় এদের কেউই সেই বুড়ি নয়। এলাকার সামান্য অংশই কভার করা হয়েছে। ডি. সি-কে খবরটা দেয়া দরকার। এখনো বেশির ভাগটাই বাকি।

সার্চ পার্টি ওয়্যারলেস ভ্যানে ফিরে যায়।

ওয়্যারলেস সেটের বোতাম টেপে ও. সি।

—হ্যালো ডগলাস, হ্যালো ডগলাস, ম্যাডোনা হিয়ার।

—ডগলাস স্পিকিং টু ম্যাডোনা। ওভার।

—ডগলাস, ছশো আঠারোটা ঝোপড়ি দেখা হয়েছে। টোটাল এরিয়ার থার্ড পারসেন্টও নয়। মোট ছত্রিশটা বুড়ি পাওয়া গেছে। তাদের কেউই নিখোঁজ বুড়ি নয়। ওভার।

—সার্চ কনটিনিউ করুন। ওভার।

—কমপক্ষে চার-পাঁচ হাজার ঝোপড়ি বাকি। প্রেজেন্ট রেটে সাত-আটশো বুড়ি থাকা সম্ভব। আরো গাড়ি অ্যালাইন করুন। ওভার।

—গাড়ি হবে না। আপনি চালিয়ে যান। ওভার।

—হ্যালো ডগলাস, ডি. সি-কে খবরটা দিয়ে দেবেন। ওভার।

—ও. কে, ম্যাডোনা। ওভার।

আবার চলে বুড়ি খোঁজা। ও. সি লক্ষ্য করে ঝোপড়ির সঙ্গে বুড়ির আনুপাতিক হার বেড়ে যাচ্ছে। সার্চ শুরু করার সময় পাঁচ-ছ'টা ঝোপড়ি পরে পরে একটা করে বুড়ি পাওয়া যাচ্ছিল। এখন প্রায় দুটোতে একটা। সন্ধ্যের ক্যাকাশে অন্ধকারে এলাকাটা রহস্যময়। বড় রাস্তার হ্যালোজেন বাতি থেকে ছিটকে আসা আলো গাছ-গাছালিতেই আটকে যায়। ঝোপড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঁকি দেয় লম্ফ বা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো। অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে কৌতূহলী মানুষগুলোর জটলা দূরত্ব কমিয়ে আনছে। আস্তে অথচ শোনানোর মতো করে ছুঁড়ে দেয়া মন্তব্য আর হাসির টুকরো-গুলোকে ও. সি আমল দেয় না। ব্যাপারটা যে চাউর হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারে। বুড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া তারই প্রমাণ। টেপি হারানো ছুঁচকি পরানিরাও বোধ হয় বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার বুড়ি ও. সি-র মাথার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে ওরা। হঠাৎই ও. সি-র মনে হয় এরা সবাই সব জানে। জেনে-বুঝেই যা করবার করছে। ঐ শালা বোকা-মুখ বয়স্কটাও বাদ নয়। কিন্তু কেন? এত বড় একটা এরিয়ার সবাই মিলে মেয়ে পাচারে

নেমেছে এমন চিন্তা পাগলে ছাড়া করতে পারে না। এদের বেশির ভাগই খেটে-খাওয়া নিরীহ মানুষ। তবে ? ও. সি-র মাথা গুলিয়ে যেতে থাকে।

হঠাৎ পেছনে ধঁ ধঁ করে একটা শব্দ। ও. সি ঘুরে দেখে বদরু পড়ে গেছে। কনস্টেবল দু'জন ওকে তুলে ধরেছে। ও. সি টর্চের আলো ফেলে। অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে হয়। চোখ বোজা। নাড়ি দেখে। চলছে। হাত-পায়ের তাপ অনুভব করে। স্বাভাবিক। প্রায় দশ ঘণ্টা ঘুরছে। খেয়ে-টেয়ে আসেনি হয়তো। সকলের সঙ্গে ওকেও একবার অবশ্য চা-বিস্কুট দেয়া হয়েছে। স্ট্রেনটা হয়তো ওর পক্ষে বেশি হয়ে গেছে।

অন্ধকারে জমাট জটলাটার দিকে তাকিয়ে ও. সি হাঁকে—একটু জল নিয়ে আসুন।

জল আসে। বদরুর মুখে জলের ঝাপটা দেয়া হয়। হাতপাখাও নিয়ে আসে একজন।

একটু বাদে চোখ খোলে বদরু।

—কি কষ্ট হচ্ছে ? ও. সি জিজ্ঞেস করে।

—আইজ্ঞে বুকে বড় বেদনা। মিনমিন করে বলে বদরু।

বদরুর অজ্ঞান হওয়াটা সত্যিই হোক বা ওর বিটলেমি, ও. সি ভাবে, হাসপাতালে নিয়ে তো যেতেই হবে। আর ও না থাকলে সার্চ চালানোরও মানে হয় না।

ও. সি কনস্টেবল দু'জনকে বলে—একে সাবধানে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে শুইয়ে দাও।

তারপর ঘোরে ছায়ামূর্তিগুলির দিকে—আপনাদের মধ্যে এর পরিচিত কেউ থাকলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। না হলে অন্তত এর ঘরে খবরটা দিয়ে দেবেন। দরকার হলে একে হাসপাতালে ভর্তি করে দেব। পরে আমার লোক এসে সব খবর দিয়ে যাবে।

একজন এগিয়ে আসে—আমি ওর পাশেই থাকি। চলেন, আমি যাব।

ওয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে ও. সি সোজা গাড়ি নিয়ে যায় হাসপাতালে।

বদরুর বুকে সামান্য দোষ পাওয়া যায়। মারাত্মক কিছু না। ওকে ভর্তি করে নেয় হাসপাতাল। মনে মনে স্বস্তি বোধ করে ও. সি, বদরুর প্রতি কৃতজ্ঞতাও। অসুস্থ হয়ে বদরু তাকে বিরাট একটা ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে সোজা ডি. সি-র কাছে।

রিপোর্টিং শেষ করে ও. সি বলে—স্যার, এখন সার্চ চালাতে গেলে কর্নেলের আমাদের সঙ্গে থাকা দরকার। এমন আর কেউ নেই যে বুড়িকে আইডেনটিফাই করতে পারে।

গোটা ব্যাপারটাই যে একটা তামাশায় দাঁড়িয়ে গেছে, ঝোপঝাড়িতে ঝোপঝাড়িতে বুড়ির সংখ্যা যে মিনিটে মিনিটে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে, এসব খবর অবশ্য ও. সি চেপেই রাখে। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ডি. সি-র মাথা থেকেই এই আইডিয়ার জন্ম। এর খুঁত ধরা কি ও. সি-র সাজে।

—হুঁ, ডি. সিকে চিন্তিত দেখায়, এর মধ্যে দু'বার টেলিফোন এসেছে। কর্নেল নিজে দু'বার, চারবার তাঁর মুরুব্বীরা। তাবিয়ে তুলেছে। কি আর করবেন, আপনি চলে যান কর্নেলের কাছে। ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে যান। জানি ভদ্রলোক একটু ডিফিকাল্ট··· । ঠিক আছে, একটা জিপ দিয়ে দিচ্ছি। উনি বোধ হয় ওয়্যারলেস ভ্যানে উঠতে চাইবেন না। আপনি আর কর্নেল জিপে যাবেন। সেকেণ্ড অফিসার সার্চ পার্টি নিয়ে থাকবে ওয়্যারলেস ভ্যানে।

ও. সি-র আজ্ঞাবহ অনুগত মাথা নড়ে ঠিকই, কিন্তু যা সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে সেটা আন্দাজ করে মনে মনে সে খুশি হয়।

ও. সি-র কাছ থেকে সার্চের বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন কর্নেল। নানান প্রশ্ন করছিলেন। প্রতিটি পদক্ষেপে পুলিস যেসব ভুল করেছে সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। বাধ্য ছাত্রের মতো শুনছিল এবং মাথা নাড়ছিল ও. সি। এ পর্যন্ত চমৎকার। তাঁর উচ্চতর বুদ্ধি ও. সি মেনে নেয়ায় কর্নেলের মুখে প্রশান্তি। চা আসতে পারে এমন একটা আশাও দেখা দিচ্ছিল ও. সি-র মনে।

কিন্তু ও. সি কর্নেলকে সার্চ পার্টির সঙ্গে যাবার কথা বলতেই ঘটে গেল বিস্ফোরণ।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন কর্নেল—হাউ ডেয়ার ইউ··· ! আমি কর্নেল পি. কে. দত্ত, আমি যাব থানার ও. সি-র সঙ্গে সার্চ পার্টিতে ! ছোটলোকের বস্তিতে একটা ছোটলোকের মেয়েকে আইডেনটিফাই করতে ! আপনাদের সঙ্গে ঘুরব আমি ! আপনার সাহস তো কম নয় !

—স্যার, আপনি ওভাবে দেখবেন না। আমরা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই…

—ব্যস্, এনাফ অব ইট। মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার কর্তব্য পুলিসকে জানানো, জানিয়েছি। এখন আপনাদের যা ইচ্ছে করুন। আমাকে এভাবে আর ডিসটার্ব করবেন না। আপনি আসতে পারেন।

কাঁচুমাচু মুখ করে বাইরে বেরিয়ে এল ও. সি। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একবুক নিশ্বাস নিল। তার অনুমান নির্ভুল। বাঁচা গেল।

এভাবেই এ ঘটনার নিষ্পত্তি ঘটে, অথবা নিষ্পত্তি না হওয়া হাজার হাজার ফাইলের একটি হয়ে থানার তাকে উঠে যায়।

উপসংহার:

অসমর্থিত জনশ্রুতি এই যে বদরু ধোপাই কর্নেলের বাড়ি থেকে বুড়িকে সরিয়ে বন্ধুদের সাহায্যে তাকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কর্নেলের কানেও খবরটা পৌঁছয়। কিন্তু এ নিয়ে আর এখনো তিনি ঠিক মনে করেন না। কারণ বুড়িকে তাঁর শাসন করার ঘটনাটাকে নাকি এই ছোটলোকগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।

এবং সমর্থিত সংবাদ হচ্ছে এই যে, কর্নেল এই অসভ্য শহরে আর না থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইণ্ডিয়াতেই থাকবেন। তবে এমন কোনো শহরে যেটা এ রকম ঝোপড়ি ছোটলোক আর অকেজো পুলিসে ভর্তি নয়।

# গত শতকের বাংলা চলচ্চিত্র : একটি স্মৃতিচারণ

ধ্রুব গুপ্ত

আমার এই লেখা স্মৃতিচারণগোছের হবে. একথা গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো। তার একাধিক কারণ আছে। প্রথম কথা হলো, আমাদের চলচ্চিত্রকর্ম তেমন যত্নে রক্ষিত হয়নি, আবার যেটুকু হয়েছে তা তখুনি হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে বারে বারে সেসব ছবি তন্ন তন্ন করে দেখে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা আমার মতে একেবারে অসম্ভব না হলেও দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র ( বাংলা বা ভারতীয় চলচ্চিত্র ) নিয়ে তাত্ত্বিক লেখাপত্র পড়ে আজকাল আমার একটা আতঙ্ক ও অনীহা উপস্থিত হয়েছে। "পথের পাঁচালীর" 'জনপ্রিয়তা'-র ব্যাখ্যা যখন রসতত্ত্ব দিয়ে করা হয়, আবার সত্যজিৎ রায়ের সর্বকর্মকেই যে কলের যন্ত্রফসল বলে চিহ্নিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে দেখি এসব কর্মকে "কলোনিয়াল হ্যাংওভার" বলে চিহ্নিত যাঁরা করছেন তাঁদের আচারে-ব্যবহারে, বাচনে বসনে ভূষণে সর্বাঙ্গীণভাবে সেই হ্যাংওভারই প্রতিভাত হচ্ছে, তখন মনে হয় সিনেমাচর্চা নিয়ে এখন যা হচ্ছে বেশ কিছু চিন্তক মহলে, তাকে শেষ পর্যন্ত appropriation by the academia বা prota-academia, of a varied cultural activity বলে মনে করতে হবে। আরেকটি কারণ হলো আন্দোলন বা মতাদর্শের সঙ্গে চলচ্চিত্রকর্মকে খুব সুনির্দিষ্টভাবে অন্বিত করা এবং কোথায় কিসের থেকে উত্তরণ ঘটেছে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে, অর্থাৎ গোড়া ধরে টান মারতে গিয়ে দেখা যাবে, বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐভাবে মতাদর্শ তেমন কোনো ভূমিকা পালন করেনি। 'পথের পাঁচালী'-র সঙ্গে 'নিও রিয়্যালিজম'কে জুড়ে দেবার ক্ষেত্রে ঐ জিনিসটা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, 'পথের পাঁচালী'তে যাকে ঐতিহ্য বলা হয় তা কোনোভাবেই বর্তায়নি। আরো একটা কারণ হলো. অভিনব কর্মের ইতিহাস রচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, যেহেতু 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়'। প্রায় অনুরূপভাবেই বলা যায়, সেলুলয়েড সনে ছবি ( সিনেমা ) সকলই হারায়। এক্ষেত্রে সাহিত্য কর্মেরই জিৎ। কারণ, সেই কালের কবলে ভবিষ্যতেও বেঁচেবর্তে থাকা অত দুষ্কর নয়। সাহিত্যকর্ম যেহেতু অতখানি বস্তুগত নয়, সেইহেতু এটা সম্ভব।

সেখানে বিশেষ বিশেষ কর্মের বিস্তৃত বিবরণ ধরে রাখলে, আর যাই হোক আগামী প্রজন্মের পাঠকদের জন্য একটা বিকল্প (যত দুর্বলই হোক) রেখে যাওয়া যায়। প্রায় শেষ কথা হলো: চোদ্দশো সালের তৎপর্য ঠিক কী, সত্যি কথা বলতে তা আমি জানি না। আমার তো কথাটা শোনা মাত্র রবীন্দ্রনাথের গলায় 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' আবৃত্তিটাই শুধু মনে আসে। পুজো-বিয়ে-অন্নপ্রাশন ছাড়া পাঁজির, তাও সমাজের একটি শাখাতেই (সেটা যত বিপুলই হোক সংখ্যায় হিসাবে) আর কি গুরুত্ব আছে এখন তা আমি জানি না। বাংলা চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে যদিও মুসলমান ও খ্রিষ্টান ধর্ম আশ্রিত সমাজ অত্যন্ত প্রান্তিক ভাবে এসেছে, তবু তাঁরা তো আছেন বঙ্গ সমাজে, তাহলে হিজরাৎ নিয়েও আমাদের ঐরকম কোনো বোধ জাগবে কিনা, নাকি সেটা শুধু বাংলাদেশের জন্যই তোলা থাকবে, তা আমার জানা নেই। আমার নিজের কাছে চোদ্দশোর ব্যাপারটা অনেকটাই নস্ট্যালজিয়া-সম্পৃক্ত। তাই স্মৃতিচারণই শুধু করা যাক।

এটা ঠিকই যে চলচ্চিত্র কর্মের বয়স এবং বঙ্গাব্দের একটা শতক প্রায় খাপে মিলে যাচ্ছে, যদি আমরা ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মোটামুটি সেলুলয়েডের স্থিতেয়-চলমান জগতের আলোকচিত্র রচনাকেই সেই কর্মের আরম্ভ বলে মনে করি। হীরালাল সেনের এ জাতীয় কর্মের কথা আমরা পড়েছি। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে মনে হয়, তিনি যে সময়কালে কাজটা শুরু করুন না কেন সেটা অন্তত পক্ষে ১৩০০ সালের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেই। কিন্তু তাঁর তোলা নাট্যাভিনয়ের দৃশ্য বা বিজ্ঞাপন কিংবা কোনো ঘটনার তথ্যচিত্র তো আর আমাদের পক্ষে লভ্য নয় যে তা দেখে বলব সেটা কেমন ছিল। কলকাতার বয়স তিনশো বছর হবার সময় ও বিষয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখা গেছে নিছক খবর পাওয়াও কত দুর্লভ। জাতীয় গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র সংগ্রহ শালায় 'The Bengalee'র মতো পত্রিকার পাতা গুঁড়োঃ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ ক্যাটালগে নাম শোভা পাচ্ছে। এ বিষয়ে পুণাতে কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটাও বলি। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে (সাত-যোগ দিতে ১২' এর বদলে ১৩ বসিয়ে বঙ্গাব্দ বার করতে হচ্ছে মনে মনে, এইতো আমাদের অনেকের মনে ও সামাজিক আচরণে বঙ্গাব্দের স্থান!) পুণার জাতীয় চলচ্চিত্র সংগ্রহশালার ক্যাটালগ খুঁজতে গিয়ে দেখি, মৃণাল সেনের "কলকাতা-৭১" ছবির ঠিক আমার কার্ডটিতে লেখা আছে 'কলকাতা'—তথ্যচিত্র, ১৮৯৯। নির্মাতা হিসাবে

একটি জার্মান নাম ছিল। তক্ষুণি অনুরোধ করে সে ছবিটি স্টীন্‌বেক যন্ত্রে নিয়ে চালিয়ে দেখি. সেই তথ্যচিত্রের গোড়াতে মাত্র আধ মিনিটের মতো কলকাতার ছবি বাকিটা বারাণসীর। গোড়াতেই কলকাতা-র ছবি দেখে কর্মচারীরা সম্ভবত পুরোটাই কলকাতার ওপর ভেবে নিয়ে ওটার গায়ে 'ক্যালকাটা' লেবেল এঁটে দিয়েছেন। সে যাই হোক, সম্ভবত সেটিই এখন আমাদের কাছে লভ্য কলকাতার সচল ছবির প্রথম নিদর্শন। তাতে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে ঘোড়ায় টানা ট্রাম যাওয়ার ছবি দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। আজি হতে প্রায় শতবর্ষ আগেকার কলকাতার চলমান ছবি। তারপর যে সব তথ্যচিত্র তোলা হয়ে ছিল—যেই তুলুক—যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উদ্বোধন, পুরোনো হাওড়ার পুল খোলা ও বন্ধ করা ইত্যাদি, সেসব দেখার সুযোগ কোথায়? আর হীরালাল সেনের তোলা ছবিগুলি তো সবই ভস্মীভূত হয়েছে অগ্নিকাণ্ডে। সে তো গেল, কিন্তু তারপরও নিঃশব্দ ছবির যুগের উদাহরণ গুলোরই বা কী গতি হলো? এত যে ধীরেন গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন পালের কথা আমরা পড়ি, দুচারটে স্থিরচিত্র দেখতে পাই ত্রিশ দশকের চলচ্চিত্র পত্রিকাতে, সে সব ছবি সিনেমাটিক দিক থেকে কেমন ছিল জানবার উপায় কী? একমাত্র মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' নির্মাণকালে নিঃশব্দ যুগের একবারে শেষ দিককার ১৯৩১ নিদর্শন 'জামাইবাবু' (পরিচালক: কালিপদ দাস) প্রায় সবটাই অক্ষতভাবে রয়েছে। সেটা এখনও আমরা দেখতে পারি এবং সেই ছবির চমৎকার চ্যাপ্‌লিনেস্ক কমেডি দেখে আমরা মুগ্ধ হই। আর আরোবার বহুশতক ধরে নির্মিত তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্রের খণ্ড বিশেষের সমাহার "ক্রোস্টাল উইন্‌ডো" এখনও অরোরা সংস্থার হাতে আছে, যা ভালভাবে সংরক্ষণ করা উচিত। তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব তথ্য চিত্র আছে (বিদেশ যাত্রা, মহাজাতি সদনের উদ্বোধন, নটীর পূজার দৃশ্য), বা অন্যান্য ঘটনার ও (মাঝদিয়া রেল দুর্ঘটনা ইত্যাদি) তা ইতিহাসের মূল্যবান দৃষ্টিগ্রাহ্য দলিল।

ত্রিশ দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের বেশ কিছু নিদর্শন টিকে আছে ঠিকই, কিন্তু তাও দরকার মতো দেখার সুযোগ তেমন ভাবে নেই। প্রমথেশ বড়ুয়ার বাংলা 'দেবদাস' দেখা বোধহয় আর সম্ভব নয়, হিন্দীটা রয়েছে পুণাতে, যাতে দেবদাসের অভিনয় করেন সাইগল, বড়ুয়া স্বয়ং মহিমের চরিত্রে অবতীর্ণ। এখানে একটা অন্য কথা বলে নিই। সম্প্রতি দূরদর্শনে "ব্যতিক্রমী" চলচ্চিত্র

পরিচালক কুমার সাহানীর 'তরঙ্গ' দেখানো হলো। তাতে এক জায়গাতে চলচ্চিত্র থেকে উদ্ধৃতি দেবার মত করে, যেমন মৃণাল সেন 'ইন্টারভিউ' ছবিতে করেন 'পথের পাঁচালী' থেকে, বা 'খণ্ডহর' ছবিতে সংলাপের মাধ্যমে করেন সত্যজিতের "জলসাঘর" থেকে "গাড়িওয়ালা, আর কতদূর?" কথাটি প্রয়োগ করেন। এটা শরৎচন্দ্রকে, না প্রমথেশ বড়ুয়াকে, না বিমল রায়কে—কাকে "ট্রিবিউট" দেওয়া হলো তা দর্শকরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ঠিক করে নিতে পারেন। যাক সে কথা, ঐ বাংলা "দেবদাস"-এ (১৯৩৫) একেবারে গোড়াতেই পুকুরপাড়ে দেবদাস-পার্বতীর মাছ ধরার দৃশ্যাবলী ও তৎসংলগ্ন সংলাপে দেবদাসের কলকাতা যাবার সম্ভাবনা ও তা নিয়ে পার্বতীর উদ্বেগকে বড়ুয়া যে সংযমের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন এবং পুকুরকে ঘিরে যেভাবে একটি ঘূর্ণায়মান শর্ট নিয়েছিলেন (এখুনি আরেকবার না দেখে বলা যাবে না সেখানে ট্রাকিং বা প্যানিং কীভাবে কতটা প্রযুক্ত হয়েছিল), এবং ছবির শেষ দিকে ট্রেনে দেবদাসের মত্ত উদ্গার, ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়া, চাকার গতি ও রোগ আবিষ্কারে দেবদাসের আতঙ্ক—এসবের শটগুলি যেভাবে দ্রুত ছন্দে সম্পাদিত হয়েছিল (ক্যামেরার কাজে বিমল রায় ছিলেন) তাতে প্রতিপন্ন হবে যে বড়ুয়া তাঁর বাইরের অভিজ্ঞতা সম্বল করে চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সার্থক হচ্ছিলেন। সেটাও এখন চাক্ষুষ করার উপায় আর রইল না, যদি না হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে কোনো একটি প্রিন্ট আবার পাওয়া যায়। অথবা বলা যায়, চারু রায়ের তৈরি 'বাঙালী' ছবিতে কলকাতার মধ্যবিত্ত কেরাণী সমাজটাকে যেভাবে বাস্তবসম্মতভাবে ধরবার এক সার্থক প্রচেষ্টা রয়েছে, যেমন—শ্যাওলা ধরা উঠোনে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে নিয়ে সাবান মাখা গায়ে ঢালতে ঢালতে পারিবারিক সংলাপ উচ্চারণ, এসব তো আমরা ১৩৭২ বঙ্গাব্দেও উৎসব আয়োজন করে দেখেছিলাম, সে ছবিতে প্রথমেই অতগুলি চরিত্রকে উপস্থাপিত করার চমৎকার বাকবাহুল্য বর্জিত পদ্ধতি বা যোগেশ চৌধুরির মতো থিয়েটারে আবিষ্ট অভিনেতার অভূতপূর্ব বাস্তবধর্মী-চলচ্চিত্র সম্মত low key acting দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে সব তো রক্ষা করা হলো না, এখন চোদ্দশো সালে বসে তেরশো শতকের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে ভাবগদগদ হলে কী হবে? নীতিন বসু, মধু বসু বা দেবকী বসুর কিছু কিছু কর্ম পুণার সংগ্রহশালাতে আছে, আগেই তো বলেছি তা দেখতে পাওয়া সহজ হবে না।

চল্লিশের দশকে তৈরি 'উদয়ের পথে' নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে, এখনও হয়। এর একটা ভালো প্রতিষেধক আমাদের দিয়ে গেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ 'অরণি' পত্রিকায়, বিশেষ করে এ ছবিতে শ্রেণীচেতনা-বিষয়ক প্রস্তাবের শূন্যগর্ভতা বিশ্লেষণ করে। অথচ আমরা তার "অঞ্জনগড়" ছবিটা ভুলে গেছি, যেটি ছিল সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত, যেখানে শেষদিকে একটি অনবদ্য লং শটে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মহারাজাদের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অসামান্য ছবি ছিল এবং চিত্রভাষার দিক থেকে যা "উদয়ের পথের" হলিউডী মিষ্টতার সঙ্গে বৈপরীত্য রচনা করেছিল। ততদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে. দেশ ভাগও হয়েছে। বাংলাতে নতুন সংকট উপস্থিত। সেই সংকটকে ঘিরে নিমাই ঘোষ "ছিন্নমূল" তৈরি করে ফেললেন। এখন এই ছবিটির "বাস্তবতা" কী ধরণের 'বাস্তববাদের' সচেতন বা স্বতঃস্ফূর্ত ফসল, সেসব তর্ক আমি হাল আমলের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের ( যাদের অনেকের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক মিচেল সম্পাদিত "Against Theory" পুস্তকটির কথা মনে পড়ে যায় ) জন্য ছেড়ে দিচ্ছি. কিন্তু ইতালিয়ান "নিওরিয়ালিজম"-এর সঙ্গে একে নানা কারণেই অন্বিত করা উচিত হবে না, কারণ এছবির নির্মাণপর্বে ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজম ছিল আমাদের অজ্ঞাত, এবং সেই বিশেষ সময় ও স্থানলগ্ন বাস্তববাদের শর্তগুলির অনেকগুলিই এছবিতে ছিল অনুপস্থিত, যদিও চেহারাতে এখানে-সেখানে মিল আছে, একথা পরে ছবি দেখে মনে হতে পারে। বরঞ্চ, মতাদর্শের দিকথেকে এছবিকে আই-পি-টি-এর সঙ্গে অন্বিত করলে অধিকতর সমীচীন হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই ছবিটি দূরদর্শন মাধ্যমে এবং প্রেক্ষাগৃহেও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলে হয়তো এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় অনেকের আছে। এ-ছবির প্রথম দিকটি, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ত্যাগের আগের সুখী গ্রামের পর্বটি নিতান্ত দুর্বল—অভিনয়ে চিত্ররচনায়, আলোকসম্পাত ও সংলাপ রচনাতে; অভিনেতাদের গতিও হয় আড়ষ্ট, না হয় নাটুকে—এই দুর্বলতাগুলির প্রায় সমস্তই ঋত্বিক ঘটকের "নাগরিক" ছবিতে ছিল, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু সংকট যখন হঠাৎ নেমে এল, তারপরেই সব দিক থেকে ছবির চেহারা-চরিত্র হঠাৎ পালটে গেল এমন ভাবে যে, এখনও দেখে হতবাক হতে হয়। ধরা যাক বারান্দার খুঁটি ধরে বৃদ্ধার দেশত্যাগে তীব্র অসম্মতি. আপন-"তরা যা গিয়া আমি যামুনা যামুনা

আমার শ্বশুরের ভিটা হাইয়্যা আমি যামুনা"—তখন একটি অনির্বচনীয় মুহূর্ত সৃষ্ট হয়ে এবং পরাশর বসু অভিনীত চরিত্রটি তাকে যেভাবে অনুনয় করে যে ভাবে তাকে গঙ্গাস্নানের লোভ দেখায় ( পরে কলকাতায় সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিবার টুকরো দৃশ্যটি সন্নিবেশ করে নিমাই ঘোষ যে ধরণের চলচ্চিত্র মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন—তাও পরে ঋত্বিক-সত্যজিৎ-মৃণাল কর্তৃক সৃষ্ট ও সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ হয়ে আছে ) তা দেখে আজও আমরা মুগ্ধ হবো। দর্শনা স্টেশনের নামটি অপসৃত হবার পর থেকেই কলকাতা পৌঁছনোর দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার দৃশ্যটি যে-কোনো চলচ্চিত্রছাত্রের বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় রূপে বিবেচিত হতে পারে—শব্দযোজনায়, বিভিন্ন শটের সম্পাদনায়—বিভিন্ন মনুষ্য শরীরের নির্বাক অথবা নিদ্রিত কিংবা অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় অসহন রচনায়, ট্রেনের ভেতর থেকে ক্রমে সন্নিকট হওয়া কলকাতার আভাস দর্শনে শরণার্থীদের উদ্বেগ ও কৌতূহলের মানসচিত্রণে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেনটির শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছনোর টপশটে ( 'অপরাজিত'-র মত সর্পিল গতিতে ঢুকছে না অবশ্য। )—সব মিলে এ ছবিতে একটি চমৎকার ভাবগর্ভ ভিস্যুয়াল অর্কেস্ট্রেশন সৃষ্ট হয়েছে। শব্দানুষঙ্গ হিসাবে কেবল ট্রেনের আওয়াজ যে কী পরিমাণ সার্থক হয়েছে তা লেখার ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। যারা বর্তমানে অন্যান্য বিদ্যা, বিশেষ করে সাহিত্য সমালোচনা থেকে ধার করা বিদ্যে সম্বল করে সিনেমাতে "ন্যারেটিভ"-এর চরিত্র নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাতে পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে থাকেন তাঁরা নিজেরা এছবিটির শুধু এই সিকোয়েন্সটা নিজেরা ভালো করে নজর করুন এবং ছাত্রদেরও তাতে উদ্বুদ্ধ করুন—তা হলে শত শতকের চলচ্চিত্রকর্ম বিষয়ে চর্চার ক্ষেত্রে ভালো ফল দেবে। অবশ্যই 'ন্যারেটিভের' ক্ষেত্রে দেখা যাবে—এ ছবিতে যাকে Plot বলা হয় বা ন্যারেটিভ বিষয়ক পণ্ডিত David Bordwell যাকে রুশি শব্দ প্রয়োগে "synzhet" বলছেন, তার স্থান নেই, এবং নেই বলেই একে হলিউডী চিত্র রচনার প্রবল ব্যতিক্রম বলে আমরা মনে করব। আরেকটা দিক থেকেও এ ছবি বিশেষ শ্রদ্ধা দাবী করবে। সাধারণত বাংলা ছবিতে আঞ্চলিক ভাষা ( dialect ) ওড়িয়া ও বাজে হিন্দী প্রযুক্ত হয় মজা করার জন্য, এ ছবিতে পূর্ববঙ্গীয় মুখের ভাষা পূর্ণ মর্যাদাতে প্রতিষ্ঠিত। এ ছবিতে actuality এবং তৈরি শট কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে মেলানো হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা বধূ (শোভা সেন)

শিয়ালদহ স্টেশনে হঠাৎ পুষ্টিহীন শরণার্থী শিশুর মাটিতে শুয়ে থাকার অসহায়তা দেখে আতঙ্কিত হন, এখানে তথ্যচিত্রের শিশুর দৃশ্যটির সঙ্গে শোভা সেনের আতঙ্কিত মুখের ক্লোজ শট যেভাবে যুক্ত হয়েছে সেটা আজকের দিনের চলচ্চিত্রের ছাত্রদের এবং সাধারণ রসিকদেরও মনোযোগের বিষয়। হ্যাঁ, একটা কথা বলা বোধহয় এখানে উচিত, সেটা হ'লো 'ছিন্নমূল'-এ এই যে আঞ্চলিক ভাষার সশব্দ প্রয়োগ তার নিদর্শন চল্লিশের দশকের নাট্যকর্মে ছিল, 'নবান্ন' 'দুঃখীর ইমান' 'হেঁড়াতার' ইত্যাদিতে।

১৯৪৯ সালে, অর্থাৎ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস অবলম্বনে একটি ছবি তৈরি হয়েছিল, পরিচালক হিসাবে নাম দেখা যায়—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন কালী ব্যানার্জী (শশী) ও নীলিমা দাস (কুসুম)। অনেকের মুখে সে ছবির সুখ্যাতি শুনেছি, ছিন্নচিত্র দেখেছিলাম মনে আছে। কিন্তু ছবিটি 'জনপ্রিয়' হয়নি বলে সংরক্ষিত হয়নি। শোনা যায়, শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি কপি ছিল, খোঁজ করা যায় কিনা জানি না। সংরক্ষণে নিদারুণ অবহেলা নিয়ে আবার বিলাপ করতে গিয়ে মনে পড়ল, অতুল গুপ্ত-র আত্মজীবনীমূলক পুস্তক "দিনগুলি মোর"-এ আছে তিনি, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি, শিশির ভাদুড়ী এবং নরেশ মিত্র পরিচালিত শরৎচন্দ্রের কাহিনীভিত্তিক 'আঁধারে আলো' ছবিতে দেখেছিলেন—হঠাৎ বিজলির ঘরে নীল আলো জলে উঠল। এ ব্যাপারটা সিনেমাতে তখন কীভাবে সম্ভব হয়েছিল সেটাও অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। খ্রিষ্টীয় চল্লিশের দশকের শেষদিকে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস অবলম্বনে দেবকী বসু যে ছবি করেন তারও স্থায়ী চলচ্চিত্রীয় মূল্য রয়েছে, সেটি অবশ্য পুণেতে সংগৃহীত আছে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চাশের দশকে 'পথের পাঁচালী' প্রবলভাবে আমাদের চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে অভিঘাত সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু তার আগে বা অব্যবহিত পরে কয়েকটি ছবি তৈরি হয়েছিল—যা এখনো মনোযোগ সহকারে দেখবার মতো। তার মধ্যে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য-র গল্প অবলম্বনে এক বোবা মেয়ের কাহিনীকে নিয়ে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে 'তথাপি' নামে যে ছবিটি তৈরি হয়েছিল বা তার অল্প আগে কিশোর-কাহিনীমূলক ছবি 'পরিবর্তন'-এ সত্যেন বসু যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন সেগুলি বঙ্গাব্দের একটি শতকের স্মরণীয় কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পাবার কথা। 'পরিবর্তন' পেলেও 'তথাপি' সেই স্বীকৃতি পায়নি। প্রায়

গোটা বহুরূপী সম্প্রদায়কে নিয়ে তাদেরই অভিনীত তুলসী লাহিড়ী-রচিত 'পথিক' নাটক অবলম্বনে দেবকী বসু ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কয়লাখনি অঞ্চলকে ধরে দেওজিভাই-এর ক্যামেরায় আলো-আঁধারি কাজের সম্বলটি নিয়ে যে ছবিটি করেন সেটিও এখানে স্মর্তব্য। এই সব ছবির পাশে 'নাগরিক'-এর অপটুত্ব এমন প্রকট যে কী বলব! সারা জীবন ধরে ঋত্বিক ঐ ছবি নিয়ে সংকোচ প্রকাশ করে গেছেন নানাভাবে, নানা ভাষাতে (বিষয়বস্তুর ব্যাপারটি বাদ দিয়ে)—মৌখিকভাবে অবশ্য। অথচ তাঁর মৃত্যুর পরে ঐ ছবিকে ঘিরে সজ্ঞানে যে 'মিথ'টি তৈরি করা হচ্ছে তা দেখে চলচ্চিত্রচর্চা বিষয়ে আগ্রহ কমে যায়। বিশেষ করে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ে ছিটে ফোঁটা জ্ঞান-বিহীন অবাঙালী চলচ্চিত্র পণ্ডিতদের যখন ঋত্বিককে নিয়ে পাণ্ডিত্য করতে দেখি তখন নিছক বাঙালী হিসাবে আমার বিরক্তি উৎপাদিত হয়। ফলে, 'নাগরিক' থেকে 'অযান্ত্রিক'-এ ঋত্বিক যে অভূতপূর্ব উত্তরণটি সম্ভব করেন তার ইতিহাসটা ঐ 'মিথ'-এর মহিমাতে চাপা পড়ে যায়।

'পথের পাঁচালী'—'অযান্ত্রিক'—'বাইশে শ্রাবণ' নিয়ে সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল যে চলচ্চিত্র ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন তার হাপটে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি প্রাপ্য অভিনিবেশ আকর্ষণ করেনি। তবু এখন, অসিত সেনের 'চলাচল' তপন সিংহ-র 'জতুগৃহ', অপরূপ গুহঠাকুরতার 'বেনারসী' বা অগ্রগামীর 'হেডমাস্টার' অল্পবিস্তর পরিচিত হচ্ছে, কিন্তু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবি হারিয়ে গেছে। সেটি সম্পর্কে দুচার কথা বলা প্রয়োজন! ছবিটি হারিয়ে যেত না যদি এবিষয় কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা যাদের হাতে আছে তাঁরা একটু সচেতন হতেন (যথা, পুণার সংগ্রহশালা)। ছবিটিকে গুরুত্ব দেবার একটি বিশেষ কারণ আছে। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে দীর্ঘ ইতিহাস বঙ্গসংস্কৃতির আজ তার চলচ্চিত্রীয় রূপের ক্ষেত্রে ছবিটি গুরুত্বপূর্ণ। ছবিটি হলো ১৯৫৫ সালে প্রস্তুত অগ্রদূত পরিচালিত 'অনুপমা'। কাহিনীর আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক পরিস্থিতি বেশ কিছুটা 'মেঘে ঢাকা তারা' 'মহানগর' ও 'পুনশ্চ' (মৃণাল সেন)-র মতো,—মধ্যবিত্ত পরিবার একজন নারীর উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। পার্থক্য হলো এই যে, নারীটি (অনুভা গুপ্ত) এখানে বিধবা এবং একজন পুরুষ সহকর্মী-র (বিকাশ রায়) প্রতি প্রেমাসক্ত। সমস্যাটা সেইখানে। একটি দৃশ্যে আছে তার বিধবা মা (সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়) ব্যাপারটা আঁচ

করে কতকটা আর্থিক সংকটের কথা ভেবে কতকটা ধর্মীয় 'ঐতিহ্য'-র আকর্ষণে একদিন মেয়েকে টানতে টানতে ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটি ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, ছবিটি সেই বংশের এক মহিলার 'সতী' হবার পর তার পায়ের ছাপ। সেদিকে তাকিয়ে কন্যাকে তার মা যা বলেন তার অর্থ হলো 'বেচাল কিছু করার আগে এ ছবিটা মনে রাখিস, মনে রাখিস তুই এই বংশের মেয়ে।' এখনও আমার সুপ্রভা মুখার্জীর কঠিন মুখ এবং অনুভা গুপ্ত-র আতঙ্ক-হতাশা আর আত্মপ্রকাশের বাসনা জড়ানো মুখছবিটি স্পষ্টও সঠিক ভাবে মনে আছে। যাঁরা সম্প্রতি 'ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা' নিয়ে আত্মিক লড়াইতে নেমেছেন তাঁদের কি হাওয়ার সঙ্গে চিন্তার লড়াই করার আগে আমাদের সংস্কৃতির এই বাস্তব ফসলগুলির দিকে একটু দৃকপাত করার উচিত নয়? শেষদৃশ্যে অনুভা গুপ্ত বিদ্রোহ করেন; লো-এঙ্গল শটে আমরা দেখি তিনি স্যুট্‌কেস হাতে বারান্দা দিয়ে ক্যামেরাকে মুখ করে বেরিয়ে আসছেন, পিছনে অসহায় ছোট ছোট ভাইবোন করুণ স্বরে 'বাসনে বাসনে' করতে করতে এগিয়ে আসছে, দিদির মুখে তখন বেদনা ও কাঠিন্যের সমাবেশ। অকুস্থলে প্রেমিক এসে জোড়াতালি দিয়ে সমস্যার একটা সুরাহা করে দিলেও এ ছবির মূল্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়; অন্তত যাঁদের মনে আছে এ ছবির কথা তাঁরা সত্যিই না ভেবে পারেন না। 'মেঘে ঢাকা তারা'-'মহানগর' নিয়ে তো আমরাই দেশ-বিদেশে সেমিনার করছি, লিখছি—'মেঘে ঢাকা তারা'তে ঋত্বিক সত্যজিতের বিলেত থেকে পাওয়া র‍্যাশনালিস্ট মনোবৃত্তির গাড্ডা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে তাতে পুরাণ-ভিত্তিক আদি নারী-প্রতিমাকে কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়েও নিয়ে যাচ্ছেন, আগের শাশ্বত মূল্যও দিচ্ছেন—চলচ্চিত্রের পণ্ডিতদের এইসব বুদ্ধিদীপ্ত তর্কবিতর্ক শুনছি; সেই কোলাহলে এইসব ছবি চাপা পড়ে যাচ্ছে।

অজয় কর মূলত ক্যামেরার কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র পরিচালনাতেও নামেন। তাঁর সাম্প্রতিককালে প্রদর্শিত 'মধুবন' রঙিন ছবিটিতেও বর্তমানের 'মেইন স্ট্রীম' বাংলা সিনেমার কদর্যতার পাশে নানাক্ষেত্রে কত উন্নত ধরণের কাজ কী পরিমাণে আছে তা লক্ষ্য করা গেল। তিনি ১৯৪৯ সালে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসকে চিত্রায়িত করেছিলেন। সেখানে তুলসী লাহিড়ী, প্রভাদেবী, শোভা সেন, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যালের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে কী মাপের অভিনয়কর্ম

করেছিলেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। একটি দৃশ্যে জমিদারের (তুলসী লাহিড়ী) ব্যভিচারের ফলে অন্তঃসত্বা বিধবা শালীকে একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা একবাটি তরল পদার্থ খেতে বলছে, উদ্দেশ্য ভ্রূণ হত্যা; সেই দৃশ্যে একটু নীচু থেকে আলো ফেলে তিনটি চরিত্রের মুখমণ্ডলে যে ভয়াবহতা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সেই পরিবেশে প্রভাদেবীর শোভা সেনকে "খা না এটা, খেয়ে ফেল" বলার ভঙ্গি স্মরণ করলে এখনও ভাবি অজয় কর চিত্ররচনাতে তখনও কেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

একটি মাত্র ছবিতে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করে বিদায় নিয়েছিলেন বারীণ সাহা,—ছবির নাম 'তের নদীর পারে'। সম্পূর্ণ আউটডোরে জ্যোৎস্নার আলোর ব্যবহারে, শারীরিক হিংসার চিত্রণে, সার্কাস-কর্ম অবলম্বনে শিল্পীর যন্ত্রণা ধরবার প্রচেষ্টাতে শহরে বা আধাশহরে সমাজের বাইরের জগৎকে তুলে ধরবার ঐকান্তিক চেষ্টায় সে ছবিতে একটা অনন্যতা ছিল। পরে, রবীন্দ্রকাহিনী অবলম্বনে তৈরী 'স্ত্রীর পত্র'-র জন্য পূর্ণেন্দু পত্রী স্বীকৃতি পেলেও তাঁর প্রথম ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে' তে নিগেটিভ নিয়ে পরীক্ষা, সিনেমাতে কাব্যের আবহাওয়া সৃষ্টির বিশিষ্ট প্রচেষ্টার জন্য এখন পুনর্বার আমাদের বিশেষ মনোযোগ প্রত্যাশা করছে।

আর, নিশ্চয় একথা বলা যায় যে, ডক্যুমেন্টারি ছবি তৈরির ক্ষেত্র কতিপয় নবীন চলচ্চিত্রকার নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ফসল ফলিয়েছেন।

আমার এই স্মৃতিচিত্রে এমন ইচ্ছে করেই গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা অপর্ণা সেনের কথা বা উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'চোখ'-এর কথা তুলছি না। তার কারণ, নিশ্চয় অনুমান করা সহজ হবে এই ভিত্তিতে যে, ঋত্বিক-সত্যজিৎ-মৃণালের বা রাজেন তরফদারের 'গঙ্গার' কথাও তুলিনি, যেহেতু এঁরা বহু আলোচিত। যদি আমাদের গত বঙ্গীয় শতাব্দীকে মূল্য দিতে ইচ্ছে হয় তা হলে ঐ হারিয়ে যাওয়া বা প্রায়-হারিয়ে যাওয়া কিংবা অবহেলিত কাজগুলোর কথাই এক দিক থেকে বোধহয় বেশি করে বলা দরকার।

এখন এই যে শতবর্ষব্যাপী কাজটি হয়েছে তাকে কোনো একটা বা একাধিক স্টকটার-এ কেবল অনুশীলনের কোনো অর্থ বা উপায় আছে কিনা সেটা একটু ভালভাবে ভেবে নেওয়া দরকার। পশ্চিমের মতো করে এক্ষেত্রে আমাদের সত্যি সংঘবদ্ধ আন্দোলন, সাধারণ ধর্মজ্ঞাপক চরিত্রায়ণ বা নান্দনিক

পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, প্রকাশের ভিন্নতর পথ অন্বেষণ—তেমন কিছু ব্যাপক ভাবে হয়েছে বলে আমার তো মনে হয় না। মধ্যবিত্তের পারিবারিক মূল্যবোধ, জাতীয়তাবাদ, নারীর প্রতিষ্ঠা, খুবই ব্যাপকভাবে মার্কসীয় চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজে শ্রেণী বিভাজনের সমালোচনা, সমাজ সংস্কৃতির নির্যাসকে চলচ্চিত্রের মধ্যে ধরার কিছু সজ্ঞান প্রচেষ্টা, মানবিকতাবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি কতগুলি আদর্শগত চিন্তা এর বা ওর কাছে প্রেরণা যুগিয়েছে, ছবি ধরে ধরে সেইসব কথা হয়তো বলা যায় এবং বলাও হয়েছে, কিন্তু মোটের ওপর সকলেই একটি কেন্দ্রগত বিষয়ের সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়কে সংলগ্ন করে কারণ-কার্য সম্পর্কের পূর্ণ যুক্তিবাদী ছককে সর্বত্র না মানলেও মোটের ওপর দর্শকের সাধারণ-সময়-চেতনাকে তেমন আঘাত না করে কাহিনীর যাকে syntagmatic গতি বলা হয় তাই ছবিতে ধৃত হয়েছে, অন্তত বাংলা চলচ্চিত্রে। সেখানে 'কাল অভিযাত্রি'-র মতো ছবি সম্পূর্ণ অন্তকিছু করতে উদ্যোগী হয়ে যদি ব্যর্থও হয়, তবু বলব চোকশোর শতকে আরো পাকাপোক্তভাবে ঐ রকম প্রচেষ্টার হয়তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু হায়, ছবি করতে বহু লোক, মেহনৎ ধৈর্য এবং সর্বোপরি বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়. এবং "জনপ্রিয়" না হলে তো উপায় নেই। তাই নতুন শতাব্দী বাংলা চলচ্চিত্রকে কোন পথে চালিত করবে কে জানে!

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলচ্চিত্রকর্মের দুটি জায়গা আছে সেটা আমরা ভুলে যাই, ভুলে যাবার কারণও আছে। বাংলাদেশের ছবি হিসেবে ষাটের দশকে (তখনও পূর্ব পাকিস্তান) এসেছিল 'নতুন ফুলের গন্ধ' বলে একটি নিকৃষ্ট বাজারি ছবি। তারপর ১৯৮২-র চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা পেলাম 'সূর্য দীঘল বাড়ি'। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে শুনছি সেই মুখ্য চলচ্চিত্র সৃষ্টির ধারাটি এখন বিপন্ন ভোগবাদের প্রতাপে। আর যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেখানে ঋত্বিক ঘটক-এর "তিতাস একটি নদীর নাম" বা রাজেন তরফদারের "পালঙ্ক" সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে এখন বেদের মেয়েরা জ্যোৎস্নালোকে আসর দখল করেছে। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র-চর্চাতে অনেক লোক যুক্ত আছেন বলে শুনেছি, পত্র-পত্রিকাও মাঝেমধ্যে আসে, তাতে গুরুত্বপূর্ণ লেখাও ছাপা হয়, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রের বিষয়ে আশাব্যঞ্জক কিছু শুনতে পাই না। আর ত্রিপুরার অবস্থা নানা কারণেই চলচ্চিত্রের মতো ব্যয়বহুল ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পকর্মের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। তবুও সাহস করে, পরিশ্রম সহকারে

দেবাশিস্ সাহা নামে এক তরুণ শিল্পী এবং তার সহকর্মীরা 'রূপান্তর' বলে একটি ছবি তৈরি করে ফেলেছেন, যা কলকাতায় বারদুয়েক অবাণিজ্যিক ভাবে দেখানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, মিডিয়ার চাপে নতুন প্রমোদোপকরণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লোকশিল্পের সংকট। পাকা হাতের কাজ নয়, কিন্তু আন্তরিকতা ও সাহসের জন্য অভিনন্দন যোগ্য। এঁরা অগ্রসর হলে বাংলা চলচ্চিত্রকর্মের কলকাতা থেকে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। বোম্বেতে তৈরি গোটা কয়েক বাংলা ছবির কথা হয় তো এইসূত্রে উল্লেখ করা উচিত। যেমন, চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল 'নৌকাডুবি' (পরিচালক : নীতিন বসু) এবং 'সমর' (রজনী অবলম্বনে)। সে সব ছবিতে একটা পারিপাট্য ও অভিনয়গত গুণ ছিল, যেটা পরে 'লুকোচুরি' জাতীয় বাজারি পণ্যে পাওয়া যায় নি। অবশ্য রাজ কাপুর মশায় শম্ভুমিত্র ও অমিত মৈত্রকে দিয়ে 'একদিন রাত্রে' ছবিটি বোম্বেতেই করান, যার হিন্দী সংস্করণটি নিজের ছবি বলে দেখিয়ে দেশেবিদেশে সম্মান ও পুরস্কারও অর্জন করেন। চলচ্চিত্র চর্চাক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে সামান্যকিছু কথা বলেই স্মৃতিচারণ শেষ করব। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'পপুলার সিনেমা' ও 'আর্ট সিনেমা' বা 'এলিট-সিনেমা'-র ফারাক নিয়ে এবং যে-কোনো দুই সিনেমার পক্ষ নিয়ে তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক আমাদের এখানে বছর কয়েক হলো মাত্র শুরু হয়েছে। তথাকথিত 'পপুলার সিনেমা'-র ওপর নানাদিক থেকে মূল্যারোপ বা তার সুচিন্তিত বিশ্লেষণ এখন বিপুল হারে করবার ব্যাপারে কিন্তু প্যাকেট্রি-র একটা বড় ভূমিকা আছে। যেহেতু সব 'জনপ্রিয় ছবি' এখন চট করে ভিডিওতে হাতের কাছে পাচ্ছি এবং তাকে উলটেপালটে দেখে তার বিশ্লেষণ করছি, তারপর 'সন্ত তুকারাম'-কেও সেইভাবে পেয়ে তাকেও বিশ্লেষণ করে বলছি— মধ্যযুগীয় মরমীদের ঐতিহ্যের সদর্থক ফসল ঐ 'পপুলার' সিনেমাতেই বর্তে তাকে ধন্য করেছে, অপর পক্ষে সাহেবী সত্যজিৎ 'দেবী'তে 'ধর্মীয়-কুসংস্কার'কে আক্রমণ করে বিলিতি 'সেকুলারিজমের' চাটুকারিতা করেছেন। তা ঐরকম কথা যাঁরা বলেন বলুন, তাঁদের সঙ্গে বিস্তৃত বিতর্কে নামবার জায়গা এটা নয়, কিন্তু একটি সতর্কবাণী উচ্চারণের লোভ সামলাতে পারা যায় না। প্রাক্-কলোনিয়াল যুগের ঐতিহ্যকে এইভাবে সাম্প্রতিক শিল্পকর্মে অন্বিত করার মহৎ দায়িত্ব যেসব চিন্তক তুলে নিয়েছেন তাঁরা কি হলপ করে বলতে পারবেন যে, এই

'তারতমনস্কতার' পিছনে ঐ পশ্চিমেরই নিও-ওরিয়েন্টাল প্রেসক্রিপশন কোনোভাবে কাজ করছে না? বাংলা ছবি নিয়ে অবশ্য সেরকম 'পপুলার' সংস্কৃতির তত্ত্ব-স্থাপনা তেমন এখনও হয়নি। 'বিদ্যাপতি' বা 'চণ্ডীদাস'-এর কপি হাতে এলেই সে-জাতীয় কাজ শুরু হতে পারে—তবে 'পথের পাঁচালী'র আগেকার চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে তো পপুলার এলিট ডাইকটমিটা কাজ করত না, বরং হয়তো দেখা যাবে, যে যুগের প্রেক্ষিতে এও ছুটো ছিল এলিট ছবি, 'পপুলার' ছিল "হান্টারওয়ালী"। এইসব ঐতিহাসিক সমস্যাগুলির সুরাহা না হলে, এখুনি বাংলা সিনেমায় 'বাস্তববাদ ও সুখানুভূতি' (Realism & Pleasure-এর সূত্রাবলী নিয়ে Colin Mccabe-এর লেখা মনে পড়ল বলে বলছি) নিয়ে আলথুজার (Althuser) ও বাজ্যাঁ (Bazin) উদ্ধৃত করে 'ক্লাসিক্যাল ন্যারেটিভ' সিনেমাতে দুই স্তরের বাস্তবের অস্তিত্ব (সিনেমার বাইরের বাস্তব ও সিনেমাতে তৈরি করা বাস্তব) ও তার সংখ্যাও বা সহাবস্থান নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। বরং ঐ প্রবন্ধেই বাজ্যাঁ-র 'বাইসিকল থিফ' নিয়ে উদ্ধৃতিটুকু পড়লেই বোঝা যাবে—কেবলমাত্র ক্যামেরায় দৃষ্টিকোণ ও অভিনয়রীতির দিক থেকেই 'পথের পাঁচালী' ছবিকে 'নিও-রিয়ালিজম'-এর সঙ্গে অন্বিত করা সঙ্গত নয় কেন। বঙ্গীয় শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখে এইসব স্মৃতি এবং তজ্জাত কিছু জিজ্ঞাসাই এখন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

# বিদায়, তেজস্বী কলম

কৃষ্ণ ধর

বাংলা সাংবাদিকতার তেজস্বী ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে (২৮ মার্চ ১৯৯৩) এই শতাব্দীর একটি ব্যতিক্রমী সম্পাদকীয় ধারা শেষ হল। আজকের সাংবাদিকতা এবং সম্পাদকের ভূমিকার সঙ্গে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতার আদর্শের এবং দায়দায়িত্ব বোধের পার্থক্যটা তাঁর ষাট বছরের সম্পাদক জীবনের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট হয়। এখনকার সংবাদপত্র সম্পূর্ণত মালিক নিয়ন্ত্রিত। বার্তাজীবী বা ওয়ার্কিং জর্নালিস্ট সম্পাদকের ভূমিকার পেছনে পুঁজিনিয়ন্ত্রিকারীর ছায়াপাত আজ বড় বেশি স্পষ্ট, বড় বিস্তৃত। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বেতনভুক সম্পাদকই ছিলেন। কিন্তু মালিককে সম্পাদকের ওপর খবরদারি, তা স্থূলই হোক বা সূক্ষ্মই হোক, করতে দেননি। এইকারণে তাঁকে আজীবন জীবিকার অনিশ্চয়তায় ভুগতে হয়েছে। তিনি তা মেনে নিয়েই সম্পাদকের মর্যাদা, তাঁর স্বাধীন সত্তা ও বিবেক-অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিবেকানন্দ বাবুর বামপন্থী-ঘেঁষা কলম নিশ্চিতই বৃটিশ যুগে যেমন তেমনি স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠানিক কায়েমী স্বার্থকে বিব্রত ও বিড়ম্বিত করত। তবে তিনি কোনো দলের অন্ধ অনুরাগীও ছিলেন না। মার্কসবাদী না হয়েও তিনি আজীবন শোষিত ও নিপীড়িতদের পক্ষে লিখেছেন। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকা উদ্ঘাটন করে তার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করেছেন তিনি তাঁর লেখায় এবং জনসভায় তাঁর বাগ্মিতায়। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর এমার্জেন্সির অন্ধকার দিনগুলি পর্যন্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এই ভূমিকা ছিল এক অকুতোভয় সাংবাদিকতার দীপ্ত দৃষ্টান্ত। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কার্যত সংবাদপত্র জগত থেকে অবসর নেন এবং তারপর থেকেই তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয় বাংলা সাংবাদিকতার আরেক প্রবাদপুরুষ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে ১৯২৫ সালে। ওঁদের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্পর্কই

ছিল। তবে অল্পদিনের মধ্যেই বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় রচনা তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। ফরিদপুরে এক দরিদ্র ঘরের সন্তান বিবেকানন্দ খুব মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এবং ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম বিভাগে একাধিক লেটারসহ পাশ করেও কলকাতায় এসে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেননি। এই ক্ষোভ তাঁর সারাজীবন ছিল। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা স্বশিক্ষিত হয়ে তিনি একজন অভিজ্ঞ-বিখ্যাত সম্পাদকরূপে দেশবিদেশে প্রভূত খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ সাল অবধি তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। পরে ১৯৩৭ সালে যুগান্তর প্রকাশিত হলে তাতে যোগ দেন। বস্তুত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় জীবনের স্বর্ণযুগ ছিল ১৯৩৭ থেকে ১৯৬২। যুগান্তর পত্রিকার উত্থান এবং একসময়ে প্রচারে আনন্দবাজার পত্রিকাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কলমের জোর এবং সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহসী ও আপসহীন মনোভাব। বৃটিশ আমলে তাঁর এক দুর্ধর্ষ সম্পাদকীয় 'বাঙের বন্ধনমুক্তি' (৪ নভেম্বর ১৯৪২)-র জন্য যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেয় সরকার। আরও বহুবার তাঁকে জব্দ করার চেষ্টা চলে। কিন্তু তাঁর রচনানৈপুণ্যের জন্য সরকারি আইনও হার মানতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাংবাদিকতায় সর্বপ্রথম রণবিদ্যাচর্চা শুরু করেন। ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশীয় রণাঙ্গনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অত্যাশ্চর্য দূরদৃষ্টি ও রণনীতিপারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। একাজে মানচিত্র অঙ্কন করে তাঁকে সহযোগিতা করেন মানচিত্রকর শিল্পী অনিল মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন যুগান্তরে তাঁর সহকর্মী সাংবাদিক ছিলেন। লেনিনগ্রাদ অবরোধ করা সত্ত্বেও যে হিটলারী বাহিনী এই বীরের শহর দমন করতে পারবে না একথা বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে জানায়। তেমনি স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ নাৎসিবাহিনীর কবর রচনা করবে,এ ভবিষ্যবাণীও বিবেকানন্দের কলমে সেদিন নিঃসংশয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'মরু-মূষিক' কিংবদন্তীর সেনাপতি রোমেলের অনিবার্য পরাজয় কিংবা সিঙ্গাপুরের পতন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যথার্থভাবে দিতে পেরেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় বাংলা সাংবাদিকতাকে তিনি কত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বাংলাভাষার নিজস্ব শক্তি ও লাবণ্য, দৃঢ়তা ও রসসর্জনা, তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশজ আনকোরা শব্দের মিশ্রণজাত গতিশীলতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং আঘাত করবার ক্ষমতা তাঁর কলমে বারে বারেই ঝলসে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত ও বহুপঠিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোর একটি সংকলন করা হলে বাংলা সাংবাদিকতার একটি উত্তালউত্তাল যুগের আঙ্গিক ও উপকরণের সঙ্গে একালের পাঠক পরিচিত হতে পারতেন। তাঁর রচনার মতোই শিরোনামগুলিও লোকের মুখে মুখে ছড়াত। 'জাহাজের মহাব্রত' (হিটলার কর্তৃক যুদ্ধজাহাজ অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পি-র আত্মবিনাশের নির্দেশ), এক পয়সার লড়াই বা গৃহযুদ্ধের ভূমিকা (১৯৫৩ সালে ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে) হত্যাকারীর কণ্ঠস্বর (১৯৪৬ সালে কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে), মাটি কার? (১৯৬০ সালে আসামে বঙ্গাল-খেদা আন্দোলনের বিরুদ্ধে), শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায় (১৯৬৬ সাল খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে) প্রভৃতি শিরোনাম এখনও প্রবীণ পাঠকদের মনে থাকার কথা। বিবেকানন্দবাবু পরিহাস করে বলতেন, I thrive in warfare. শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে কলমের লড়াইয়েই ছিল তাঁর আসক্তি। স্মরণ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখের ওপর তিনি বলতে পেরেছিলেন, আমি আপনার জিটেমাটির প্রজা নই যে আপনার হুকুম মত চলতে হবে। যুগান্তরে যতদিন আমি সম্পাদক আছি ততদিন এ কাগজে কী লেখা হবে না হবে সেটা আমার এক্তিয়ার, আপনার নয়। এটা ঘটেছিল ১৮৫৩ সালে বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ বাবু যখন কলম ধরেছিলেন সে-সময়ে। অথচ সবাই জানেন বিধানবাবুর কী দোর্দণ্ড প্রতাপ ও খ্যাতি। তাঁর মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর ঘরে ঢুকতে সাহস করতেন না। একজন বেতনভুক সম্পাদক এ কথা তখনই বলতে পারেন যখন তিনি এর পরিণাম সম্পর্কেও নির্ভয় হতে পারেন। বস্তুত এর প্রতিক্রিয়ায় কাগজের মালিক তুষারকান্তি ঘোষকেও একই কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। মালিকের যেদিন ক্ষমতা হয়নি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর মত পরিবর্তনে বাধ্য করার। তবে ওঁরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়ে একটা মিথ্যা অজুহাতে চীনের পক্ষে ওকালতি করার অভিযোগে তাঁকে সম্পাদক পদ থেকে বরখাস্ত করা

হয়। তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন 'বঙ্গেশ্বর' নামে পরিচিত অতুল্য ঘোষ।

কিন্তু এই যুগলশক্তি প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়েরই কলমের আঘাতে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক কলমযুদ্ধ শুরু করেন তিনি দৈনিক বসুমতীর পৃষ্ঠায়। অতুল্য-প্রফুল্ল গোষ্ঠির হাতে অজয় মুখোপাধ্যায়ের লাঞ্ছনার খবর তিনিই বসুমতীতে ছাপেন এবং পরদিন থেকে আগুন-ঝরানো সম্পাদকীয় জেহাদ আরম্ভ হয়ে যায় এই অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা কংগ্রেস। গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস প্রথমবার ক্ষমতাচ্যুত হয়। ভারতবর্ষে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনাপর্বে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর কলম নিয়ে সেনাপতির মতো ঝাঁপিয়ে না পড়লে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ দখল হয়তো বিলম্বিত হত। অবশ্য এর জন্য বিবেকানন্দ বাবুকে মূল্য দিতে হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি দৈনিক বসুমতী থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। উল্লেখযোগ্য যে, দৈনিক বসুমতী তখন ছিল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোককুমার সেনের কাগজ।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাগ্মিতাও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশ্বনিয়ন্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তির পক্ষে তিনি অজস্র সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। অন্যায় ও অবিচার দেখলে তাঁর কলম খড়্গের মতো ঝলসে উঠত। আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু কোনো সমস্যা এলে তা যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তারপর তিনি লিখতেন। নিজে ভালমত না বোঝা পর্যন্ত এবং বিষয়টির গুরুত্ব ও ন্যায্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ না হলে তিনি কলম ধরতেন না। কিন্তু কলম ধরলে সেখান থেকে আর সরে আসতেন না। সব সময়েই বিতর্কমূলক বিষয় পছন্দ করতেন। তথাকথিত 'নিরামিষ' বিষয়ে তিনি কলম ধরতে চাইতেন না। অর্থাৎ যথেষ্ট উত্তপ্ত বিষয় না হলে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কলম কথা কইতে চাইত না। দেশ বিদেশের পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন, ক্লিপিং রাখতেন এবং অনেক সময় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি এমন বিষয়ও তাঁর সম্পাদকীয় রচনার দৌলতে সংবাদমূল্য পেয়েছে। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের হৃদয়হীন আচরণ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।

নেহরু, বিধান রায় কাউকেই তিনি সেদিন অব্যাহতি দেননি। বস্তুত ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত দলে দলে শরণার্থীর দুঃখ বেদনা ও লাঞ্ছনায় মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যুগান্তরের পৃষ্ঠায় যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কংগ্রেস সরকারকে সমালোচনা করে এই দুর্ভাগাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ করেছিলেন তা পড়ে অনেকেরই এমিল জোলার বিখ্যাত দলিল 'আই একিউজ' ( I' Accuse )-এর কথা মনে পড়বে। তাঁর কলম কাউকেই খাতির করত না। কিন্তু কখনই তাঁর ভাষায় সাংবাদিক সৌজন্য ও শালীনতাবোধের ব্যত্যয় দেখা যায়নি। তা ছাড়া তিনি সাংবাদিকতার মূল সূত্র 'Facts are Sacred, Comment is free' সর্বদা মেনে চলতেন। সংবাদ হল সংবাদ। তার তথ্য ঠিক থাকলে প্রকাশ করতে বাধা নেই, তা যে পক্ষেরই হোক না কেন। কিন্তু সম্পাদক কখনই আজগুবি বা অর্ধসত্য বা মিথ্যা সংবাদের ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করবেন না। সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেই তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য করার সিদ্ধান্ত নিতেন। রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে-কোনো প্রশ্ন নিয়েই তিনি সম্পাদকীয় লিখতে প্রস্তুত থাকতেন যদি তার বৃহত্তর তাৎপর্য থাকত। তাঁর সহকর্মীদের সব সময় বলতেন, পিপ্‌লের ( জনসাধারণের ) কথা কখনো ভুলবেন না। তিনি দেশবিদেশের বহু সম্মান পেয়েছেন। সরকারি খেতাব পদ্মভূষণ তাঁকে দেওয়া হয় ১৯৭০ সালে। কিন্তু সত্তরের দশকে সংবাদপত্রের ওপর সেন্সারশিপ ও দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কলম নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হতে একটু দ্বিধা করেননি। এটাই ছিল তাঁর চরিত্র।

যৌবনে কবিখ্যাতি ছিল তাঁর। কবিতা দিয়েই তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। শতাব্দীর সঙ্গীত ও বিপ্লবী নায়িকা নামে দুটি কবিতাগ্রন্থ লিখেছেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস তিন খণ্ডে লিখেছেন। বাংলাভাষায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণের এটি আকর গ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন রুশ-জার্মান সংগ্রাম, জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, সোভিয়েট-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি এবং এশিয়ায় বন্ধনমুক্তি। আশ্চর্য এই যে এমন একজন প্রতকীর্তি সাংবাদিকের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশে দেখা গেল কলকাতার নাম করা পত্রিকাগুলির অসাধারণ কার্পণ্য। সংবাদপত্র বৃহৎ পুঁজির করতলগত হবার ফলে সংবাদ-মূল্য যাচাইয়ের নিরিখও এভাবেই বদলে যায়। এর বিরুদ্ধেই ছিল বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আপসহীন কলমের লড়াই।

# বস্তুবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ স্মরণে

শ্যামল চক্রবর্তী

গত আটই মে পঁচাত্তর বছর বয়সে প্রখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক ও প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসবিদ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের পরিমণ্ডল থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

উনিশশো আঠারো সালের উনিশে নভেম্বর তাঁর জন্ম। বাবা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সেযুগের ডাকসাইটে ছাত্র কিন্তু চিন্তায় ও মননে ছিলেন সনাতনপন্থীদের দলে। মতাদর্শের কারণে পিতা-পুত্রের মতান্তরের কথা আমরা দেবীপ্রসাদ-এর কাছেই একাধিকবার শুনেছি।

দেবীপ্রসাদ নিজেও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। উনিশশো উনচল্লিশ ও উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে যথাক্রমে বি. এ. এবং এম. এ. পাশ করেন। সেই সময়ে তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা না ঘটলে হয়তো আমরা এই দেবীপ্রসাদকে পেতুম না। উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল নাগাদ দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কবি সমর সেনের পরিচয় ঘটে। সমর সেন তখন একজন পরিচিত কবি ও মার্কসবাদী যুবক। তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এনে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' পড়েন দেবীপ্রসাদ। ফলে, মার্কসীয় ভাবনার মূল কথাগুলি তাঁর মননে তীব্র অনুরণন তোলে। মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী ও পরবর্তী জীবনে 'কলিকাতা-দর্পণ' খ্যাত রাধারমণ মিত্রের কাছ থেকেও মার্কসীয় দর্শনের ওপর রচিত অনেক মৌলিক বই পড়েন দেবীপ্রসাদ। সমাজ আর সময়কে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করার অবলম্বন হিসেবে মার্কসবাদী দর্শনের অপরিহার্যতা তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়। 'পরিচয়'-এ ধারাবাহিক ভাবে লেখেন 'ভাববাদ খণ্ডন'। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকে রচিত তাঁর এই নিবন্ধগুলি সেই সময় অনেক পরিণত পাঠকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

যাহোক, প্রধানত তিনটি বিশিষ্ট অবদানের জন্যই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। (এক) শিশু-কিশোরদের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন; (দুই) ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা ও তৎসংক্রান্ত চর্চার বিস্তৃত উপকরণ আবিষ্কার; (তিন) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস রচনা।

আমরা জানি, অন্ধবিশ্বাস ও অপবিজ্ঞানের অভ্যাসে শিশু ও কিশোরদের আচ্ছন্ন হয়ে পড়বার সকল সামগ্রীই এই সমাজে ছড়ানো রয়েছে। শৈশব থেকে যুক্তিবাদী মন ও বিজ্ঞান-নির্ভরতা সঞ্চারিত করতে পারলেই আগামী দিনে একটি সুস্থ সমাজ তৈরী হতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই কথকতার ঈর্ষণীয় ভঙ্গীতে শিশু-কিশোরদের জন্য দেবীপ্রসাদ বিভিন্ন সিরিজে তিরিশের কাছাকাছি বই লিখেছেন।

'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' শিরোনামে তাঁর সহপাঠী দেবীদাস মজুমদারের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় তিনি বারোটি পুস্তিকা রচনা করেন। অপদার্থ আর পদার্থের কথা (পদার্থবিদ্যা), পারা থেকে সোনা (রসায়নবিদ্যা), এই দুনিয়ার চিড়িয়া-খানা (জীববিদ্যা), পায়ের নখ থেকে মাথার চুল (শারীরবিদ্যা), যমের সঙ্গে যুদ্ধ (স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিদ্যা), বেড়িয়ে আসি বিশ্বজগৎ (জ্যোতির্বিদ্যা), চলো যাই বনবাসে (উদ্ভিদবিদ্যা), বুড়ো পৃথিবীর কথা (ভূবিদ্যা), শোন বলি মনের কথা (মনোবিদ্যা), বাজ ধরবার ফাঁদ (পদার্থবিদ্যা), আবিষ্কারের কথা এবং বিজ্ঞান কি ও কেন? বিজ্ঞানের সকল শাখা বিষয়ে লিখিত এই সিরিজের ভূমিকা হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকার খ্যাতনামা প্রাক্তন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "..... আধুনিক বিজ্ঞান, অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রকৃতির যে সব রহস্য উদ্ঘাটন করেছে, সহজ সরল ও কৌতূহলপ্রদ কাহিনীরূপে সেগুলি শিশুমনের উপযোগী করে লেখার কৃতিত্ব ও মুনশীয়ানা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কেবল ছোটরা নয়, বুড়ো খোকাখুকিদের হাতেও এই বইগুলি তুলে দেওয়া উচিত।" বলা প্রয়োজন, দেবীপ্রসাদ তখন সৃষ্টিকর্মের বিষয় ও পদ্ধতি খুঁজছেন আর সত্যেন্দ্রনাথ সর্বজনমান্য এক ব্যক্তিত্ব।

অগ্রজ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় দেবীপ্রসাদ দশখণ্ডে 'জানবার কথা' প্রকাশ করেছিলেন। 'যুগের পর যুগ' নামে একটা সিরিজ সম্পাদনা শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করেননি। শুরু করেছিলেন আরও একটি সিরিজ, মন মাতানো নাম তার, 'আমরাও হতে পারি।' এই পুরো সিরিজটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তাঁর একার। এতে লিখিয়েছেনও তিনি যোগ্যজনদের দিয়ে। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে যাঁরা যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন তাঁদের জীবনকথা নিয়ে এই সিরিজ তৈরী হয়েছে। যেমন, বিদ্যুৎ বিশারদ: লিখেছিলেন দেবীদাস মজুমদার, মুদ্রণ বিশারদ: অশোক ঘোষ,

বিমান বিশারদ : দেবব্রত বসু, ফটোগ্রাফার : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

এই সিরিজের প্রারম্ভে দেবীপ্রসাদ যা লিখেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝতে তার চেয়ে বোধহয় আর একটি নতুন কথারও প্রয়োজন হয় না। তিনি লিখেছিলেন :

"আমরাও হতে পারি—শুধু তাই নয়, আমাদেরও হতে হবে। কেননা আজ আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড যুগপরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে —হাজার বছরের পুরোনো যে অচল খোঁটায় আমাদের ভাগ্য বহুদিন বাঁধা পড়েছিলো তা উপড়ে ফেলে বিদেশী শাসন-মুক্ত এই দেশকে শিল্পে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আর তাই যন্ত্রকে ভয় পেয়ে বসে থাকা চলবে না—হাতের কাজকে ছোটো মনে করবার, ঘৃণা করবার দিন নয় আর।" পরবর্তী সময়ে পরিচিত হবার পর যখন তার কাছে গিয়েছি, আক্ষেপ করেছেন, এখন আর অল্প বয়েসের ছেলেরা ছোট ছোট এরকম বই লেখার কথা ভাবে না। কত নতুন আবিষ্কার হয়েছে, নতুন করে লেখার কথা জমা হয়েছে কতো কেউ ভাবে না, কেবল টিউশন করে, টিউশন খোঁজে। চাকুরী পেলে তো সবই শেষ। আমার আর সময় কোথায়?

তিন নম্বর শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের বাড়িটির নাম ছিল 'সংকেত ভবন'। বাবা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। দুই ভাই কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ওখানেই থাকতেন। 'সংকেত' নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন তাঁরা। দুটো সংখ্যাতেই সংকেতের ইতি ঘটে। কিন্তু সেসময়ের বিশিষ্ট কিশোর পত্রিকা 'রংমশাল'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব একসময়ে এসে পড়ে দু'ভাইয়ের ওপর। সেই সময়টা 'রং-মশাল'-এর শেষ চার বছর। চারবছরের এই সম্পাদনা-জীবনে দেবীপ্রসাদ ভাবনা ও পরিবেশনার আঙ্গিকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। বছর দুয়েকের মতো ডি. কে. খ্যাত সিগনেট প্রেসে কাজ করেছিলেন দেবীপ্রসাদ। সেসময়ে সত্যজিৎ রায় ওখানে কাজ করতেন। দু'জনের পরিচয় হয়। 'রংমশাল'-এর নানা সংখ্যায় সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত একের পর এক ছবির সমাহার ঘটে। রংমশাল-এর শেষ দুটি বছর প্রচ্ছদ ও অলংকরণের সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। পরবর্তীকালে 'সন্দেশ'-এর ভার নেয়ার আগে সত্যজিতের প্রতিভাকে যোগ্য

কাজে লাগাবার এই সুযোগ দেবীপ্রসাদ ছাড়েননি। কী বলবো আমরা দেবীপ্রসাদকে, শিশু কিশোরদের একজন পরিপূর্ণ অভিভাবক?

সমর সেনের কাছ থেকে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' আর রাধারমণ মিত্রের কাছ থেকে একাধিক মার্কসবাদী দর্শনের বই পড়ে দেবীপ্রসাদের চিন্তার জগতে নবজাগৃতি ঘটে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভবানী সেন মশাই বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। বস্তুবাদ বিষয়টি দেবীপ্রসাদের কাছে জীবনচর্চারই অঙ্গ কিন্তু ভবানীবাবুর বইটিতে ছিল প্রচুর অসংগতি। সুতরাং ভবানীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন দেবীপ্রসাদ। তখন তিনি নিজেও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ফলে তাকেই নতুন ভাবে উপরিউক্ত বিষয়ে একটি বই লিখতে বলা হলে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন দেবীপ্রসাদ। তিনি ইংরেজীতে লিখলেন, বিস্তৃত আকারে, সাতশো পৃষ্ঠা জুড়ে। নাম দিলেন, 'লোকায়ত—এ স্টাডি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান মেটেরিয়ালিজম'। ১৯৫৯ সালে বইটি বেরোয়। দার্শনিক মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। একদল বইটিকে বস্তাপচা তথ্যের সমাহার বলে অবহেলা করেন। তাঁদের বক্তব্য: সংস্কৃত জানে না যে দেবীপ্রসাদ তাঁর আবার দর্শন চর্চা! বস্তুবাদ আবার ভাবনার পদ্ধতি হতে পারে নাকি? কিন্তু অন্যদলের মানুষেরা তাঁকে এই মৌলিক সৃষ্টির জন্য অভিনন্দিত করেন।

জপ আর তপের দেশ এই ভারতবর্ষ। এই ভাবনায় তীব্র আঘাত হানেন দেবীপ্রসাদ। তিনি দেখান, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শুধু মায়াবাদে আচ্ছন্ন নয়। বস্তুবাদী চর্চা সেই পুরাকালেও প্রচলিত ছিল। সেই চর্চাকে ধামাচাপা দিয়েই মেরে ফেলবার জন্যে কালে কালে মায়াবাদীদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেই বস্তুবাদী দর্শনের নামই চার্বাক দর্শন, লোকায়ত দর্শন। চার্বাক বলতে তো আর একজন দার্শনিক ছিলেন না। একটা পৃথক প্রতিষ্ঠানে অনেক মানুষ একই ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। একের পর এক বিজ্ঞান-নিষ্ঠ তথ্য সাজিয়ে 'লোকায়ত দর্শন'-এ স্বমহিমায় প্রকাশিত হলেন দেবীপ্রসাদ। ক্রমে ক্রমে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলেন। বিশ্বের নানাদেশ ও ভারতবর্ষের বহু ভাষায় এই বইটি অনূদিত হয়েছে।

আমরা জানি, ভাববাদী দর্শনের চর্চা আমাদের দেশে কম হয়নি। এই দর্শনের প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতারও অভাব নেই। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনের চর্চাকার হিসেবে প্রকৃত অর্থে দেবীপ্রসাদই সর্বপ্রথম কৃতিত্বের অধিকারী। এর আগে

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবিষয়ে স্বল্পই আলোচনা করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও তাঁর 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ফিলোজফি' বইতে এ-সম্পর্কে খুবই সামান্য আলোচনা করেছেন। বরং বলা যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই বিষয় সম্পর্কিত কাজ যথেষ্ট শ্রদ্ধার দাবী করে। সে যাই হোক, লোকায়ত 'দর্শন'-এ দেবীপ্রসাদ অন্য মাত্রা যোগ করেছেন, যার সঙ্গে পূর্বসূরীদের কাউকেই তুলনা করা চলে না।

দেবীপ্রসাদ কর্তৃক ছোটদের জন্য প্রণীত বইয়ের সংখ্যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পরিণত মনস্ক ও দর্শনশাস্ত্রে আগ্রহী মানুষদের জন্যেও তিনি কম রচনা রেখে রেখে যাননি। কিছু বিশিষ্ট বইয়ের তালিকাই শুধু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

'সায়েন্স এণ্ড সোসাইটি ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া', 'ভারতীয় দর্শন' ( বাংলা, হিন্দী, জার্মান ), 'ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি', 'টেগোর এণ্ড ইণ্ডিয়ান ফিলজফিক্যাল হেরিটেজ', 'হোয়াট ইজ লিভিং অ্যাণ্ড হোয়াট ইজ ডেড ইন ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি', 'রিলিজিয়ন এণ্ড সোসাইটি', 'ইণ্ডিয়ান এথিজম', 'নলেজ এণ্ড ইনটারভেনসন', 'লেনিন দি ফিলোজফার', 'টু ট্রেণ্ডস ইন ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি', 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে', 'ভূতে শয়তানের রাজত্ব', 'সত্যের সন্ধানে মানুষ', 'সে যুগে মায়েরা বড়ো', 'যে গল্পের শেষ নেই' ইত্যাদি।

জীবনে তিনি প্রচুর বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। 'গ্লোবাল ফিলোজফি ফর এভরিম্যান' সিরিজের প্রধান সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসাদ। নিজে তিনটি খণ্ড লিখেছেন—দি বিগিনিংস, ফিলোজফি এণ্ড দি ফিউচার, ফিলোজফি ফ্রম বেকন টু মার্কস। সম্পাদনা করেছিলেন 'হিস্ট্রি অব বুদ্ধিজম ইন ইণ্ডিয়া'। উনিশশো একানব্বই সালে 'প্রতিরোধ' নামে একটি বিজ্ঞানমনস্ক রচনার সংকলন সম্পাদনা করেছেন।

বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহাসিক রূপে দেবীপ্রসাদকে বুঝতে চাইলে একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে তাঁর বই—'সায়েন্স এণ্ড সোসাইটি ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া'। চরক-সংহিতা এবং সুশ্রুত-সংহিতাকে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়ে এই বই লিখেছেন তিনি। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে আমাদের আকৃষ্ট করেছেন। চিকিৎসক ও শল্যবিদগণ কিছুতেই তৎকালীন সমাজের শ্রদ্ধার আসনে আসীন নন, অপাংক্তেয় হিসেবেই থেকে যাচ্ছেন। অসুখের কারণ ও প্রতিষেধক বলতে চাইলেও পূর্বজন্মের

কর্মফল-জনিত পাপের ধারণায় সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই দুই বিপরীতমুখী ভাবনায় সংঘর্ষ সভ্যতায় শুরু থেকেই ভারতবর্ষে চলেছে। দেবীপ্রসাদ রচিত 'হিস্ট্রি অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ইন এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' বইয়ের দুটি খণ্ডই বক্তব্যকে পৃথক ও বিশদ আলোচনায় দাবী রাখে। ১৯৮৬ সালে বইটির প্রথম খণ্ড বেরোয়। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জীববিজ্ঞানী ও চীনের সভ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোশেফ নীডহ্যাম। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমি জানতুম আমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে কিছু জানি; কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বইটি পড়বার পর বুঝলুম কতো কম জানি।' সব কয়টি প্রাচীন সভ্যতার পতনের যে, আর্থ-সামাজিক ও দার্শনিক কারণসমূহ নিহিত আছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় পতনের সত্যটিও সেই মূল সূত্রেই গাঁথা। কেম্বিংটনের গ্রীক সভ্যতা পতনের ইতিহাসও একই সত্যকেই বিবৃত করে। প্রাচীন সভ্যতায় পতনের বিষয়ে এই তিন পুরুষের একই ভাবনা হলেও দেবীপ্রসাদ অসংখ্য মৌলিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এই বইদুটিতে। স্বল্প-পরিসরের কারণে দুটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করা যাক।

উনিশশো দুই এবং উনিশশো নয় সালে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেছিলেন। এই বইয়ে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের পতন সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে ভাববাদের প্রাবল্য এবং মাথার কাজের চেয়ে হাতের কাজকে অবজ্ঞা করার ফলেই প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান বিকাশের অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। এমনকি দাসপ্রথাই যে প্রাচীন গ্রীস ও রোম সভ্যতায় বিজ্ঞান চেতনায় মৃত্যু ঘটিয়েছে একথা বলতেও প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিধা বোধ করেননি। বিশ শতকের শুরুতে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্থ-সামাজিক ও মতাদর্শগত পরিমণ্ডলকে বিজ্ঞান বিকাশের প্রধানতম অন্তরায় বলে মন্তব্য করছেন—এ প্রায় ভাবা যায় না। আমরা দেখেছি, কেম্বিংটন তাঁর 'গ্রীক সায়েন্স' লেখেন উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে। জে. ডি বার্নালের সুবিখ্যাত রচনা 'সায়েন্স ইন হিস্টি' প্রকাশিত হয় উনিশশো চুয়ান্ন সালে। বিজ্ঞান-চেতনায় অবক্ষয়ের প্রশ্নে যে-ধারণা এখন আমরা মেনে চলি, নিঃসন্দেহে প্রফুল্লচন্দ্র সেই ধারণায় সর্বপ্রথম অধিকারী।

অনেকদিন পর উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র প্রিয়দারঞ্জন

রায়ের সম্পাদনায় বইটি নতুন নামে প্রকাশিত হয়, "হিস্ট্রি অব কেমিস্ট্রি ইন এনসিয়েন্ট এণ্ড মেডিয়্যাভেল ইণ্ডিয়া"। সংগত কারণেই মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতা-বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ব ভিত্তিক তথ্যাদি যুক্ত করা হয়। কিন্তু ভাববাদের প্রাবল্য ও হাতের কাজ বিষয়ে যে অবজ্ঞা তৎকালীন প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল—প্রফুল্লচন্দ্রের সেই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। বর্জন করার যৌক্তিকতা কোথায় তাও বোঝা যায় না। কেন না ধর্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামি বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। নিজের আত্মজীবনীতে একটি পরিচ্ছেদ যোগ করেছিলেন "দি রিভাইভ্যাল অব হিন্দু অর্থোডক্সি ফ্যাটেল টু দি প্রগ্রেস অব ইণ্ডিয়া" শিরোনামে। এই অপকর্মের কথা দেবীপ্রসাদ জীবনে কখনো ভোলেন নি। বক্তৃতায় বা আলাপচারিতায় এই প্রসঙ্গটি এলেই তিনি বিষয়টি তুলেছেন।

'হিস্ট্রি অব সায়েন্স ...' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড উনিশশো একানব্বই সালে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে দেবীপ্রসাদ সারা পৃথিবীর দার্শনিক ও বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক মহলের কাছে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেন। বিদগ্ধ মহলের সবাই এতোদিন ভাবতেন, গ্রীক দার্শনিক থেলেসই পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। এমনকি দেবীপ্রসাদ নিজেও এই ভাবনার বাইরে ছিলেন না। সেই কবেকার 'আবিষ্কারের কথা' বইয়ে তিনিও থেলেসকেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বলে মানেন। কিন্তু তথ্য প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হয়। পরিণত বয়সে এসে তিনি লক্ষ্য করেন, এই তথ্যটি সঠিক নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ঐতিহাসিকদের প্রবল উপস্থিতি ও আমাদের অনুকরণ প্রবৃত্তি এমনতরো ধারণার জন্ম দিয়েছে। তাঁর মতে, উপনিষদ সাহিত্যে 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ উদ্দালক আরুণির যে কাহিনী আছে তা থেলেসের সময়কালের চেয়ে বহু প্রাচীন। উদ্দালক আরুণি একজন ঋষি। কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব আলোচনায় ভাববাদ কিংবা পূর্বমুক্ত বিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন হচ্ছেন না। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কার্য-কারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন। উদ্দালক নামে কেউ ছিলেন কি ছিলেন না সেটাও এখানে বড়ো কথা নয়। এই নামটিকে কেন্দ্র করে যে যুক্তিবাদী পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিজ্ঞানসম্পৃক্ত বলে অভিনন্দন জানাতেই হবে।

তাঁর অভীপ্সা ছিল, মোট চার খণ্ডে তিনি প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাস রচনা করবেন। তৃতীয় খণ্ডের কাজ সম্পূর্ণ করে রেখে গেছেন। তার

সুযোগ্য সহযোগী বন্ধুরা এই কাজ নিশ্চয়ই সমাধা করবেন। চতুর্থ খণ্ডের কাজ আর সারা হলো না। তিনি নেই, আমরা চাইবো যে-দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস তিনি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে গেছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কাজ যেন সেই পথে অবশ্যই অগ্রসর হয়।

তাঁকে নিয়ে কতো কথা বলা যায়। তিনি সুবক্তা ছিলেন। কথকতার ভঙ্গীতে সহজ ক'রে কঠিন বিষয় বোঝাবার জন্য তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সারা পৃথিবীর বুকে একটাই শক্তির দানব যখন দাপাদাপি করছে, সমাজতন্ত্র-বাদীদের মধ্যেও যখন হায় হায় রব, সহজে ভেঙে পড়তে রাজী নন দেবীপ্রসাদ। সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আস্থা তিনি শেষদিন পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন। মেধাবী দেবীপ্রসাদের মেধা যে ছিল, একথা সবাই একবাক্যে মানতেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা চাকরী—নৈব নৈব চ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বাবাকে শেষ পর্যন্ত সাক্ষী মেনে সিটি কলেজে একটা পড়াবার চাকুরী সংগ্রহ করেন। পয়ষট্টি-সত্তর টাকা মাস-মাইনে। কলকাতা ও কলকাতার বাইরে নানা কলেজে প্রায় কুড়ি বছর পড়ান। দেশ ও বিদেশের নানা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বহুবার বক্তৃতা করেন। মস্কোর একাডেমি অব সায়েন্স তাঁকে সাম্মানিক ডি. এস. সি. উপাধি প্রদান করেছে। জার্মান একাডেমি অব সায়েন্সেরও তিনি প্রথম ভারতীয় সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯২ সালে দেবীপ্রসাদকে বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত করেন।

এই বস্তুবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞান সাধক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। একবারও কি বসে ভাবতে পারি আমরা, জীবদ্দশায় এই দেবীপ্রসাদকে তাঁর যোগ্য স্বীকৃতি কি আমরা দিয়েছিলাম? ভুল সংস্কৃতি আর হৈ হল্লায় দেশে যোগ্যতা থাকলেও স্বীকৃতির মাল্য থাকে বহুযোজন দূরে। আমরা যেন আর সেই ভুল না করি। দেবীপ্রসাদ বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজে ও জীবনবীক্ষায়। তাঁর সব সৃষ্টিকর্ম হাজারে হাজারে প্রকাশ করে শিশু, কিশোর থেকে প্রবীণ-সহ সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই তাঁকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানানো হবে। এই হোক আমাদের আগামীদিনের কাজ।

## সংযোজন : দেবীপ্রসাদ-প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

প্রখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক ও প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চায় খনামধন্য ইতিহাসবিদ প্রয়াত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর জীবন আর মননচর্চা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শ্যামল চক্রবর্তী উপর্যুক্ত নিবন্ধে যা লিখেছেন 'পরিচয়'-সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধক্রমে আমি তার সঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য সংযোজন করছি।

তিরিশের দশকের শেষে এবং চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব প্রতিভাবান ছাত্র মার্কসীয় জীবনদর্শনকে ভিত্তি করে অবিভক্ত বাঙলায় প্রগতি-সংস্কৃতির পরিপুষ্টি সাধনে গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ভূমিকা, প্রয়াত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সচেতন পাঠকেরা নিশ্চয় জানেন, ১৯৩১ সালে 'পরিচয়'-এর সূচনাপর্ব থেকে এই পত্রিকা ছিল মুক্তবুদ্ধি চিন্তাচর্চা ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা প্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। ১৯৪৩ সালে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক-মালিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন পত্রিকার স্বত্ব-স্বামীত্ব তুলে দেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের হাতে, সম্ভবত তখন থেকেই ছাত্রজীবনের অবসানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও উজ্জ্বল নক্ষত্র দেবীপ্রসাদ এবং তৎকালীন তরুণ পদাতিক-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের অন্যান্য বন্ধুজনেরাও হয়ে ওঠেন 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ১৯৪০ সালে তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশের জন্য দেবীপ্রসাদ প্রসারিত করেছিলেন তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার হাত। আর, ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকার তরুণ লেখক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সোমেন চন্দ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলনে যখন শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা নিয়ে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তখন ফ্যাসিবাদের সমর্থক ঢাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে তিনি নৃশংসভাবে নিহত হন। এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাঙলার তৎকালীন বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। সেই সময় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের প্রাক-মুহূর্তে, ২৮ মার্চ, ১৯৪২ অথবা মতান্তরে এর ৫/৬ দিন পরে, ২-৩ এপ্রিল, দক্ষিণ কলকাতা জেলা ছাত্রফেডারেশনের

উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'প্রাচীর' নামে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী একটি কবিতা-সংকলন। এই সংকলনটি উৎসর্গ করা হয় শহীদ-কমরেড 'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে'। 'প্রাচীর' নামক সংকলনটিতে যাদের কবিতা প্রকাশিত হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত 'বর্গীর-জ' শীর্ষক সেই কবিতায় তিনি ফ্যাসিবাদী জাপানের আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন বিদ্রূপ-মিশ্রিত তীব্র ধিক্কার। এই সংকলনে অন্য যেসব কবির কবিতা প্রকাশিত হয় তাঁরা হলেন—অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সময় সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীহার দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ ও অবন্তী সান্যাল।

আমরা জানি, দেবীপ্রসাদ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনায় বেশ কিছুকাল কাব্যচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। চল্লিশের দশকের গোড়ায় কবি বুদ্ধদেব বসু যখন 'কবিতা-ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে প্রবীণ ও নবীন কবিদের কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন, যতদূর মনে পড়ে, তখন সেই সিরিজে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এরও একটি কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বোধহয় সেই পুস্তিকার নাম ছিল—'কয়েকটি নায়ক'।

সত্যিই দেবীপ্রসাদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। ১৩৪৪ সাল থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত দেবীপ্রসাদ তাঁর অগ্রজভ্রাতা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলেন সেই সময়কার বিখ্যাত কিশোর মাসিক পত্রিকা 'রংমশাল'। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা কিশোরদের আজগুবি ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে সুস্থ ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দেবীপ্রসাদের এই প্রয়াস শুধু তত্ত্ব পরিবেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি নিজে স্বনামে ও বেনামে সহজ-সরল ভাষায় অথচ সত্যিকার সাহিত্যরসে জারিত গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন প্রসাদ উপাধ্যায় ছদ্মনামে, আবার গগনকুসুম গঙ্গোপাধ্যায় ও অলীক চক্র নামের আড়ালে তিনি কিশোরদের কাছে তুলে ধরেছিলেন অদ্ভুতুড়ে আর উদ্ভট জগতের সঙ্গে ননসেন্স সাহিত্যের এক রঙিন রাজ্য। আর, স্বনামেও পরিচালনা করেছেন 'রংমশাল'-এর বিজ্ঞানের পাতা। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে লিখিয়েছেন যথাক্রমে 'এক নিঃশ্বাসে পৃথিবীর ইতিহাস', 'চলো যাই' এবং 'আমার বাংলা'। সুকান্ত ভট্টাচার্য-র 'অতি কিশোরের ছড়া' ও

'রেশন কার্ড' শীর্ষক ছড়া-কবিতা দুটিও ঐ সময় প্রকাশিত হয়েছিল 'রংমশাল'-এর পৃষ্ঠায়। দর্শনের কৃতী ছাত্ররূপে খ্যাত দেবীপ্রসাদের এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তি।

'রংমশাল' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখেছি, কী অনায়াস দক্ষতায় দেবীপ্রসাদ প্রবেশ করলেন বড়দের জন্য লেখালেখির জগতে। এই সময় তিনি বেশ কিছুকাল মেতেছিলেন যৌন-বিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক নানা ধরনের রচনায়। শুনেছি, 'নর-নারী' নামে তৎকালে বহুল প্রচারিত একটি যৌন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকায় যৌন-সমস্যার বিভিন্ন দিক ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে আসা বহুবিধ প্রশ্নের উত্তরও লিখতেন দেবীপ্রসাদ। এই সূত্রে তাঁকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল যৌন-বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যার উপর রচিত গ্রন্থাদি। ফলে, তাঁর কাছ থেকে বাঙালী পাঠকেরা পঞ্চাশের দশকে পেয়েছিলেন 'ফ্রয়েড-প্রসঙ্গে' সহ যৌন-বিজ্ঞান বিষয়ক অন্য একখানি ভালো গ্রন্থ। এর কিছু আগে কিংবা পরে তিনি বিখ্যাত লেখক ডাইসন কার্টার-এর 'সিন অ্যাণ্ড সাইন্স' গ্রন্থকে ভিত্তি করে লিখেছিলেন 'নিষিদ্ধ দেশ, নিষিদ্ধ কথা' নামক পাঠকমন জয় করা আর একখানা বই। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সমাজে নারীদের দেহ নিয়ে যে পাপ-ব্যবসা এবং যৌনরোগ অব্যাহত আর ক্রমবর্ধমান, তারই পাশাপাশি সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থায় পতিতাবৃত্তি ও যৌনরোগ কীভাবে অতিক্রত নির্মূল করা হয়েছে, দেবীপ্রসাদ তা আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় পূর্বোক্ত ইংরেজি বইটিকে ভিত্তি করে প্রায় উপন্যাসের মতোই রুদ্ধশ্বাস গতিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর ঐ গ্রন্থে।

অতঃপর তিনি নিমগ্ন হন তাঁর দীর্ঘকালের চর্চিত বিষয় ভারতীয় দর্শনের বস্তুতান্ত্রিক দিক উদ্‌ঘাটনের জন্য গভীর এক গবেষণায়। সম্ভবত ১৯৫৫ কিংবা ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'লোকায়ত দর্শন'। পঞ্চাশের দশক থেকে তিনি প্রায় নিয়মিতভাবেই 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছেন নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ। বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের উপর রচিত তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি ও ভাববাদ খণ্ডনের বলিষ্ঠ প্রয়াস সেসময় পাঠক-সমাজকে অভিভূত করেছিল। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও মার্কসীয় দর্শনে সুপণ্ডিত প্রয়াত রাধারমণ মিত্র ১৩৬৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় [ ২৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ] লিখেছিলেন দেবীপ্রসাদ-রচিত 'লোকায়ত

দর্শন' নামক গ্রন্থটির বিশ্লেষণধর্মী মনোজ্ঞ এক সমালোচনা। 'পরিচয়'-তে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'লোকায়ত দর্শনের রূপ ও বৈচিত্র্য' শিরোনামে। রাধারমণ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করলেও তিনি ভারতীয় দর্শনের এই বস্তুতান্ত্রিক বিচার-বিশ্লেষণকে স্বাগত জানিয়ে দেবীপ্রসাদকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

দেবীপ্রসাদ গুরুগম্ভীর দর্শনচর্চায় নিমগ্ন থেকেও সাধারণ পাঠকের কথা, আরো সঠিকভাবে বলা উচিত কিশোর-মনের চাহিদার কথা, বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হননি। যতদূর মনে পড়ছে, ঐ পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের মধ্যে তাঁরই পরিকল্পনা এবং সম্পাদনায় একের পর এক প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা', 'জীবনী-বিচিত্রা', 'যুগের পর যুগ', 'এদেশ আমার', 'জানবার কথা', শিরোনামে একাধিক খণ্ডে রচিত গ্রন্থের সিরিজ। কোন্ সিরিজটা আগে আর কোন্ সিরিজটা পরে প্রকাশিত হয়েছিল এখন তা মনে নেই, তবে কোনো একটা সিরিজ শেষ হয়েছিল ১০ খণ্ডে, এটা বেশ মনে পড়েছে। দেবীবাবু শুধু নিজে লিখে কিংবা যোগ্যতম লেখককে দিয়ে লিখিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। গ্রন্থগুলি যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন তেমনি দেখেছিলাম এই কৃতী পুরুষটি দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যাতে বিক্রি হয় সেজন্য বোঝাভর্তি বই নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন কলেজস্ট্রীট পাড়ার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে। ফাঁকি দিয়ে যে কোনো ভালো কাজ করা যায় না, দেবীপ্রসাদ অন্তত সেকথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফসল ফলাতে হলে যে শ্রমিকের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়, এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যেন দেবীপ্রসাদ। তাঁর সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁরাই জানেন, কী কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাত্রা তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। 'লোকায়ত দর্শন' রচনার সময় থেকে আমৃত্যু ঘড়ির কাঁটা ধরেই চলেছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ। এর কোনো ব্যতিক্রম প্রায় ঘটেইনি বলা যায়। আর, এইভাবে না চললে এক জীবনে এত বেশি উচ্চমানের গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করা হয়তো সম্ভবপর হতো না তাঁর পক্ষে।

আমরা দেখেছি, দর্শনশাস্ত্রে গবেষণার পাশাপাশি দেবীপ্রসাদ ভারতের মহান আয়ুর্বেদবেত্তা চরক ও সুশ্রুত রচিত 'চরক-সংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতাকে' ভিত্তি করে উদ্ঘাটন করেছেন প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের

ইতিহাস। এটি ছিল তাঁর পরিকল্পিত প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড। আরও দুটি খণ্ড রচনার মাধ্যমে দেবীপ্রসাদ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার এপর্যন্ত অনালোচিত অসামান্য এক ইতিহাস বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দুঃখের কথা, তৃতীয় খণ্ডের কাজ শেষ হলেও তিনি এই গ্রন্থের প্রকাশিত রূপ দেখে যেতে পারেন নি। তুলনাহীন এই গবেষণাগ্রন্থগুলি দেশ-বিদেশের বিদ্বৎকুল সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা দেবীপ্রসাদকে জানিয়েছেন যথোচিত সম্মান। এইসব কাজের সঙ্গে দেবীপ্রসাদ দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনা করেছেন 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' নামে খুবই উচ্চমানের একটি গবেষণা পত্রিকা এবং বাংলা 'বিশ্বকোষ'। এছাড়া তিনি বহুবার আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছেন বিদেশের বিদ্বজ্জনসভায়, সভাপতিত্ব করেছেন আন্তর্জাতিক দার্শনিক সম্মেলনে। বিদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মানিত করেছে সর্বোচ্চ সাম্মানিক উপাধি প্রদানের মাধ্যমে।

এতক্ষণ আমি দেবীপ্রসাদ-এর বিদ্যাবত্তা এবং তপস্বীর মতো তাঁর গবেষণা-কর্মের সামান্য একটু পরিচয়ই তুলে ধরেছি মাত্র। কিন্তু মানুষ দেবীপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে কী নির্ভীকভাবে অথচ প্রায় নিঃশব্দে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন কিংবা তাঁর বন্ধুবাৎসল্য ছিল কী অসাধারণ অথবা রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৯৫৬ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে বাঁচাবার জন্য মূলত তাঁরই উদ্যোগে তাঁর বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং অমল দাশগুপ্ত প্রমুখের সহযোগিতায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত ম'শাই-এর অকৃপণ আর্থিক সহযোগিতায় তিনি যেসব ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সেইসব কথা যদি তাঁর এখনো-জীবিত কোনো বন্ধু লিখিতভাবে প্রকাশ করেন তবে নতুন প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা দেবীপ্রসাদ-এর মানবিক মহিমাদীপ্ত আর এক রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, দেবীপ্রসাদ ছিলেন মূলত 'পরিচয়' পত্রিকারই অন্যতম প্রধান এক লেখক। মাত্র বছর দুই আগেই তিনি 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি অনবদ্য স্মৃতিচারণমূলক রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চিকিৎসার জন্য এবং মানিকবাবুর অসহায় পরিবারবর্গের প্রতি তাঁরা কয়েকজন মিলে যেভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন তা মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেন। খুব সম্ভব এটাই ছিল 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর সর্বশেষ রচনা।

# ডাকঘর, ১৪০০ সাল

প্রদীপ দাশশর্মা

ঠাকুর্দা : কে শুয়ে আছে, কে, অমল
এই অবেলায়

অমল : না, আমি তো শুয়ে নেই, উঠে
বসেছি, পড়ন্ত-বেলায়, কমলালেবুর বাগানে
রোদের উচ্ছিষ্ট চেটে চেটে খেয়ে নিচ্ছে কে
ডাকহরকরা ? না, ঠাকুর্দা, আমি শুয়ে নেই
জেগে আছি বহুক্ষণ
আমার কোন অসুখ নেই
পৃথিবীর অসুখএখন

ঠাকুর্দা : আজকাল শুনি পৃথিবীর অসুখের কথা
তার নাকি মাঝে মাঝে জ্বর হয়, খুসখুসে
কাশি, বুকের ওজোন-স্তরে ছিদ্র ইতস্তত
অয়ে নাকি গলে যাবে একদিন
মেরুর তুষার, ডুবে যাবে স্থল
অমল
এসব সত্য ?

অমল : ঠাকুর্দা, প্রকৃতিকে জানার মধ্যে আছে
অপরিহার্যতা—যা থেকে জন্ম নেয়
স্বাধীনতা, তবুও সেখানে নেই সব জয়
প্রকৃতি হনন, নিরবধি, ত্যাজ্য যে ঠাকুর্দা
এ পাপ

ঠাকুর্দা : কার পাপ ?
শান্তি নেই ?
নেই কি উদ্ধার !

[ নেপথ্যে ]

সাবধান, ঠাকুর্দা, সাবধান
পৃথিবীর বিপণন – আমাদের

[ মিলিটারি মার্চ-পাস্টের শব্দ ]

পৃথিবীর সব জমি, বায়ু, আলো—সব
কপিরাইট, আমাদের ব্যবহার—সে তো
আমাদের প্রেরোগেটিভ, বিশেষাধিকার,
অতএব সেন্সর হল তোমার প্রশ্ন, ঠাকুর্দা

অমল : তিনভাগ জল, তবু নেই জলপিপি
শামুক, নীল, তিমি, তিমিঙ্গিল,
বিষে নীল
মিসিসিপি
অ্যাসিড বৃষ্টি ঝরে, তুষারের রং
কালো

ঠাকুর্দা : ভালো
এরপর প্রশ্ন করবো না কারা করলো
একাজ, কেন কয়েক লক্ষ লোক নোয়ালো
মরলো
পাখিদের নীল ডিম ফুটলো না
সাইবেরিয়ার
একি একি হায়
আমাকে বন্দী করছো কেন

[ মুখঢাকা-কয়েকজন এসে ঠাকুর্দাকে গ্রেপ্তার করে ]

মুখঢাকা লোকেরা :
বড় বেশি প্রশ্ন করো, বৃদ্ধ
স্বর্গের বাইরে এসব প্রশ্ন সর্বনেশে

দেশের নিরাপত্তা গেলাসের কেনারায়
উপ্‌চে পড়লে শেষে ?
হতভাগা !
এখনও বেঁধে নাওনি আমাদের তাগা
জানো না ঋণের শর্ত—প্রশ্ন নিষেধ
হিসেবনিকেশের গর্তে পড়েনি পা
আরে বাপু তোমার কতটুকুই বা
মেয়াদ
আমরাই বলে দেব, মেয়াদ
চলবে না, ফরমান দেবে বিশ্ব-আদালত
যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে, কপিরাইট্‌, আমাদের
আপাতত

ঠাকুর্দা : আপাতত ? চিরকাল নয় !

লোকেরা : ওটা বাজার-সমাজের নিয়ম। এই আছে,
এই নেই, আমাদের শুধু বর্তমান কাল
'ফিনান্স-পুঁজির গর্তে কুবেরের বিষয়-আশয় ০
নিজেকে বাঁচাও দেখি আগে মহাশয়
পৃথিবী বাঁচাবে তারপর
দুত্তোর্‌
এই বুড়ো কুমড়োটা কিছুই বোঝে না

[ গান ] : 'এই বুড়ো কুমড়োটা কিছুই বোঝে না
কিস্‌সুনা, কিস্‌সুনা

দুত্তোর্‌
মাথাতে নেই একটাও শব্দুর
হ্যাট্‌, ঘোড়া হ্যাট্‌,
এ ক্যাট ইস্‌ আফ্‌টার আ র‍্যাট্‌,
দুত্তোর্‌
বুড়ো কুমড়োটা শব্দুর…

[ ঠাকুর্দাসহ লোকগুলির প্রস্থান ]

অমল : যাঃ, ঠাকুর্দাকে ওরা নিয়ে গেল
তাঁকে তো বলাই হ'ল না সব কথা
আজকের কথা, কালকের কথা
বলা হল না রবিঠাকুরের অমলের কথা
ডাকঘরের গল্প…
তবে আপনারাই শুনুন
তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উনিশশো বেয়াল্লিশ
চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
[ মিলিটারি মার্চপাস্ট ও গোলার আওয়াজ, 'হেয়্ হিটলার' জয়ধ্বনি ]
তখন, ওয়ারশ'র কাছে, এক অনাথাশ্রমে, দুশোজন
পীড়িত, বিকলাঙ্গ, দুর্বল, অমল বালক
আর তাদের প্রতিপালক এক ডাক্তার
শুনুন, তাদের কথা, তাহাদের কথা
[ মঞ্চে ডাক্তার ও বালকদের প্রবেশ ]

ডাক্তার : আমার প্রিয় পুত্রেরা, খৃষ্টের সন্তান
আজ বড়দিন? আনন্দের দিন, দেব উপহার
গান ও নাটক। তোমরা শুনেছো
রবিঠাকুরের কথা, দক্ষিণ দেশের অধিবাসী
এখনও আছেন বেঁচে, খৃষ্ট নন, নন বুদ্ধ, জরাথুষ্ট্র
নন স্রষ্টা
তিনি আমাদের লোক, সভ্যতার সংকটের কথা
জানিয়েছেন আমাদের, শান্তির ললিত-বাণী
কখন শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, জানিয়েছেন
তবু ফুয়েরারের বিরুদ্ধে আমাদের করারইবা কি,
সে তো আপন প্রতাপে অন্ধ, যুদ্ধের টায়রাইন
কালবৈশাখী
প্রলয়ের কথা জানে, সৃষ্টি বোঝে না
তার সহোদর মুসোলিনি, পেরণ…

১নং বালক : ডাক্তার, আহা, এসব কথার বুনন
আমরা কতটা বা বুঝি! আমাদের অস্তিত্ব কি

কথায় পেয়েছে খুলে ? আমাদের রক্তমাংসনিষ্ঠহরণ
নেই, হিটলার মুর্দাবাদ. শোনাও ডাক্তার, ভক্তির নয়

আয়োগোর গান

ডাক্তার : তোরা তো আমার ভুবন
তোদের অনেকে জর্মন,
সুইস, পোল, ইণ্ডিয়ান
আমাদের আশ্রমের চারপাশ
বস্তিতে বস্তিতে ছেটানো অসংখ্য গরীব ইহুদি…
ছোট ছোট ঘাস
তোদের কি পারবো বাঁচাতে ! তোরা যেন
মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত অমল

২য় বালক : আমরা অমলের কথা শুনতে চাই,
ডাক্তার,
তার ছিল রক্তে ক্যান্সার ?

ডাক্তার : হতে পারে, কিংবা নয়
সেটাই বিস্ময়
বড় কথা সে বন্দী আজীবন
রাজার পিওন
তাকে মুক্তি দিতে পারে নাই

এসো গাই
আমরা সেই অপেরা। ধরো
আমিই হলেম ঠাকুর্দা—অমলের প্রাণ পা, তুমি
অমল, তুমি তুমি কবিরাজ, তুমি সুধা
দইয়ালা কে হবে, তুমি হরকরা
আর আমাদের মিহাসীল

তৃতীয় বালক : কিন্তু ডাকপিওন, রাজার চিঠি
জায়গাটা বড় দুর্বোধ্য, ডাক্তার
কী যে বলতে চেয়েছেন টেগোর।

ডাক্তার : না না, ওসব কথা পরে

রিহার্সাল দিতে দিতে বেরিয়ে আসবে
সব অর্থ ওরে…
[ প্রথম বালকের দিকে তাকিয়ে ] অমল ! তুমি শুয়ে পড়ো, এই তোমার বেড, শুয়ে পড়ো
[ অমল শুয়ে পড়লে তাকে একটা শাদা চাদরে ঢাকা দেওয়া হল, শুধু তার মুখটা রইল বেরিয়ে, সে বারবার মাথা উঁচু করার চেষ্টা করল ]

অমল : একি দম বন্ধ হয়ে আসে কেন
গাছের পাতা হলুদ…
ডাক্তার, ডাক্তার—কবিরাজ, কবিরাজ
[ গায়ের চাদর তুলে দিতে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল ]
না-না, অমলের অভিনয় পারব না
দম আটকে আসে…

ডাক্তার : [ দ্বিতীয় বালককে ]
তুমি, তুমি এসো
শুয়ে পড়ো, তুমিই অমল
[ সে শুয়ে পড়ল, শাদা চাদরটি প্রায় নাক-পর্যন্ত টেনে দিতে ]

দ্বিতীয় বালক : একি দম বন্ধ হয়ে আসছে ডাক্তার
উঃ, আঃ…
[ লাফিয়ে নেমে পড়ল ]
[ তৃতীয় বালকটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা, এ ক্ষেত্রে মূকাভিনয় ]

ডাক্তার : [ হতাশ হয়ে বসে পড়ে ]
তো, তোমরা কেউই শুয়ে থাকতে চাও না
চাইবেই বা কেন, তোমরা তো অমল না, যে বয়সের যা
ছোটাছুটি করবে, খেলবে, দুলবে, ভাঙবে পা
ফের উঠে দাঁড়াবে…

তৃতীয় বালক : না, ঐ রাজার চিঠির ব্যাপারটা, হলে শুনলাম্
রাজি, অমল হতে, বলছি সটান

প্রথম বালক : ডাক্তার !
রাজা কি হের্ হিটলার !
রাজার চিঠির কথা হলে বুক কাঁপে
শুনি ভুতুড়ে আওয়াজ, পাতায় পাতায়
খস্খস্, খস্খস্
সৈন্যরা যেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে
আর আমরা অবশ

ডাক্তার : [ হতাশ হয়ে ]
পাগল, এ রাজা
ফুয়েরার নয়
কখনো নয়
'প্রতীক' কাকে বলে বুঝিস নে
শুনে নে
একটাকে আরেকটা দিয়ে
বোঝানো : প্রতীক।

দ্বিতীয় বালক : তবে রবিঠাকুরের রাজা
অমোঘ মহান মৃত্যু রাজা !
না, আমরা সেখানে যাব না
আমরা বাঁচতে চাই
( কোরাসে ) বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই

ডাক্তার : সে রাজা হিটলার নয়
সে রাজা মৃত্যুঞ্জয়
নমো মৃত্যু, নমো মৃত্যু, নমো মৃত্যু···
[ অর্গানেজের দরজায় করাঘাত ]
কে— কে— ?
[ হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর দুই সৈন্যের প্রবেশ ]

সৈন্যদ্বয় : রাজার চিঠি এনেছি আমরা হে-হে
বলো, হের্ হিটলারের জয়
হে-হে, হের্···
একী ! তোমরা নীরব

বলো ফুয়েরারের জয়

ডাক্তার : ওরা তো কথা বলতে পারে না, সৈন্য
ওদের একটাই দৈন্য
বলতে পারে না : 'হুজুর'

প্রথম সৈন্য : (দাঁত খিঁচিয়ে)
কিন্তু বাইরে থেকে যেন
মনে হচ্ছিল অন্দরে হৈ-হট্টগোল
হুঁ হুঁ, পেয়েছো বুঝকি
জানো আমরা কিভাবে গন্ধ শুঁকি
[নাকে খৎ দেবার মতো লম্বা হয়ে শুয়ে ছুঁচোর গন্ধ শোঁকা]

ডাক্তার : আসলে কি
জানো, সৈন্য !
এটা তো ক্লোক রুম
এখানে মায়ার খেলা
নেই দৈন্য

প্রথম সৈন্য : চোপরও, হারামজাদ
ইহুদি
মুখের পরে করবো থ্যা
না যদি
বলো ফুয়েরারের জয়
হাত-পায়ের নখ করব
ছ্যাদা

দ্বিতীয় সৈন্য : অস্তিকে ইস্তক
ভরে দাও মস্তক
অস্তিকে অস্তি
বস্তিকে স্বস্তি
সেইখানে যাবে
এবং ঘুমাবে
অস্তিকে বস্তি

ডাক্তার : সেখানে আছে ডাকঘরকরা ?
রাস্তায় লস্কর, রাস্তায় ঘোড়া
ছোট কোবরেজ নষ্টের গোড়া
দইয়ালা, সুনয়নী সুধা...
বড় কোবরেজ খুলবে জানালা

প্রথম সৈন্য : আরে ছুৎ, জানলা···

[ অপর সৈন্যটিকে ইঙ্গিত করে ও মুচকি হাসে ]

ছি :, শালা কি বলে : 'জানলা', বাতায়ন
ছিঃ একটা ছিদ্রও নেই

দ্বিতীয় সৈন্য : [ প্রথম সৈন্যকে চোখ টিপে ]
আরে জানলা থাকবে কিরে
গোটাটাই তো ইস্তক
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত

প্রথম সৈন্য : ( সায় দিয়ে )
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত
যাক্‌গে,
তোমাগো গোয়ালে
আছে কত ছেলে
দেখাও রোস্টার

ডাক্তার : থাক্‌গে
ওসব দরকার নেই। সকলের নাম ও বয়স
টুকে নাও :
মোট দুশো জন, প্রত্যেকের বয়স ৭, নাম : 'অমল'

প্রথম সৈন্য : প্রত্যেকের নাম অমল ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, ক্ষতি কি
ব্যাপারটা সহজ হল
যাকেই ডাকো সাড়া পাবে

প্রথম সৈন্য : ও তবে প্রত্যেকেই জু
জুরেয়ার এদের স্মরণ করেছেন
জানি, অমল মানে ইহ—

দি
কিঃ
[ দ্বিতীয় সৈন্যের দিকে তাকিয়ে ]

কি ঠিক্ ?

দ্বিতীয় সৈন্য : [ কাঠ পুতুলের মত নাচতে নাচতে ]

ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্
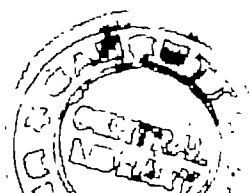
[ দুজন Mein kampf থেকে আওড়াতে থাকে ]

'বলেছেন শোপেনহাওয়ার
ইহুদিরা মিথ্যেবাদী
যাযাবর নয়তো তারা
পরগাছা পরজীবী
ইহুদির নীতি নেই
যা আছে অর্থনীতি
তারা তো সুদখোর
তারা তো বেণিয়ার
সুতরাং জর্মন জাতিকে আজ বাঁচতে হলে তার জাতীয় দেহ থেকে
বিজাতীয় ও বৈদেশিক বীজাণুগুলিকে দূর করতে হবে।'
অতএব, কী বলো, অমল—ইহুদি

ডাক্তার : মূর্খ, মূর্খ তোমরা
কিছুই জানো না 'অমল' একটা নাম
যা প্রপার নেম, ইনোসেন্ট নেম

দ্বিতীয় সৈন্য : আরে বাবা, ইহুদিও একটা নাম

ডাক্তার : হ্যাঁ, ঠিক, ইহুদিও একটা নাম
একটি জাতি তারাও অমল, নিকলঙ্ক, নিরপরাধ
ইহুদিরা তো অমলই...

সৈন্যদ্বয় : হে হে, কেমন ঠেসে ধরেছি
তদন্তে চাপ রাখতে হয়

নিরবধি

দুর্ভাগ্যের রাত পোহালো
কপাল আমাগো কেম্নো

মুরগির ছা
থেকে তো বাছা
অফিসারও বলতে পারি
হাঃ, জালে জুলো মাছ
চিক্ চিক্ চিক্ চিক্ চিক্
হাতে উঠে আয় তাড়াতাড়ি
ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্

[ দুজনের ঘুরে ঘুরে নাচ বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে ]

হল্ট্…
কে যায়? কার গো।
আমরা গেস্টাপো
হল্ট্ ..
সকাল সন্ধ্যে দুপুর
ইহুদি খেঁকো কুকুর
আমরা কিসের গো
ফ্যুয়রের হাপর
দিচ্ছি ফুঁ
আগুনে
হল্ট্…
যুদ্ধকালীন তৎপরতায়
আমরা স্থিতিস্থাপক
দিচ্ছি ফুঁ
আগুনে
হল্ট্…

প্রথম সৈন্য : ডাক্তার। আমরা সবাইকে নিয়ে যাবো

দ্বিতীয় সৈন্য : না ডাক্তারকে দরকার নেই, ও তো ইহুদি নয়

[ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ]

না, মাইন্ডি, তোমাকে
যেতে হবে না

ডাক্তার : কী বলছো বা—পিতা তা
নই, আমি ওদের ঠাকুর্দা—গ্র্যাণ্ড-পা তো
ওদের আমি ক্রৌঞ্চ দ্বীপে
নিয়ে যাবো। সে ভারি আশ্চর্য জায়গা
পাখিদের দেশ—সেখানে মানুষ নেই
কেউ কথা কয় না, চলে না, তারা
গান গায় আর উড়ে উড়ে যায়।

প্রথম সৈন্য : তবে তো ভালই হলো। আমাদের দেশও
ওরকম। সেখানে মানুষ নেই, বাঘুদের দেশ
লাল-চোখ, চেতনায় ঝুলে থাকে আট-প্রহর
তুমি কি দেখনি সামরিক কোর্তায়
হ্যাভারস্যাকের কাঁধেও তা শোভা পায়
এই দেখো, আমাদের পোষাকে
সেই চিহ্ন, অনপনয়নীয়

ডাক্তার : প্রিয়,
তোমরা তবে নীল পাহাড়ে থাকো ?

দ্বিতীয় সৈন্য : [ কিছুটা থতোমতো খেয়ে ]
হ্যাঁ, হ্যাঁ, নীল পাহাড়েই তো
রাজধানী
Hitler is atop
'On top
With gems aflame
Underneath—
Plain folk
with their bottoms bare'

বালকেরা : আমাদের যেতে দাও, ডাক্তার
আমরা নীল পাহাড়ে যাবো, সারি-সারি
পাহাড়, মধু, বৌ-কথা-কও, বনরাজি
উঃ, কী দারুণ রোমাঞ্চ···

প্রথম সৈন্য : সারি-সারি সবুজ : ১, ২, ৩, ৪···

অজস্র, অগণন, আর্ত পাখিদের শশব্দ
কম্পহীন শীতল অগ্ন্যুৎপাত, বাষ্প উদ্গীরন
দিগন্তের ক্লিপ ছিঁড়ে ঘূর্ণি হাওয়া হা-হা
ঢুকে যায় কামানের নলে, ট্যাঙ্কের বলি-রেখা
বুঝে নেয় আকাশের চিল, বালি ওড়ে
সেখানে তিতিক্ষা নেই, ভালবাসা নেই, লণ্ঠনের
আলো পর্যন্ত নেই, নেই ঘৃণা, সেখানে
কোন ভার নেই, মানুষের, সে এক
হাল্কা দেশ, আছে গলিত চর্বির ধোঁয়া

দ্বিতীয় সৈন্য : হেঁইয়ো হো

কথায় ঘরে কুলুপ টানো হো
নয়তো গো
ভেস্তে যাবে জারিজুরি
হিড়িবাবার ফুরেয়ারি
কথায় ঘরে কুলুপ টানো হো

[ গম্ভীর স্বরে ]

এই নাটকে তোমার যোড়ল সাজার কথা নই
ফকির হতে চাইছো কেন সই
তোমার এই অসামান্য ভুলের জন্য
ডাক্তারকে আর ছাড়া যাবে না দেখছি···
কথায় ঘরে কুলুপ টানো হো
হেঁইয়ো হো ··

প্রথম বালক : কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

ঠাকুর্দা ! দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

ডাক্তার : অন্ধ

আমি অন্ধ
পেছনের দোর বন্ধ

প্রথম বালক : আমাকে লাইনে দাঁড় করানো হলো

সামনে অমল, পেছনে অমল

বাইরে অমল, ভেতরে অমল
এখন কি প্রার্থনায় মুহূর্ত…
শরীরে আমার এক চিলতে রোদ নেই
সব চর্বি, চর্বি, চর্বি আর চর্বির দই
ভাণ্ডার। সূর্যের মত, বেগুনি।
কে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছো, শুনি
আমার পায়ে শেকল হাতে শেকল
কোবরেজ, আমি কেন এত দুর্বল
এতো সৈন্য, এতো সৈন্য কেন?

দ্বিতীয় সৈন্য: আমরা নিরাপত্তা
বাঙ্কারভিলের কুত্তা
ফসফরাস চোখে তাকিয়ে
সদাজাগ্রত বাক্সার
যেন একচুল নড়তে না পারো
পাচো
অন্ধকারেও তো স্পষ্ট
সাদা চর্বি, গলে গলে গলে
স্রোতের মতো
নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে
নষ্ট
কিছু হচ্ছে, হোক্, তৈরি হবে
প্যারাফিন, কেক্, প্যাস্ট্রি
সৈন্যরা তাঁবুতে জ্বালবে আলো
হুমড়ি খেয়ে পড়বে লাঞ্চ-টেবিলে
মাংসে লেপ্টে থাকবে লাল পিঁপড়ের দল
সাদা খুঁদ মুখে দৌড়ে যাবে অলপাই রঙের
পিঁপড়ে। চারদিকে ব্যস্ততা, যেন একটা বড়ো
জায়গা জুড়ে চলছে পুচিও, হিটলারের আর্কিপেলাগো

প্রথম সৈন্য: [ দ্বিতীয় সৈন্যকে ]
একটা কথা, Top Secret, বলি বলি করেও…

তবু চুপি চুপি বলি, আমি তাঁকে দেখেছি

ডাক্তার : [ পাগলের মতো গান ]

'দেখেছি পারের প্রান্তে তোমায় দেখেছি…'

প্রথম সৈন্য : তখন তিনি ফ্যুয়েরার হননি

শুধু বেঁটে নন, রোগাও ছিলেন খানিকটা

১০টা-৫টা অফিস বাবু আর কি।

সর্বদা ক্লান্তি জুড়ে থাকতো মুখাবয়বে

অনেকটা সবের মতো ঈষৎ বাদামি

কোন কিছুতেই মন দিতে পারতেন না

পড়া ধরলে হাঁ করে থাকতেন সর্বক্ষণ

বাবা মারা গিয়েছিল তো, তখন সবে ১৪, বেচারা!

দ্বিতীয় সৈন্য : তুমি বলছোটা কি, হিটলার বেচারা!

প্রথম সৈন্য : সেই থেকে ক্লান্ত, মাকে ভালবাসত খুব

মা তাকে আগলে আগলে রাখতেন, যেন

নীড়ের ডিমটি, চুল আঁচড়ে দিতেন, এমন কি

খাইয়ে পর্যন্ত, মার ক্যান্সার হলে

এক ইহুদি ডাক্তার সেবা করে অক্লান্ত

ফ্যুয়েরার নাকি মরে যাবে তবু ভুলবে না।

সেই ডাক্তারের সমুখে ফ্যুয়েরার, আমাদের

ফ্যুয়েরার হাঁটু ভেঙে…

[ গলা যেন ভেঙে গেল ]

এটা সবাই দেখেছে, মাইরি বলছি, সেই

ইহুদি ডাক্তার…

দ্বিতীয় সৈন্য : [ চীৎকার করে ]

Judah Verrecke

Judah Verrecke

ইহুদি খতম করো

ইহুদি খতম করো

প্রথম সৈন্য : [ একই সুরে ]

Judah Verrecke

খতম করো ইহুদি

[ অন্ত সুরে ]

জানো, আজকের খবর

দ্বিতীয় সৈন্য : সুখবর না কুখবর

প্রথম সৈন্য : অনুমান কর

আর না জানতো যদি

এ বাড়িতে তোমার যান গেছে

দ্বিতীয় সৈন্য : [ একটু ভেবে ]

ফ্যুয়েরারের পেট খারাপ হয়েছে

প্রথম সৈন্য : দূর বোকা, হিপোপটেমাস

ওতো লেগে আছে বারোমাস

শোন্ তবে

ফ্যুয়েরারের সিদ্ধান্ত

সারা য়ুরোপে

পশ্চিমে পূবে

হবে চিরন্তী-উল্লাস

উল্লাস

একটাই, সব ইহুদি ব্যাটাকে বের করা হবে

খুঁজে, খুঁজে উর্দ্ধতন চতুর্দশ বা চারপুরুষ

হলোকাস্ট

উহ-হু কী মজা, উলু-লু কী মজা

কত কাজ

কত কাজ

দ্বিতীয় সৈন্য : [ খবর-কাগজ বের করতে করতে ]

আজকের 'দাস রাইখ' ( Das Reich )···

ফ্যুয়েরার বলেছেন আইজ্যা :

'If] International Finance Jewry once more succeeded in driving the peoples into a world war, the result would not be bolshevizing of the world and thereby the victory of the jews, but the destruction of the Jewish race in Europe.

জুয়ের কিনারা পুঁজি
মেরে-কেটে-গলি-খুঁজি
বিশ্বের মানুষকে
কেন ঠেলেছে যুদ্ধে
বলশেভিজম্
বা জায়োনিজম্
কোনটা জিতবে না
ইউরোপে ঐ জাতি
করবোই করবো খতম
বক্ বক্ বকম্ বকম্
[ বালকেরা চঞ্চল হয়ে উঠলে ]
এই তোরা নড়ছিস কেন, লাইন ঠিক রাখ্
এতো সঙ্গীত নয়, নয় বেঠোফেন, বাখ্
লাইন ঠিক রাখ্
লাইন ঠিক রাখ্

ডাক্তার : [ কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ স্বরে ]
যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা

প্রথম সৈন্য : আর ওড়ার উপায় নেই হে ডাক্তার
এই কথাটি জেনে রেখো সার
ডানা দিয়েছি কেটে
এখন হেঁটে হেঁটে
যাবে লক্ষ্যে
ভাগ্যি রক্ষে

পালিয়ে যায়নি একটা ছোঁড়াও
[ বালকদের নিয়ন্ত্রণ করতে করতে ]
এই একেক করে ঢুকে পড়্ তোরা
একেক করে, একেক করে ছোঁড়া
ভেতরে যাবার ডাকহরকরা
এনেছে চিঠি

বালকেরা : কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন
কোবরেজ, জানলা খুলে দাও
ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা ··

ডাক্তার : একটাও জানলা নয় খোলা
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
... ... ... ...
এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
[ গ্যাস-চেম্বার চালু হবার শব্দ ]
... ... ... ...
ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া
খুলে দাও, খুলে দাও
কে আছো, জানলা খোলো
... ... ... ...

সৈন্যদয় : আজ বড় শীত পড়েছে, ঠক্ ঠক্ ঠক্
আজ খুব শীত, নেই যুদ্ধের সংকট
[ কাঠ-পুতুলের মত তারা নাচতে নাচতে একবার সরে যায়, আবার দুজনে একসঙ্গে জুড়ে যায়, একই তালে নাচে ]
... ... ... ...

অমল : এভাবেই সেদিন, ১৯৪২-এ ২০১ জন প্রাণ দেয়।
তবে কি আমার কথা ফুরুলো, নটে গাছটি 'মুড়োল' ?
মোটেও তা নয়

একটাই ভয়
হিরোশিমা-নাগাসাকি, চের্নোবিল, নিউক্লিয়ার
ওয়েস্ট, কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার
হিটলারেরর মতন ভয়ায়
এখনও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে
আরও ধূর্ত, ফন্দীবাজ, অর্থ শিকারী
আরও শঠ, সাবধানী
আজকের নাটক এদের নিয়েই
... ... ... ...
হ্যাঁ, আমি অমল
রাজার চিঠির দিকে
জনতার পানে
তাকিয়ে আছি
... ... ...
দেখলেনই তো আপনাদের সমুখ দিয়ে
ঠাকুর্দাকে ধরে নিয়ে গেল ওরা
জীবনের দেরাজের চকচকে চাবিটা
হ্যাণ্ডওভার করুন
সেরকমই কথা, চুক্তি
এখন মৃত্যুর ওয়ার্ম-আপ্
বালিশের পাশে তার নীল ঠোঁট
উদ্ধত চুম্বন
গোটা পৃথিবী গ্যাস-চেম্বার
[ হঠাৎ চীৎকার ]
ঠাকুর্দা—আ-আ-আ
বড় কোবরেজ···
[ নেপথ্যে বুশের বক্তৃতা ]
On 'Earth Summit'

## ১৪০০ বঙ্গাব্দের জন্যে

মণীন্দ্র রায়

এখনো-যে বেঁচে আছি
সে-কি সৌভাগ্য অথবা শাস্তি,
বোঝা দায়। এ এক কুহেলীময়
জটিল সময়।

পৃথিবীর আবর্তনে উঠে আসে
নতুন শতক।
দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গার পর
ভাই-ভাই আলো-অন্ধকার ফেলে
পরিযায়ী পাখি পলাতক।
কাকে ভালোবাসা দেবে?
সবারই বুকের দোরে তালা।
তবু তমসায় ডিবে জ্বেলে
বসে আছ কার প্রতীক্ষায়?

অথবা এখনি জন্ম নিয়ে
হাটিহাটি দামাল শিশুরা দোরে?
একদিন যারা
সময়ের কালো স্লেট মুছে
নতুন অক্ষরে দেবে জয়?

আহা, যেন আসে সেই দিন!
শোধ হয় আমাদের বিষয়ক
হিংস্রমত্তা জিঘাংসার ঋণ।

# ১৩০০-র কবিকে, ১৪০০ সালে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

একশো বছর তোমার কবিতা তোমার কবিতা
কবিতা তোমার একশো বছর ঝড়ঝাপ্‌টায় পাখির বাসাটি
মনের শরীরে পালক-বোলানো আরাম
তোমার কবিতা নববসন্ত স্মিত আনন্দ
নাকি চঞ্চল পুলক
ফুলরেণুমাখা কিংবা দমকা বাতাসের শ্বাস
নানা রঙে-রঙ করা যৌবন কবিতা তোমার।
সময়ের মরু হা-হা বালুঝড়ে হলে উন্মাদ
তোমার কবিতা সার্থবাহ-র সন্ধানী উট
খুঁজে পায় ফুল রাগ-অনুরাগ খানিক ভ্রমরগুঞ্জন গান
খানিকটা যেন হারানো মরূদ্যান-ই…
একশো বছর চোখে আমাদের তোমার মরূদ্যান।

সাল ১৪০০। আজ আমাদের বারুদগন্ধী আকাশ
অসহ্য এক সম্ভাবনায় অস্তিত্ব-ই প্রশ্ন
ছিট্‌কে উঠছে সময় খণ্ড খণ্ড টুকরো হাজার হাজার
হাত-পা-মুণ্ড-অস্ত্র-শিশু-সাধ-আহ্লাদ টুকরো
ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড ছিন্নছিন্ন
অনেক অনেক সুখদুঃখের আশা-নিরাশার বুনন
এখন আমাদের জীবনের খুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে প্রলয়
প্রলয় বিস্ফোরণ
ওয়াক্ ওয়াক্…উগ্‌রে তুলতে চাইছে ভেতরটাকে
ওয়াক্ ওয়াক্ বমির শব্দে জমা ভালোবাসা আস্থা-ভরসা জমাট
গা-গুলনো কালো বাসি রক্তের ধারা, চট্‌চটে, পুঁজে
উথলে উঠছে, সঙ্গে চাঙড় পাশের পচনকণা
আত্মগ্লানি আত্মহননে উৎকট লোভে মেশাল বিকট গন্ধে।

পারবে কি তুমি মোর মস্তকেও একটু ফুলের সুবাস একটু
দক্ষিণ হাওয়া হতে

একটু খুশির ছ-ফোঁটা চোখের জল মিশে দূর আকাশ
একশো বছর পরে বিশল্যকরণী কি তুমি করিতার ?—

১৩০০-র কবি, প্রাণ ফিরে দিতে পার ১৪০০ সালকে।

## চরৈবেতিতে, কবে

**সিদ্ধেশ্বর সেন**

স্বপ্নে নয়, স্বজনেই তাকে জানা—
তুমিও আছ,
তাই, আমিও কাছে

তোমার যাওয়া, কালান্তরের ডানায়
বৈশাখী দিন,
শতক উজিয়ে বাঁচে

লিখছে তার নতুন আশায় সাক্ষী।
তুমি কী মেলাবে দৃষ্টি
এই পুনর্নবের উৎসবে

আমার যা আছে, শতাব্দী থেকে শতাব্দী
রৌদ্রছায়ায়, ছড়িয়ে চলেছি
চরৈবেতিতে কবে…

## উটপাখিদের উদ্দেশে

ধনঞ্জয় দাশ

[ কমরেড গোলাম কুদ্দুস সমীপেষু ]

সেদিন সন্ধ্যায়
বিশ্বব্যাপী সংকটের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়
শিবনেত্র হয়ে মনে হলো :
আমরা সবাই যেন উটপাখি
বালুর স্তূপে গুঁজে ঠোঁট মুখ চোখ
মরুঝড় এড়াতে চাইছি
আর যেন হেঁকে বলছি,
ধূ ধূ এই মরুভূমি নিশ্চিত ফোটাতে পারবে
রক্তবর্ণ গোলাপ অশোক।

এইসব জনেটুনে রাগে দুঃখে
নিজেরই মাথার চুল দুই হাতে ছিঁড়ে
কিছু একটা কথার জন্যে
আমি যখন সত্যিই উসখুস
তখন আমাকে আপনি
চুপি চুপি কোন কথা বলেছিলেন
তা কি মনে পড়ে, কমরেড কুদ্দুস ?

আপনিই তো বলেছিলেন :
শান্ত হোন, আর কিছুকাল শুধু
দাঁতে দাঁত চেপে একটু অপেক্ষা করুন।
দেখছেন না, এখন চরাচর জুড়ে
খোলামেলা হাওয়ার শরীরা
ছন্দময় কী মোহন বিভ্রাসে খেলা করছে
তাকে হিমালয় পার হতে দি'ন
আমরাও শোধ করব অতীতের সব গ্লানি, ঋণ।

অথচ দেখুন,
সেই খোলামেলা হাওয়ারা কখন
বন্ধ হলো, উপড়ে ফেললো বার্লিন প্রাচীর
ধ্বংসের দূত হয়ে গুঁড়ো করল উপাস্য মন্দির।
তার কার্য ও কারণবিধি ঠিকঠাক না বুঝেই
আমরা স্বভাবধর্মে উটপাখিদের মতো
সুসজ্জিত ফ্ল্যাটের গোপন অন্দরে মুখ গুঁজে
বুক চাপড়ে কাঁদছি কেউ
কেউ বকছি বিশুদ্ধ প্রলাপ,
ধ্যানমগ্ন চেতনায়
ক্রমশ ছোবল মারছে যেন এক বিষধর সাপ।

আপনার হিম্মত যদি সত্যিই থাকে
তবে বলি কমরেড শুনুন,
আমাকে থামাবার আগে
আপনি একটু ঝুঁকি নিয়ে
বুড়োধাড়িদের কান্না আর প্রলাপ থামান।
তারপর উটপাখিদের মাথাগুলো তাক করে
দোহাই আপনার,
দয়া করে এক্ষুণি ছুঁড়ুন বাবান।

## ধারাবাহিক

**তরুণ সান্যাল**

দুঃখ বড়ো ধারাবাহিক সুখ তেমন নয়
কিন্তু ধারাবাহিক শব্দ ধারাবাহিক হয়
ধ-এর পরে আ-কার এবং এমন পরম্পরা
ব্যঞ্জনে বা স্বরধ্বনির মিলন-দড়িদড়া
রূপোর ঝাপটা নোলোক টায়রা নূপুর কাঁদি নথ

শতেক খোয়ার গতরখাকীর শতক বোশেখ চোত
গোরুর হাম্বা সন্ধ্যা-বেলা মাঠের মুখা ঘাসে
ধারাবাহিক অন্ধকার গ্রাম ঝাঁপিয়ে আসে

চমৎকার তাত্ত্বিকের তূরীয়-ভরা তীর
চমৎকার গড়গড় দুধ মেরে বা ক্ষীর
চমৎকার তরুণীটির কথার কারুকাজ
চমৎকার মেট্রো ধাড়ি বাবুবিবির নাচ
ঘরের পিঠে ব্যঞ্জনের রং-বাজানো তালি
ধারাবাহিক চরে হড়কে হঠাৎ চোরাবালি
জাতে মাতাল তালেও ঠিক পঞ্চায়েতী মাসে
ধারাবাহিক আসল আসল তাবৎ হি হি হাসে

মানুষ যায় মানুষ যায় টেম্পো পায়ে হেঁটে
রং চড়াবো যেমন পাবো একমেটে দোমেটে
শিশির পায়ে কাদা ছুঁড়ছে বড় বাড়ির গোঁয়ার
পায়ের নখের যুগ্যি না-হোক হাতীর হেটো গওয়ার
রং পড়েছে চিপি চিপি বাতিল ফোটোগ্রাফে
বৃষ্টি বাদল টিপি টিপি জল মাপে ছল মাপে
১৪০০ সাল খড়কাঠামোর নানা মুখের ছাঁচ
একটি ছবি যেমন তেমন বাকিটা ছৌ-নাচ
কেমন মুখোশ বা মালবাঁশে সেজেছে ছাঁচতলা
ধারাবাহিক কথার কথা এবং বেলং বলা।

## নির্ধারণ

**সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত**

আমার বিপ্লব শেষ, শস্যের নিশান নিয়ে
এখন করছে খেলা কানীন কুকুর। এতদিন দুঃখের দুদিকে
দুহাত ছড়িয়ে তুমি কি হতে চেয়েছ?

মেষপালকের বাণী কেন বই হয়েই মরে গেল খ্রীষ্টান সকালে,
তোদের প্রথম রুটি না ছুঁয়েই মন্ত্র পড়া শেষ করে যারা
বলেছে ‘আমেন,’
তারা তো নীলের ভক্ত, যমকেও নতুন নক্ষত্র হতে
কোটিমুদ্রায় জিরো-আওয়ারে আকাশে পাঠায়।
আমি কি সঠিক জেনেও বলবো না
একটি সৌরযান নির্মাণ থামালে
গড়া যায় চল্লিশ নতুন স্কুল, হাসপাতাল হতে পারতো দশ,
অথচ তো উৎসাহ উৎসব থেকে শান্তির কপোত
দশলক্ষ উড়িয়ে আমি অভিধান থেকে
‘যুদ্ধ’ শব্দটাকে পাঠাতে পারিনি কোন স্থায়ী বনবাসে।
এত বড়ো মনসিজ শ্রম, মনীষার অনিবারণীয় শ্রম
বিত্তবাবু, বুদ্ধবাবা, মহম্মদ, ১০৮ শংকরাচার্যের
অর্বুদ অক্ষরতাত্ত্বা নিপাতনসিদ্ধ সব ক্রম
—মানুষ এখনো তবু থেকে গেল মূল নিরক্ষর।
আমি শব্দ ছাড়া আর কিছুই পারি না বলে
শান্তি আর ভালবাসা একাক্ষরে করেছিলাম জড়ো।
তাই কি এখন ভালবাসা নিঃশ্বাসের কাছে এসে
কেড়ে নেয় আকাঙ্ক্ষী কলম
মৃত্যু সৌখিন হয় ট্রিগারের নির্বোধ উল্লাসে,
আমি ক্রমাগত শুধু বারুদের ধ্বনির ধমক শুনে যাই
অথচ আমার কান শিশুর হাসিতে ছিল মূল নির্ধারিত।

ভালবেসে লাভ নেই, কবিতা কি শুধু
ক্ষতির কংকালস্তূপে একাকী নিশান।
আমার বিপ্লব শেষ, শব্দের সমাপ্ত পুণ্যে
অলাতচক্র রেখে গেছে মাতাল কুকুর।

## আবার নামতে হবে

পূর্ণেন্দু পত্রী

আলো নিভিয়ে দেওয়ার হুমকিতে
খাঁ খাঁ করছে কালো কুচকুচে রাত।
কথাকলি আর আমান
হৃদয়ের উপরেই আক্রোশে চকচক করছে
ত্রিশূলের দাঁত।

আবার নামতে হবে ষাঁড়ের হাটায়।

জটা খুলছে কাপালিক,
ক্রমশ খড়েগর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
নামাবলীতে লুকনো হাত।
শান্তিকল্যাণের আকাশে
যে কোনো মুহূর্তে চিৎকার করে উঠবে
রক্তের ফিনকি।

আবার নামতে হবে ষাঁড়ের হাটায়।

আজীবনের সহোদর
এসো পাশাপাশি দাঁড়াই।
ভাঙা স্বাপত্যের ধুলো দিয়েই
এসো কপালে এঁকে দিই
অপরাজয়ের তিলক।

আবার নামতে হবে ষাঁড়ের হাটায়।

## যত দেরি হোক, শেষ নয়

**অমিতাভ দাশগুপ্ত**

তোমাকে বুঝতে খুব দেরি হল। খুব দেরি হল?
বড় দীর্ঘবেলা বড় ভুল খেলা শেখাতে শেখাতে
যেখানে এনেছো টেনে, তা শ্মশানডাঙা।
পাখ্‌সাটে নেমে আসে মাংসভুক-পাখি—
ভুল ভেবে ভয়ে মুখ ঢাকি।

আসা আর যাওয়া—
দুপারের নৌকো তুমি পুড়িয়ে দিয়েছো।
একসঙ্গে জ্বালিয়েছো মোমের দু-মুখ
লোভ, ধূর্ত কাপালিক,
অঞ্জলির ছলে
আমার দুহাতে
আমারই নৃমুণ্ড চাও শিরহীন মৃত্যুর আহার—
বলিবাদ্যে দাবি করো পূজার প্রথম হাহাকার।

ক-গ্যালন রক্ত থেকে কতটুকু খুন হয়
জানো, তুমি জানো?
জানো, কাকে বলে রক্তবীজ?
যত প্রতারণা করো, আমি নই প্রত্যয়:খনিজ;
চাবুকে চাবুকে
যতই জর্জর করো
দশদিক ঢেকে দাও মারী ও মড়কে,
তবু দেখে নাও—
পিঠে জন্মচিহ্ন নেই, ধারণ করেছি সব বুকে।

শ্মশানে শ্মশানে আজ যতই বাজাও
গম্ভীর সানাই,
জেনো লোভ, ধূর্ত কাপালিক,
নতুন জন্মের কামে আমি মৃত্যুঞ্জয়া-কেই চাই।

## মনস্কতা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

তুমি কি কিছু বলছো,
আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না।
সকাল থেকে পাখি দেখছি।
ভিতরের দিকে অগ্রগণ্য নূপুরগুলি যখন বেজে উঠলো—
তখন থেকে।
আমার দূরবীণ নেই
দরকার হয় না।

কাল সারারাত ঘন কালো বৃষ্টি ছিলো,
সাপের চর্বি জমা প্রদীপ ছিলো,
মশারির দোলনায় মেতে ওঠা বিদ্যুতের ঝুলন ছিলো,
ঘরের মধ্যে ঘর ছিলো,
তুমি ছিলে না।

কাল সারারাত জুঁই ও জোনাকির নির্ধারিত খেলা ভেঙে
যে শিহরণ আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো সিন্ধুপারে—
সেই নিরাবরণ উত্থানের আড়ালে গণলোক-দহন-করা ডাক ছিলো,
সেই নম্রিত শিকারীর লক্ষ্যভেদে পিনাকমন্ত্রিত মুহূর্তটির ভিতরে
বিজড়িত আয়োজন ছিলো, কিন্তু
তুমি ছিলে না।

আজ ভোরে অরণ্যবণিতার অনুরক্ত পত্র লেখায়,
প্রগলভ চুম্বনে
বেরিয়ে পড়েছি খাঁচা থেকে,
বারবার নিজেকে দেখছি।
প্রখর কর্ষণরশ্মিতে সমস্ত বিলশিল বিনোদন ভেদ করে
ফুটে উঠছে মাদকতাহীন তটিনীরেখা,
গিরিনন্দিনীর লাবণ্য-চুরি-করা সেই উদ্বৃত্ত উপাসনার দিকে

যেই হৃৎপিণ্ড পেতেছি—
হাতে এসে পড়লো অস্তমিত চন্দ্রকিশোরের গানের খাতা—
পাতার পর পাতায় শুধু আগুনের অক্ষর।

তুমি কি আমাকে কিছু বলছো,
কিন্তু আমি যে…

## সাঁকো রচনা জিন্দাবাদ

**শুভ বসু**

'গন্ধারিডি' এই নামে ওরা ডেকেছিলো, মনে পড়ে,
আমাদের চাল যখন তেড়িয়া প্রতিরোধ দিয়েছিলো
ভূমধ্যসাগর থেকে জয়ের উল্লাসে ভেসে আসা
অজেয় পরাক্রান্ত ও পবিত্র বিশ্বজয়ীদের ?

তখন এখানে টিলায় টিলায় সমস্ত শবর ডোম-ডোমনীর
মাদলে মাদলে প্রচণ্ড নাচ শিকার মরশুমে।
গাঙ থেকে গাঙে বয়ে যেত আদি ভাটিয়ালি গান।

উত্তর থেকে দুর্গম পথে এসে উদ্ধত বৈদিক
সংকোচে ভয়ে এড়িয়ে আবার ফিরে চলে যেত। নৌকায়
শত সায়রায় মাস্তুল যেত তরঙ্গগুলি গুঁড়িয়ে, দিগন্তে
খুঁজে ফিরে পেতে বন্ধুর হাত মোঙ্গল-পীত, মহাযান
ব্রতকথায় বেঁধে নিতে সেই সুদূর প্রাচ্য, অনায়াস
পেরিয়ে যেতাম নিষিদ্ধ দেশ, দুর্গম পথ, কঠিন চড়াই, কান্তার।

মনে পড়ে সেই হরিকেল সমতটের ধীবর-কন্যার মুখে
শুনতে সাওতি চম্পার গান
ছুটে এসেছিল পক্ষীরাজের পিঠে টগবগ কোটাল উজির রাজার কুমারই
মনে পড়ে সেই মুক্ত স্বাধীন আয়না দিয়ে ঘেরা দিনগুলি
ব্রত-পাঁচালিতে মমতাপ্রধান জীবনের স্বাদে উদ্বেল হলে
এয়োতিরা দলে দলে সেই কথা আকাশে ঘোষণা করত জোকারে
শঙ্খধ্বনিতে ?

সেই জোয়ারের স্মৃতি কোনোখানে ধরা নেই, কোনো নিভৃতে ?
সেসব জোয়ারই মুখর করেছে প্রেরণায়, আমাদের
হাজার হাজার বছরে স্বরাট উদ্ধত প্রতিবাদ।

মনে পড়ে, মহাখল পরাগলের আসরে
মহাভারতের বাদলা পাঁচালি শোনাবেন সঞ্জয়,
সেই আহ্বানে এসে জুটেছেন মনসবদার দীর্ঘ পাঠান, টুলো পণ্ডিত.
আচারে-বিচারে নিজেকে আপাদ মস্তক বেঁধে-ফেলা
ছান্দোগ্য ও শতপথে প্রায় অষ্টপ্রহর মগ্ন
উন্নতনাসা, স্বর্ণাভি গৌর, শুভ্র রক্তকণিকার গর্বের
শুচিতাপাগল শুদ্ধকুলীন কনৌজ ব্রাহ্মণ।

বাংলা আসরে বিজয়ী পাঠান ও বিজিত ব্রাহ্মণে
বিনিময় করে নিয়েছে স্নিগ্ধ সমমতা বিপুবিস্তৃত।
তোলা যায় কি, কত প্রবাহের কত রক্তের পলি
ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের রক্তে, শরীরে, হৃদয়ে, চেতনায় ?

জাগনে সজনে কতকাল এই ঊর্মি এবং শিলায় কঠিন শাসনে
বহীশময় আমরা রচনা করেছি অশেষ সাঁকো।

আজ পশ্চিমে গৈরিক সাজে যখন রাহুটি প্রতাপে লোলুপ, হিংস্র
মুদ্গর আর অস্ত্র উচিয়ে ভাঙতে চাইছে পৃথিবীর শেষ সেতুও
সেই দুর্দিনে কেনই ধূসর সাগরে পাহাড়ে ঘেরা এ সবুজ মাটিতে
গোপনে চর্চা করেছি অন্ত্য আরেক সাধনা
ডোম-ডোমনি ও শবর-চাঁড়াল—আমরা,
ভাটিয়ালি গাওয়া মাঝি ও মাল্লা আমরা,
ব্যজমা-ব্যজমীর মুখের গোপন খবরে পরাক্রান্ত আমরা
সরহ, কুক্কুরু, কাহ্নপাদের প্রাজ্ঞ আশিসে নির্ভয়,
হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ সাঁকো
নির্মাণ, আর পারাপার করে বেঁচে থাকবার মন্ত্র।

ধ্বংসতাণ্ডবে যখন সূর্যেও তমসা নেমে আসে
তখন নদীনালা এবং খালেবিলে, গোপন সাঁকোগুলি

নতুন ধ্বনি তুলে বাঁধুক খোঁচাই
এবং রুখে দিক গেরুয়া স্পর্ধার হিংস্র তাণ্ডব।

যাতে বয়েস্রোতে অটুট থাক সাঁকো-বাঁধার তাটিয়ালি,
মিলনস্বপ্নের গাবকে আত্মারা আকাশ ছেয়ে দিক, যেন দোয়েল।

## আত্মকাহিনী

**মঞ্জুরেশ চক্রবর্তী**

ঘন নীল ধোঁয়া হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে অন্ধকার ঢুকে পড়ে ঘরে।
গভীর গভীরতর যন্ত্রণায় চরিত্রের অরূপ শিকড়ে
টান লাগে, অহংকারে ব্যক্তিগত হাহাকার যায় মিশে যায়
নির্বেদ-লাবণ্য থেকে স্খলনের গূঢ় যন্ত্রণায়,
সে তবু তেমনই থাকে
অচঞ্চল আমার নিদ্রার বাঁকে বাঁকে।

আমি বড় অকারণে সুদীর্ঘ ঘুমোই।
কোথায় মায়াবি-আলো হ্যারিকেন—বাস্তবতা—আবির্ভাব কই!
ঠিক যেন প্রখর আলোতে ধরা পড়ে গেছে ছদ্মবেশ, পাপ,
অথবা হাতের ছাপ
অথবা হাতের লেখা যেন খুব স্পষ্ট গেছে চেনা,
যেন আর কোনোদিন তেমন সম্পূর্ণ একা কাছে ডাকবে না
ছেলেবেলা,
ছাদের নির্জনে সেই একা-একা রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা।

এসো, পরিত্রাণ, এসো, খুলে দাও অটল অর্গল।
এই যে গোলকধাঁধা, আত্মপ্রতারণা, এই ছল,
এই অভিশাপ, মায়া তুলে নাও।
আমাকে জাগাও।
এসো, পরিত্রাণ,
গান,
এসো সঙ্গে, যৌথতায়, এসো, ভালোবাসা।
এসো প্রাণে, চেতনায়, আকস্মিক ব্যবহারে, এসো, মাতৃভাষা।

# আমাদের নাট্যচর্চা ঃ হিসাবী গৃহস্থালি

চন্দন সেন

বিষাদ, বিচ্ছেদ আর প্রবল সন্ত্রাসের এক সার্বভৌম বিশ্ব পরিমণ্ডল রচনা করে এবং সাত দশকের বেশি সময় ধরে দুনিয়ার অজস্র মানুষের মনে আশা-ভরসা জাগানো একটা সমাজ-ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় তথা মহাভাঙনের স্পষ্ট আভাস দিয়ে আশির অস্থির দশকটি যখন বিদায় নিল, পূর্ব গোলার্ধের এই নাতিশীতোষ্ণ ভূখণ্ডে, আমরা নাট্যকর্মীরা, তখন উটপাখি-সুলভ নির্লিপ্তি আর মধ্যবিত্ত-সুলভ আত্মনিমগ্নতায় একটু মাখন-টোস্ট আর অমলেট-চা দিয়ে টিফিন করার ফিকির খুঁজছি। নব্বই-এর সূচনাতে তাই সারা পৃথিবী জুড়ে যত অনিশ্চয়তা অস্থিরতাই থাক না কেন, আমাদের থিয়েটার কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে একটু সুখের মুখ দেখছে। নিন্দুকের নিন্দা কিংবা ঈর্ষাদগ্ধের ঈর্ষায় কোনো লাভ নেই। কারণ, বহুদিন ধরে বহু রাস্তায় ঘোরাফেরা করার শেষে এতদিনে একটু থিতু হওয়া, একটু ভরসা পাওয়ার মতো অনুকূল পরিবেশ আমরা নাগালে পেয়েছি। পঞ্চাশের আগে থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত আমাদের থিয়েটার যে তিনজন অতিকায় প্রতিভার সক্রিয়তায় আর উদ্দীপনায় আলোড়িত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শম্ভু মিত্র বহুদিন আগেই স্বেচ্ছায় অবসৃত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত এবং উৎপল দত্ত দাপটে বহুবিচিত্র সৃজন-সক্রিয়তা দেখাবার পর এখন প্রাকৃতিক নিয়মে সেই শরীর আর মনের দিক থেকে অবসন্ন। এই তিন "দৈত্য-সদৃশ" নাট্য-ব্যক্তিত্বের সমকালে ও একটু পরে যাঁরা কাজে নেমেছেন তাঁরাও সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রযোজনায় নতুনত্ব অথবা অভিনয়ে গভীরতা আনা কিংবা ভাবনাচিন্তা আর প্রয়োগ-কৌশলের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাধারার সঞ্চালন ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁরা খুব বড় ধরনের কোনো সফলতা পান নি। সফল না হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ঐ তিন অতিকায় ব্যক্তিত্বের প্রভাব নাট্যরসিকদের হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে তাঁদের অনুজ সহকর্মী ও পরিচালকদের কাজ করতে হয়েছে অনিবার্যভাবে তুলনা আর তিরস্কারের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রায় সব ক্ষেত্রে। ফলে দীর্ঘকাল থিয়েটারকর্মীদের মস্তিষ্ক আর হৃদয়ে এক ধরনের আত্মঅবিশ্বাস আর দুর্বলতা বাসা বেঁধেছিল। আশির দশক পড়তেই অবস্থাটা প্রথম একটু ইতিবাচক হবার ইঙ্গিত পাওয়া

গেল। "ফর্ম ও কনটেন্টে চমক দেখানো" অরুণ মুখার্জী "মারীচ সংবাদ"-এর পর "জগন্নাথ" নিয়ে জনপ্রিয়তার জয়রথে চাপলেন এই দশকে পৌঁছেই। থিয়েটার ওয়ার্কশপ ভাঙলো,কিন্তু অশোক মুখোপাধ্যায় প্রবল যত্নে ও দক্ষতায় "বেলা-অবেলার গল্প" নিয়ে মঞ্চে নামায় বাংলা থিয়েটার এক নবীন শক্তিধর পরিচালকের খোঁজ পেয়ে গেল। অন্যদিকে, ভাঙন-উত্তর দ্বিধাগ্রস্ত বিভাস চক্রবর্তী বারিও কো-র সম্মোহন কাটিয়ে মৈমনসিংগীতিকার লোককথায় আত্মপ্রত্যয়ের ঠিকানা আর নিজস্ব ভাবনা চরিতার্থ করার উপযুক্ত শক্তির সন্ধান পেলেন। আমাদের থিয়েটার বহুদিন পর একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন (টোটাল থিয়েটার-এর) নির্দেশককে খুঁজে পেল। অন্যান্য থিয়েটার কর্মীদেরও, বলা যেতে পারে, এই সময় থেকেই উজ্জীবিত আত্মবিশ্বাসে নিত্য নতুন সফল নাট্যকর্মের সৃজন-প্রয়াসী হতে দেখা গেল। কিন্তু এর পাশাপাশি এক ধরনের শূন্যতারও সৃষ্টি হলো। আমাদের নিজস্ব দেশজ থিয়েটারী ঐতিহ্যের অভাবে মাত্র একশ বছর বয়সী অপরিণত নাট্যচর্চা খানিকটা উপেক্ষা করতে শুরু করল শম্ভু মিত্র থেকে অজিতেশের স্বপ্ন আর শ্রমদীপ্ত ধারাবাহিকতাকে। মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের মেলবন্ধনের বদলে শুধু হৃদয়স্পর্শী প্রযোজনা, বুদ্ধি আর আবেগের সঠিক রসায়নের বদলে শুধু আবেগতপ্ত কাহিনীর সঞ্চারণ যেন আমাদের পেয়ে বসল। কারণ, সাফল্যের চেয়ে বড় সফলতা আর কিছুই নেই। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২—বছরের পর বছর ঘুরছে—আমাদের নাটকের বক্সঅফিসে কোত্থেকে নেমে এলো জোয়ারের প্লাবন। একটি-দুটি নয়, এখন তো বেশ কয়েকটি প্রযোজনায় অভূতপূর্ব দর্শক-অভিনন্দন আর সাগ্রহ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন বোধহয় এই সত্য উচ্চারণে কোনো দ্বিধা থাকবে না যে, আমাদের নাট্যচর্চার গতিমুখ অনেকাংশে ঘুরিয়ে দিচ্ছে এইসব হঠাৎ উপচে পড়া সাফল্যই। অজস্র দর্শক, মিডিয়ার আশীর্বাদ, সিগারেট কোম্পানীর ধোঁয়াটে বিজ্ঞাপনে যদি ভেসে যায় শম্ভু মিত্র-বিজন ভট্টাচার্য-অজিতেশের নাট্যচর্চার উত্তরাধিকার,পরোয়া নেই তাতে। সবলে সতেজে বাঁচবার জন্য আমাদের চাই যুগোপযোগী বিবর্তন, যেখানে শাশ্বত-প্রয়াস মানেই লক্ষ্মীমুখী আরাধনা। আর এই 'সাফল্য' ব্যাপারটা এমন এক স্বর্ণপ্রসবী সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে যে, চলতি দশকেই ব্যবসায়ী থিয়েটারের থিয়েটার-ব্যবসায়ীরা আকাদেমী-রবীন্দ্রসদন থেকে গ্রুপ থিয়েটারের লোক ধরে এনে শ্যামবাজারী

মার্কাসের খাঁচায় পুরে ফেলছেন। ভাবখানা এই, বাইবেল-এর সেই প্রডিগ্যাল সন্ অনেক চিন্তা, স্বপ্ন আর শ্রম অপব্যয়-শেষে আজ যখন সুখের ঘরে চলে আসার তাগিদ অনুভব করছে, যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে বিতর্কসভা জমিয়ে গোচ্চায়ে বোঝাবার চেষ্টা চলছে—আজ আর গ্রুপ থিয়েটারে এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারে কোনো বিভেদ নেই, তখন স্নেহস্ফীত পিতৃকুল অনুতপ্ত সন্তানের বদলে কেন আর নব নব প্যাঁচ-পয়জারে অনভ্যস্ত অচল ও একঘেয়ে পেশাদারী শিল্পীদের পিছনে টাকা ঢালবেন? তার চেয়ে নতুনত্ব-পিপাসু দর্শকদের তৃপ্ত করতে গ্রুপথিয়েটার-নক্ষত্রদের দিয়ে পার্টোয়ারী শিল্পচর্চা শুরু করে দেখা যাক। শুধু নক্ষত্র দখল কেন, এই দশকের শুরুতেই আরো বড় একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। এক সুপরিচিত থিয়েটার-ব্যবসায়ী গ্রুপ-থিয়েটারের একটা গোটা নাটককেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রযোজনা করতে এগিয়ে এলেন। কারণ, তিনি জানতে পেরেছিলেন, নাটকটিতে নাচ-গান, হৈ-হল্লা-মজা ইত্যাদি দর্শক-মনোরঞ্জক প্রায় সব কিছুই আছে এবং নাটকটি প্রথমে গ্রুপ-থিয়েটার কর্মীদের জন্য গ্রুপথিয়েটার-এর দর্শকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করার জন্যই লিখিত ও প্রযোজিত হয়েছিল। এছাড়া নাটকের প্রায় সবটাই "ফোরেন" জিনিস,—লেখক জার্মান, নাম বার্টোল্ট ব্রেশ্ট (কী মজা! বাঙালী নাট্যব্যবসায়ীর বাণিজ্য-ভরসা বার্টোল্টব্রেশট—কেমন শ্রুতিসুখকর অনুপ্রাস!) নাট্য-রূপান্তরও বিদেশী! (ব্রেশটের সৃষ্টির অতি তরলায়িত ও সরলীকৃত বাংলাদেশী রূপান্তর!)

সমান্তরাল থিয়েটারের এই পণ্যমুখী বিবর্তনে যাঁরা খুব আতঙ্কিত হয়ে সবচেয়ে আগে এবং সজোরে 'গেল গেল' রব তুললেন, মজার কথা, তাঁরাই একসময় এই গ্রুপ-থিয়েটারগুলোকে দলীয় ছাতার তলায় আনতে কোনো কনশেসন দিতেই কার্পণ্য করেন নি। তখন এই নক্ষত্ররা আত্মমর্যাদা কিম্বা আত্মসম্মানের বিষয়ে খুব বেশি স্পর্শকাতর না হয়ে এঁদের মধ্যস্বত্ব ভোগের অধিকার মেনে নিয়েছিলেন; একাধিক 'প্রগতিশীল' বিবৃতিতে সই করেছেন, সভা-সম্মিলনে মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে ছাতার উপকারিতা বিষয়ে সাংস্কৃতিক বক্তৃতাও দিয়েছেন। এখন মাথা যখন ছাতা থেকে বার হয়ে অন্য পার্টোয়ারের মারফতিতে ঢুকে পড়বার জন্য পাঁয়তারা কষছে তখন 'ধিক ধিক, মাথা মহাশয়!' —বলাটা খুব বেশি জমছে না।

আসলে আমাদের সাম্প্রতিক থিয়েটারে ট্র্যাজেডিই এইখানে। বিরল—

প্রতিভা-শম্ভু মিত্রের প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় এবং অক্লান্তপরিশ্রমী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুঁকি নেবার দুঃসাহস আর যোগ্যতম নেতৃত্বের ক্যারিশমা কাটিয়ে বিবশবিহ্বল নাট্যকর্মীরা প্রায় দুই দশকের মধ্যেও নিজস্ব কোনো অনুসরণযোগ্য আদর্শ আর যুগান্তকারী স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ রাখতে পারলেন না। যা দেখাতে পারছেন তা কোনো স্থির আদর্শের রূপান্তর নয়, আসলে তা সময়ের আর সরল দর্শকদের চাহিদা অনুসারী রূপান্তরকেই একটা আদর্শের নামাবলী চাপিয়ে দিয়ে লড়ে যাওয়া।

আজ অনেক পথ পার হয়ে আত্মতৃপ্তির সোচ্চার বিজ্ঞাপনের রঙীন জৌলুষের তলায় কিন্তু মাঝে মাঝেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অবিশ্বাস উঁকি দিচ্ছে, আমাদের হাল ফিল্ম পৃষ্ঠপোষক সিগারেট কোম্পানির বিধিসম্মত সতর্কীকরণের মতোই। বাঁচার উপায়কে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য ভাবলে যে পরমিল অপরিহার্য হয়ে ওঠে, আমাদের আজকের ঈষৎ সুখী থিয়েটারের সামনে হয়তো সেটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। একটা মোটামুটি দীর্ঘ বিষাদগ্রস্ত প্রায় নিষ্ফল অন্ধ সময়ের বিপ্রতীপে 'সাজানো বাগান' অথবা 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা' কিম্বা 'দায়বদ্ধ' তিমিরবিনাশী আলো-হাওয়ার লড়াই-এর জন্য একটা অবলম্বন হতেই পারে, কিন্তু এগিয়ে যাবার একক আদর্শ হতে পারে না।

অথচ বাংলা নাটকের আজকের অবস্থাটা কিন্তু তার শতাধিক বছর আগের জন্মকালীন দেশজ ধারার স্বাভাবিক বিবর্তন-পরিণতি নয়। এই একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা, খানিকটা ভয়ে আর অনেকটা অভিজ্ঞতার অভাবে, যথোপযুক্ত যোগ্যতা আর চিন্তাভাবনার দৈন্যে অথবা অতি সহজে কাজ হাসিল করার ফিকিরে, বারংবার যে আদর্শ বা মডেলকে থিয়েটারে অনুসরণের চেষ্টা করেছি তাকে, কিন্তু দেশজ বলা চলে না, বরং বলা যায় আরোপিত। দেশজ ঐতিহ্য না হলেও থিয়েটারকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি ধীরে ধীরে। এরই পাশাপাশি যে-থিয়েটারে আজ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অপরিহার্য সত্য আর প্রাণের স্ফূর্তি লভ্য, সেই থিয়েটারে দরকার ছিল আরোপ করা বস্তু নয়, নব উদ্ভাবন; অষ্টুচিকীর্ষার সহজ সরল ধারাপাতের পাশাপাশি আমাদের জীবন ও দর্শনের প্রতিফলক জটিল মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকথা। আমাদের বেশি দরকার ছিল আত্ম-আবিষ্কারের, আমদানী করা-আদর্শের নয়।

কিছুটা মধুসূদন এবং অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। আমরা তার যোগ্য পরিণতি দিতে তো পারিইনি, বরং বেশির ভাগ সময়ই আমাদের থিয়েটার সেগুলি নিঠাভরে অনুসরণের বদলে অন্ধভাবে উপেক্ষা করেছে কিংবা মাঝে মাঝে দায়সারা স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। একটু-আধটু বৈচিত্র্যের লোভে, ছোট ছোট সাময়িক লাভের জন্য বারবার আরোপিত আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের অপরিণত থিয়েটার দিক পালটেছে। সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সামনে থাকলে সংস্কৃতির প্রসারণ অসম্ভব। তাই যে-থিয়েটারের শুরু লেবেদেভ সাহেবের ফরাসী প্রহসন দিয়ে, সেই থিয়েটার কখনো শেকস্পীয়র, কখনো ব্রেশট্ কখনো, বা পুওর থিয়েটার (Poor Theatre)-প্রবক্তা গ্রোটোভস্কির কাছে বারবার বাঁচার অক্সিজেন চেয়েছে। চমক আর নতুনত্বের মলাট দেখিয়ে সীমাবদ্ধ সাফল্য বহু ক্ষেত্রে এসেছে, কারণ নাটকীয় সংঘাত, দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও কাহিনীর আদল আরোপিত হওয়ায় কখনো কখনো একঘেয়েমির বদলে দর্শককে পরিতৃপ্ত করার খণ্ডকালীন প্রয়োজন মিটেছে, কিন্তু তাতে আমাদের থিয়েটারের দেশজ উপাদানকে সামনে রেখে নিজস্ব আদর্শ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাই 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'-র নাট্যকারকে প্রাসাদ-মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকের কাজ করতে হয়েছে। সেই সাংস্কৃত নাটকও আমাদের মঞ্চে এসেছিল আমাদের থিয়েটারের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, সংরক্ষণের তাগিদে। ইংরেজদের প্রভাব থেকে সমাজ আর জীবনধারাকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনেই রক্ষণশীল মনের চাহিদা মতো পুরনোকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল বাংলা থিয়েটার। শেকস্পীয়র আর সংস্কৃত নাটকের প্রভাবমুক্ত নাট্যচর্চার একটা রূপরেখা মধুসূদন বা দীনবন্ধুর প্রয়াসের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর নাটকের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সেইসব প্রয়াস কোথায় উড়ে গেল। এক অস্বাভাবিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে গিরিশচন্দ্র নাটক লিখলেন, মাথায় ছিল দর্শক-আনুকূল্যের তাড়না কিংবা আত্মরক্ষার উন্মাদনা, আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস হারিয়ে গেল সেই উত্তেজনায়।

এই উত্তেজনা থেকে যে চটজলদি প্রমোদ-পণ্যের জন্মাতাও একদিন নিশ্চিন্ত আরামের বাঁধাধরা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি আর একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়ল। দরকার হলো আবার নতুন মডেল এবং সেটাও একটা আরোপিত আদর্শেরমডেল, রোমাঁ রোলাঁ, পুশকিন, গোর্কি প্রমুখ সেইমডেলের

নেপথ্য-নির্মিতিতে শক্তি যোগালেন, আমরা বহুদিন পর একটা প্রত্যাশা-জাগানোর মতো ইতিবাচক কাজের মুখোমুখি হলাম। কিন্তু ঐ যে সহজিয়া বিলাস, অর্থাৎ মডেলটাকে সহজ-সরল ও অনতিক্রম্য করে ভেবে নেওয়া, মডেলের নতুন নাম হলো শ্রেণী-সংঘর্ষের মডেল। সহজিয়া সাধনায় বিশ্বাসী নাট্যচর্চাকারী কিছু নাট্যকর্মী দীর্ঘদিন বাংলামঞ্চ দখল করে রাখল সস্তা বিপ্লব, লাল আলো, ক্রিয়া আর গণসঙ্গীত-সমৃদ্ধ নাট্যপ্রযোজনাগুলো আর ঐ সব প্রযোজনার ছানাপোনা নিয়ে। উত্তরণের প্রয়াস কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের আদি জনকদের অনেকেরই উত্তর-জীবনের কাজে দেখা গিয়েছিল। যে সমান্তরাল থিয়েটারে আমাদের জন্মও সেখানে 'নবান্ন' বা 'জবানবন্দী'র নাট্যকার বিবর্তনের পথে যখন 'গর্ভবতী জননী' বা 'দেবীগর্জন'-এ উত্তীর্ণ হলেন তখন আমাদের সহজিয়া-সাধনার বিলাসে সেই উত্তরণ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে ধরা পড়ল না। সাহিত্যের মতোই নাটকের ক্ষেত্রেও পুরনো এস্টাবলিশমেন্ট ভাঙার গণনাট্যীয় আবেগ অন্তত উত্তরণের দিকে না গিয়ে নিজেই শেষ পর্যন্ত একটা অন্যরকম এস্ট্যাবলিশমেন্ট হয়ে দাঁড়াল। আরোপিত আদর্শের একটা মডেল প্রচ্ছন্নভাবে গণনাট্য সংঘের সূচনালগ্নে সক্রিয় থাকলেও গণনাট্য-আন্দোলনের প্রাণপুরুষরা অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় বুঝতে পেরেছিলেন, নিজেদের আবিষ্কারের মাধ্যমে দর্শককে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে সাময়িক লাভের অর্জন করা হয়তো যাবে, কিন্তু নতুন একটা ঐতিহাসিক পথ তৈরি করা যাবে না। বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ীরা আন্দোলনের প্রাথমিক আবেগ কেটে যাবার পর আসল কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু যাঁদের উদ্বোধিত করার জন্য ছিল তাঁদের এই প্রচেষ্টা, তাঁরা পথের ধারে তখন গুড়ের বস্তা পেয়ে গেছেন। রইল থেমে শ্রমসাধ্য পাথর ভেঙে ভেঙে পথ চলা, বস্তার চারপাশে তখন শ্রমবিমুখ পিপিলিকার চক্রাকার আবর্তন। এই আবর্তনের একঘেয়েমি কাটাতে একদিন আমরা নিয়ে এলাম ব্রেশ্‌টীয় মডেলকে। ফলে, নাচ-গান-বাজনায় সরলীকৃত মজায় সিরিয়াস ভাবনাকে যথাসম্ভব তরলায়িত করে দর্শকদের বছরের পর বছর মাতিয়ে রাখবার চেষ্টা চললো। তারপর আবার শূন্যতা …। মহান নাট্যস্রষ্টারা সমকালীন থিয়েটারের চরিত্রধর্ম অস্বীকার করে বারংবার যে নবীন নাট্যসত্তা সৃষ্টি করেন, ইতিহাস সাক্ষী, তাকে আত্মস্থ করতে গিয়ে সমকালীন থিয়েটারকে নিজের বেড়া ভাঙতে হয়, নিজেকে বাড়াতে হয়। বাংলা থিয়েটারে "এই বেড়া

ভাঙা, ছড়ানো আর বাড়ানোর কাজটা থেমে গেছে—তাই এতো হতাশা।" (কুমার রায়, 'বহুরূপী' পত্রিকা)। কলকাতা তথা বাংলার থিয়েটারকর্মীরা বরাবরই একটু মডেল-বিলাসী। কিন্তু আজ এতগুলো বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে আমরা কি ভাবব না বারবার এক-একটা সময় জুড়ে জায়নীতি ও আদর্শের যে ব্যাখ্যা আর বিশ্বাস আমাদের থিয়েটারী মডেলে চর্চিত হয়েছে, সেই মডেল সম্পর্কেই এখন নব-মূল্যায়ন দরকার, কারণ জায়নীতি এবং আদর্শের ও নবমূল্যায়ন তো যুগে যুগে হয়ে চলেছে। তার উপর এই ভীষণ জটিল সময়ে কোনো সরল থিয়েটারী মডেল দর্শকদের তৃপ্তিকে গভীরতা দিতে কিংবা আপাত সমর্থনকে দীর্ঘ পরমায়ু দিতে পারে না। যে-থিয়েটার দর্শককে বৃত্ত ভেঙে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, দর্শকের বোধ-বুদ্ধি আর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়, সে থিয়েটার থেকে খণ্ডকালীন সুখ মিলতে পারে, কালোত্তীর্ণ গভীর তৃপ্তি মেলে না। আমাদের নাট্যচর্চার তুলনায় ইয়োরোপীয় নাট্যচর্চা বয়সে আর অভিজ্ঞতায় প্রবীণতর। কিন্তু সেখানে মিডিয়া আর অন্যতর প্রমোদ উপকরণের প্রাবল্য আমাদের চাইতে অনেক বেশি। তবুও এত অ-সুখের মধ্যেও নাট্যচর্চা যে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে এবং এগিয়ে চলেছে তার কারণ থিয়েটারের লোকেরা এবং থিয়েটার-দেখা লোকেরা এমন একটা পরিমণ্ডল সেখানে সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে "টেমিং অব দ শ্রু" কিংবা "কমেডি অব এররস্"-এর তুলনায় অনেক কম জমানো-নাটক 'হ্যামলেট' অথবা 'ওয়েটিং ফর গোডো' প্রায় একই জনসমর্থন আদায় করে নেয় শুধু ব্রডওয়ে বা অন্যান্য মঞ্চে নয়, কলেজ-ইউনিভার্সিটির মঞ্চগুলোতেও। 'ওয়েটিং ফর গোডো' কট্টর পেশাদারি নাট্য-এলাকা ব্রডওয়েতে তো চলেছেই, পরন্তু খবরে প্রকাশ,—সান কোয়েন্টিন কারাগারের কয়েদীদের কাছেও বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ওখানে 'সাউন্ডট্র্যাপ' বা "ক্যালিফোর্নিয়া স্যুট"-এর মতো থিয়েট্রিক্যাল প্লে, টেনিসি উইলিয়ামসের 'আউট ক্রাই'-এর মতো অন্য ধারার নাট্যচর্চাকে বিকশিত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। সম্ভবত এ-কারণেই মার্জরী বোলটন দাবি করেন, আজকের নাটককে শুধু জনপ্রিয় হলেই চলব না, তাকে হতে হবে—"Three dimensional; it is literature that walks and talks before our eyes." নান্দনিক দিক থেকে যেমন দার্শনিক দিক থেকেও তেমনি জীবন-জগৎ সম্পর্কে গভীর সত্যকে তুলে ধরে যে-নাটক, অর্থাৎ যে-নাটক শুধু দেখাশোনায় আনন্দ দিয়েই ক্ষান্ত

হয় না, চেতনা আর বুদ্ধিবৃত্তিতেও যার আভাস মেলে, যে-নাটক ভাবাতে পারে, দর্শককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে-নাটক ললিতকলার সৌন্দর্য উপভোগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে—বোলটনের মত অনুসারে তেমন নাটক আর পেশাদারী প্রযোজকরাও প্রযোজনা করছেন, এবং আরো বেশি সংখ্যায় করতেও হবে, কারণ থিয়েটার শুধু পেট ভর্তি করার খাদ্য পেলেই বড় হতে পারে না। মন আর মস্তিষ্ককে দেহের উপযুক্তভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অন্তত পুষ্টিকর আহার্যও দিতে হয়।

গণনাট্য সংঘ থেকে বার হয়ে এসে যখন শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র, কলিম শরাফী, মহঃ ইসমাইল, মহর্ষি মনোরঞ্জন প্রমুখ বাংলা থিয়েটারের ঐ অন্তত্র সৃষ্টির সন্ধানে নতুনভাবে পথচলা শুরু করলেন, তখন বিশেষ করে তাঁদের অধিনায়ক শম্ভু মিত্রকে কম আক্রমণ সহ্য করতে হয়নি। তবু শম্ভু মিত্ররা দমেন নি। সহজিয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী বাঙালীর এই অসহিষ্ণু আবেগ একসময় প্রতিভার সামনে নতজানু হতে হতে সম্মোহনে পরিণত হলো। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো চওড়া-বুকের ছোটখাটো প্রাক্ত কমিউনিস্ট বহুদিন আগেই অনুতাপদগ্ধ মনে স্বীকৃতি দিলেন শম্ভু মিত্রকে। সেদিনের 'ইউকনিক্ষেপে' যদিও তিনি অংশীদার ছিলেন তবুও শম্ভুবাবুর কণ্ঠে 'মধুবংশীর গলি' শুনতে শুনতেই দীপেনের মনে হয়েছিল সংস্কৃতির কাছে গভীরতর কোথাও যাবার এবং নিয়ে যাবার দাবি সচেতন মানুষের অন্তরের দাবি। সেই দাবি মেটানোর পথ দেখিয়ে দিলেন শম্ভু মিত্র। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্বীকৃতির প্রায় আড়াই দশক পরে ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে উৎপল দত্ত স্বীকারকরলেন—"পেশাদারী সুক্ষ্মতা, পেশাদারী দক্ষতার নিদর্শন রাখলেন আমাদের শ্রীশম্ভু মিত্র মহাশয় তাঁর নাটকে। এর ফলে আমাদের নাট্য-আন্দোলনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। বোঝা গেল, নাটক না শিখে না বুঝে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়লেই হয় না।" (যুগান্তর, ২-৯-৯০)

গণনাট্য আন্দোলন আর শম্ভু মিত্রের যুগান্তকারী রবীন্দ্র-প্রযোজনাসহ "অন্যরকম" নাটকের ধারাবাহিকতায় আমাদের গ্রুপথিয়েটারে একসময় মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের, বুদ্ধির সঙ্গে বোধির, আবেগের সঙ্গে যুক্তির মেলবন্ধন ঘটাবার যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাও স্তিমিত হয়ে গেল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, উৎপল দত্তের শারীরিক অবসাদ এবং মোহিত

চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ প্রমুখদের নির্লিপ্তি বা অন্যতর পথ খোঁজার কারণে। নব্বই-এর দশকের ঠিক আগে-পরে কতকগুলো অনুকূল ঘটনা ঘটেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্ররা নতুন উদ্যমে অনেকগুলো নাটক লিখেছেন। বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখার্জী, রমাপ্রসাদ বণিক, ঊষা গাঙ্গুলী, মেঘনাদ ভট্টাচার্যরা ভালো কাজ করার যোগ্যতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আকাদেমি ও রবীন্দ্র সদনের সামনে প্রায়শই (বহুদিন পর) দর্শকের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। সিগারেট কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের রত্নাহারে নাটককে মনোহারী রাজত্বের মুকুট পরাচ্ছে। তারপর? হেমিংওয়ের নায়কের মতো আর একবার কি বলতে হবে অদূর ভবিষ্যতেই—…"nada y nada" (তারপর শূন্য—সব শূন্য)। থিয়েটারে অভিজ্ঞেশের স্বপ্নের সেই পেশাদারিত্বের ডাক হয়তো শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে বাণিজ্যিক বাঘের ডাক। যখন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'রাজরক্ত'র ধারাবাহিকতা পূর্ণভাবে মুছে ফেলে 'তোতারাম' বা 'মুক্তিযোগ' লিখলেন, মনোজ মিত্র 'চাকভাঙা মধু' দূরে ঠেলে 'রাজদর্শন' 'অলকানন্দা' কিংবা 'দর্পণে শরৎশশী' লিখছেন তখন সঙ্গত কারণেই জড়তা কাটিয়ে বাণিজ্যিক থিয়েটার ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমাদের সন্দেহ আশ্রয়-দিতে।

'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা'র বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন দেখে অর্থ আর অন্যান্য সংকটে বিবাদক্লিষ্ট দলগুলো নাট্যকারের কাছে ছুটছে—আর একটা একটু অন্যরকম 'মাধব-মালঞ্চী' হয় না? 'দায়বদ্ধ'-র রেকর্ডভাঙা জনপ্রিয়তায় উত্তেজিত নাট্যদলগুলো আর একটু অন্যরকম 'দায়বদ্ধ-র' দায় চাপাতে চাইছে নাট্যকারের উপর। 'পারিবারিক নাটক' 'সামাজিক মূল্যের নাটক,' 'হাসতে হাসতে জীবনদর্শনের নাটক'—বিভিন্ন নাট্য-প্রযোজনার পরিচয়জ্ঞাপক বিজ্ঞাপনে এধরনের বাক্যবন্ধ এখন চালু প্রথা। সাধারণ 'নুন আনতে পান্তা ফুরনো' গ্রুপ থিয়েটারগুলো এই গড্ডালিকায় নাম লিখিয়ে একটু মাখনটোস্ট খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকতে চাইছে, এটা অপরাধ নয়। এ সময় থিয়েটারী বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিপ্রতীপে নতুন এক যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গী, বোধ আর বুদ্ধি, আবেগ আর যুক্তির সঠিক মেলবন্ধনে রসজিদ্ধ নাট্যপ্রযোজনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমাদের নাটক করার মন আর দর্শকদের নাটক দেখার চোখ একটু উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন—এমন কোনো প্রবল প্রতিভার অভাবে দু-ধরনের স্থবিরতা নজরে

পড়ছে। শস্তায় দর্শকদের চলতি আবেগকে উসকে দিয়ে প্রযোজনায় ব্যয় তুলে নেওয়া নাট্যপ্রযোজনাগুলো, যার অনেকগুলোই একটু স্থূল সংলাপ আর নামী দামী চিত্রতারকাদের কাঁধে ভর দিয়ে অনায়াসে ক্ষামবাজারী বাণিজ্যে ঢুকে পড়তে পারত। আর একদল আরো বড় কৌশলী। স্থিতাবস্থার সবটুকু মধু চেটেপুটে খেয়ে এবং সবগুলো সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, এরা বৌদ্ধিক থিয়েটারের জন্ত হা-পিত্যেশ করেন। টেলিভিশন এবং ফিল্ম-স্টারদের কাঁধে ভর দিয়ে গ্রিস্টলীয় সরলীকৃত নাট্যপ্রযোজনায় যতটা নাট্যবোধ ধরা পড়ে ততটাই সূক্ষ্ম বাণিজ্য উঁকি দেয় সেসব ক্ষেত্রে। বিজন থিয়েটারে বৃহস্পতি,শনি, রবি বাণিজ্যিক থিয়েটার করার পর 'শম্ভু মিত্রের পর আর কোনো পরিচালক নেই'—বলে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হবার বাসনায় প্রাণ খুলে হাহাকার করতে কোনো বাধাই থাকে না আর।

আসলে এসব ভণ্ডামী নয়, আমাদের থিয়েটারী চোখকে পরিবার-সংসার-সমাজের জলাশয়ের উপর উপর কিংবা একটু ভেতরে ভেতরে নিবদ্ধ রাখার চলতি বৃত্ত ভেঙে সনিষ্ঠভাবে এবং আপোসহীন ধারাবাহিকতায় মানবমনের গভীরে ডুব দেওয়ার মানসিকতা, ক্ষণকালের জ্যামিতিকে উপেক্ষা করে বেড়াভাঙা মহাকালের রূপ দেখানো নাট্যপ্রযোজনাই আসর বর্ষ্যাকাল কিংবা কালবেলায় ঈপ্সিত অতিক্রমণ ঘটাতে পারে। বিভাস যখন 'মাধব-মালঞ্চী'র পর রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' করেন, অশোক যখন 'আলিবাবা'র পর 'বেড়া' করেন তখন প্রত্যাশা জাগে নিশ্চয়ই। কিন্তু কে যেন এঁদের বলে দিয়েছে যে, থিয়েটার করা ছাড়াও তোমার উপর আরো অনেক 'ভুবনের ভার' রয়েছে। এঁরা তো ভীরু নন এবং বিপ্লবের এই অধোগতির যুগে বিপ্লবী হবার মতো মূর্খও নন। অতএব 'মালঞ্চী'র পর আবার নাচ-গান-মজার বাংলাদেশী ব্রেশট্-নাটক। এবং 'বেড়া'র পর 'এবার গণশার পালা'। এই হিসেবী গৃহস্থালির বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পচর্চায় আমরা বরং এদের সমবেত শক্তির কাছে একটা অন্তিম আবেদন জানাই: অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ীদের শ্রমে এবং গণনাট্য সংঘের তৎপরতায় যে মানুষগুলো একসময় থিয়েটারমুখী হয়েছিল তাদের আবেগ ভালবাসাকে সঠিক পথে উত্তরণের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র, আজ বহুদিন পর অনেক মানুষ অন্তত অজস্র আকর্ষণ সত্ত্বেও আবার থিয়েটারমুখী। সমকালের খণ্ডকূপে সাঁতার কাটার সুখের পরে একটু বড় জলাশয়ে অবগাহনের আনন্দে উত্তরণ ঘটাবার দায়িত্ব সবাই মিলে কি কাঁধে নেওয়া যায় না?

# পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর জন্মশতবর্ষ স্মরণে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজকের পরিস্থিতিতে কতটা সাড়া জাগবে জানি না। কিন্তু এখনও অনেকে আছি—এবং 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোধহয় সবাই—স্মরণ করব এক অনাবিল সদাপ্রাণোজ্জ্বল, সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যপাঠককে আর সম্মান দিতে চাইব এক বিশালহৃদয় অহমিকালেশশূন্য মানুষের অবদানকে।

তাঁর লেখা 'চলমান জীবন'—যতদূর মনে পড়ে দুই খণ্ডে লেখা। যদিও আরও দীর্ঘ হতে পারত পবিত্রবাবুর সমকালীন এই চিত্রাংকন—এখন সহজলভ্য কিনা জানি না। স্বচ্ছ, ঘরোয়া, স্বভাবসিদ্ধ, হালকা-মেজাজী অথচ গৌরববাহী এই রচনাটি বাস্তবিকই মহার্ঘ। সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সমাজ সম্বন্ধে এমন সরস বিবরণের মূল্য বাঙালি পাঠক দিয়েছে কিনা জানি না। পবিত্রবাবু কখনও খ্যাতির প্রত্যাশায় ছিলেন না। কৈশোর অতিক্রান্ত হতে না হতেই সাহিত্যসেবার'এক সহজাত উদ্দীপনা যেন তাঁকে টেনেছিল। নিরাপদ স্বস্তির জীবন অন্বেষণে তাই কখনও এই মানুষটি প্রবৃত্ত হন নি। অনেক প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করে কলকাতায় এসে কৃচ্ছ্রসাধনে লেগে থেকে নিজের মনোমত জীবন কাটাতে চেয়েছেন। সে-জীবনে স্বার্থান্বেষণের কণামাত্র কেউ খুঁজে পাবেন না। 'চলমান জীবন' এক অজাতশত্রু নিরভিমানী সাহিত্য ও সমাজ-সেবকের স্মৃতিকথারূপে বহুদিন ধরে সমাদৃত হবে এটা কামনা করি।

একেবারে ছোটোবেলা থেকে পবিত্রবাবুকে আমি জেনে এসেছি। আমার পিতামহের (এবং আরও বেশি আমার পিতার) তিনি ছিলেন বিশেষ স্নেহের পাত্র। এর বহু সাক্ষ্য মিলবে 'চলমান জীবন'-এর পাতায়। মনে পড়ে, তখন-তরুণ পবিত্রবাবু আমাদের পুরনো বাড়ির বসবার ঘরে আসর জমিয়েছেন। হয়তো বাবাকে দিয়ে যাচ্ছেন এক গাদা 'সবুজপত্র'-র বিভিন্ন সংখ্যা, যা পরে সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে বাবার গ্রন্থসংগ্রহে রাখা হতো। 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' ছাড়াও বাড়িতে 'ভারতী' 'নারায়ণ' 'মানসী ও মর্মবাণী' 'সবুজপত্র' ইত্যাদি মাসিকপত্র সাজানো থাকত। পুরনো 'বঙ্গদর্শন'ও কিছু

সংখ্যা ছিল। মাঝে মাঝে ঐসব আড্ডাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সম্পর্কে কেমন যেন একটা মায়া আমাদের অল্পবয়সের মনকেও আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল। প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই না। কিন্তু দুঃখ এই যে, বাংলাসাহিত্যে এই সাময়িকীগুলির অবদান (এমনকি তাদের মোটামুটি পরিপূর্ণ বৃত্তান্তও) নিয়ে তেমন কাজ আজও দেখলাম না। এত গবেষণায় ছিড়িক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে 'ডক্টরেট'-এর হুড়োহুড়ি, অথচ আশঙ্কা যে এ-ক্ষেত্রে অনেক কিছুই অনালোচিত ও অজ্ঞাত হয়ে গেল এবং থাকবে। 'বঙ্গদর্শন' থেকে যে সমুজ্জ্বল পরম্পরা, যাতে আমাদের এই 'পরিচয়'-এরও আছে বিশিষ্ট এক অবস্থান, তা নিয়ে কিছু সযত্ন ইতিহাস রচনায় ব্যাপারে 'পরিচয়কে' যারা নানা বিঘ্ন-বাধা সত্ত্বেও চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা উদ্যোগ নিতে পারবেন কি?

'সবুজপত্র'-এর কথা ভেবে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম। পবিত্রবাবুকে নিয়ে আমার স্মৃতির আঙিনাতে রয়েছে এই 'সবুজপত্র'। তিনি কাজ করতেন 'বীরবল' আখ্যা-খ্যাত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের শুধু যে সহকারী হিসেবে তা নয়, একেবারে 'ঘরের ছেলে'-র মতো। আবার বলি, 'চলমান জীবন' যেন আজও অনেকে পড়েন আর জানতে পারেন সেদিনের সাহিত্যজগতের অনেক মূল্যবান কাহিনী। প্রমথ চৌধুরীর সহধর্মিণী এবং নিজগুণে প্রকৃতকীর্তি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও পূর্ববঙ্গাগত তরুণ পবিত্রকে স্নেহ করতেন, বুঝতে দিতেন না সে পরিবারের বহির্ভূত, (যদিও পবিত্রবাবুর জীবনের পশ্চাৎপট আর ঠাকুরবাড়ির জামাই বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার এবং তখনই স্বনামধন্য চৌধুরী-পরিবারের 'বীরবলকে' ভাবলে ভুল হতো না যে তাঁরা একেবারে অন্য জগতের বাসিন্দা।

'সবুজপত্র'কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছিলেন: "ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা / ওরে সবুজ ওরে অবুঝ / আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।" এটা মনে আসছে—কারণ পবিত্রবাবু যেন আজীবনই থেকেছেন 'সবুজপত্রের' প্রতিনিধিরূপে। শেষ দিকে জরা তাঁকে জীর্ণ করতে হয়তো পেরেছে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্য কখনও যেন তাঁকে ধরতে পারে নি। একাধিক প্রজন্মের মানুষ তাঁকে 'দাদা' বলে ডেকেছে; তিনিও অতি সহজে 'তুমি' থেকে 'তুই' সম্বোধনে নেমেছেন, কেউ তাঁকে কখনও বুঝি অ-সমবয়সী মনে করতে পারে নি। নজরুল ইসলামের সঙ্গে পবিত্রবাবুর অনাবিল সৌহার্দ্যকাহিনী তো সাম্প্রতিক সাহিত্যিক-ইতিহাসের এক বিশিষ্ট ঘটনা। 'পরিচয়' পত্রিকার

সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা নিশ্চয়ই এই মানুষটির প্রায়-অদ্ভুত, স্বতঃসিদ্ধ, অনায়াস, অপরাজিত তারুণ্যের বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

সাহিত্য অনুবাদের ব্যাপারে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য ছিল এমন একটা স্তরের যা নিঃসন্দিগ্ধ সাহিত্য-প্রতিভা বিনা সম্ভব হতে পারে না। ছেলেবেলায় তাঁকে জানতাম তৎকালে সুবিখ্যাত 'নোবেল'-জয়ী মেতারলিঙ্ক-এর "The Blue Bird" ('নীলপাখী')-এর সার্থক অনুবাদক রূপে। তারপর আরও বহু অতি বিশিষ্ট অনুবাদ তিনি করে গিয়েছেন। দুঃখ হয় এককালে বিদেশী সাহিত্য (বিশেষত গল্প) থেকে অনুবাদক অনেকে ছিলেন, যেমন—'ভারতী' পত্রিকার সংশ্লিষ্ট কয়েকজন। একদা বহু উপন্যাস রচয়িতা রূপে খ্যাত 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল এবং তাঁর বন্ধুরা, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষ-এর মতো এখন প্রায়-বিস্মৃত গল্পকার—না, এখানে তালিকা বানাতে পারি না, কিন্তু সার্থক অনুবাদ বাংলা ভাষায় যাঁরা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে পবিত্রবাবুর অগ্রণী ভূমিকা ভুলবার নয়। ম্যাক্সিম গর্কির গল্পের একাধিক মূল্যবান তরজমা তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

বেশ মনে পড়ছে, প্রগতি লেখকসংঘ স্থাপনের (১৯৩৬) কিছু পরে বিলাতে প্রকাশিত John Lehmann-সম্পাদিত 'New Writing'-এ ছাপা এক দীর্ঘ চীনা গল্পের অনুবাদ তিনি আমাদের অনুরোধে করে দেন। সেটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল মনে পড়ছে না। যতদূর জানি, এই দুরূহ কর্মের জন্য কপর্দকমাত্র দক্ষিণারূপে পাননি তিনি। কিন্তু এ নিয়ে কিছু মনে করার পাত্রই ছিলেন না পবিত্রবাবু। বাস্তবিকই তিনি যখন বড় হয়েছিলেন তখন বাস্তব ছিল সাহিত্যিক-জীবনে যেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিলাপ: "হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত/নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত।" এই সাহিত্য-প্রেরণাপুষ্ট, প্রায় যেন বাতিকগ্রস্ত কিছু ব্যক্তিকে আমি অল্প বয়স থেকেই দেখেছি। মনে পড়ছে, সেদিনের কর্মব্যস্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মী একজন ছিলেন—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, যিনি আজ বিস্মৃত কিন্তু তখন সাহিত্যকর্মীরূপে সর্বজন-বিদিত—আমরা ভাবতাম তিনি যেন 'সাহিত্য-পাগল'। পবিত্রবাবুর স্বভাবে একটা সহজ সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। কিন্তু তিনিও তখন থেকে ছিলেন (অন্তত আমার চোখে) প্রায় এমনই একজন 'সাহিত্য-পাগল'। এই গোটা প্রজাতিটাই আজ হারিয়ে গেছে। হয়তো যারা 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নামধেয় ক্ষেত্রে বিরাজ করছেন তাদের মধ্যে কতকটা এদের সন্ধান আজও মিলতে পারে।

কিন্তু ঠিক পবিত্রবাবুর মতো কায়মনোবাক্যে সাহিত্যকর্ম নিয়ে উন্মাদনা-পরিচালিত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অনুবাদকর্মে তিনি কতখানি মনোযোগী—শুধু তাই নয়, কত খুঁত-খুঁতে ছিলেন, তা বহুবার দেখেছি। বিদেশী স্থান-কাল-পাত্রের ঠিক নাম নিয়ে তাঁর ছিল খুবই দুর্ভাবনা, যা অন্য বহু কৃতী লেখকের ক্ষেত্রেও বড়ো একটা দেখি না। একবার ন্যাশনাল বুক এজেন্সির অনুরোধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে Wanda Wassileska (যতদূর মনে পড়ে) নামে এক পোলিশ লেখিকার 'The Moon is Down' উপন্যাসের তরজমা তিনি করেন। লেখার আগে কত প্রশ্ন যে তুলেছিলেন, কত আলোচনা যে করেছিলেন, এর একটাই শুধু কারণ—যাতে অনুবাদকর্ম সার্থক হতে পারে।

আমার হাতের কাছে মালমশলা নেই—'চলমান জীবন' গ্রন্থটিও কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু একটু কষ্ট করে পবিত্রবাবুর রচনাবলীর একটা নির্ঘণ্ট অন্তত তৈরি করা আমাদের পক্ষে যেন সম্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথাও এই জন্মশতবর্ষে সযত্নে কেউ লিখবেন, এটাও প্রত্যাশা করি। নিছক রাজনীতি কখনও পবিত্রবাবুকে টানে-নি, কিন্তু স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে আমাদের অনেকের কম্যুনিস্ট প্রত্যয়ের অংশীদারীত্ব না করেই তিনি আমাদের বহু উদ্যোগে সহায় হয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। নিজের কথা নিয়ে ভাবতেন খুবই কম—'পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ' (প্রাজ্ঞ পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করে), এই মহাবাক্য বিনা আড়ম্বরে তিনি নিজের জীবনে অনুসরণ করে গিয়েছেন।

সাহিত্য ও শিল্পের জগতে (অন্যান্য ক্ষেত্রেও) পরস্পর-অসূয়া বলে একটি বস্তু প্রায়ই প্রতীয়মান হয়ে থাকে। 'সুখের সন্ধান' ('The Conquest of Happiness') গ্রন্থে Bertrand Russell কৌতুক করে বলেছেন: "পাঠক, কখনও কি এক কবির কাছে আর এক কবির কথা শুনেছেন?" সঙ্গে সঙ্গে রাসেল সাহেব মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজনীতিকদের (বিশেষত একই দলের) পরস্পর-বিদ্বেষের কথা—এমন কি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও নাকি Laplace এবং Huyghens-এর মতো বিরাট পুরুষ তাঁদের সমকালীন এবং জ্ঞানচর্চার ইতিবৃত্তে অতুলন Isaac Newton সম্বন্ধেও যে ঈর্ষা পোষণ করতেন তারও সকৌতুক উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, পরশ্রীকাতরতা বলে যে দোষটি মানুষ সহজে পরিহার করতে পারে না তার দৃষ্টান্ত সাহিত্যক্ষেত্রে ও সাহিত্যিকদের

পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একেবারে বিরল নয়। এদিক দিয়ে পবিত্রবাবু ছিলেন অসাধারণ ব্যতিক্রম। সাংসারিক দুর্দৈবের মধ্যে হয়তো বা মনে খেদ এসেছে কখনও কখনও, কিন্তু অসূয়া-প্রবৃত্তি থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। কে পবিত্রবাবুর মতো পারতেন অজ্ঞাতপরিচয়, বীরভূমের পল্লীবাসী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো সাহিত্যজগতে সহায় সম্বলহীন মানুষকে উৎসাহ দিতে, সমাদর জানাতে, সাহায্যের হাত নিজে থেকে বাড়িয়ে দিতে? প্রগতি লেখক আন্দোলনকে তাঁর মতো কে দরাজ বুকের দরদ দিয়ে এগিয়ে নেবার ভার নিয়েছিলেন? কম্যুনিস্টদের ধরনধারণে হয়তো মাঝে মাঝে একটু বিচলিত হয়েছেন পবিত্রবাবু এবং তাঁর মতো আরও কেউ কেউ। কিন্তু 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' ('সর্বজন সুখী হোক')—সমাজবাদ-সাম্যবাদের এই অজর অমর অভীষ্টে তাঁরও একান্ত সায় ছিল। মার্ক্‌স্ কথিত "The party in the grand historical sense of the term"-এ তাঁকেও আমরা স্বজন বলে দাবি করি।

সদাহাস্যময়, আত্মচিন্তারহিত এক অসামান্য সাহিত্যসেবকের জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আমরা স্মরণ করব, সম্মাননা জানাব আমাদের এই একান্ত স্বজন সহযাত্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। সাহিত্য ও সমাজের সেবায় এমন উৎসর্গীকৃত প্রাণের মর্যাদা আমরা যেন সবাই দিতে পারি।

# সব শেয়ালের এক রা

## আজিজুল হক

সব মৌলবাদীই এক এবং অভিন্ন। বালথ্যাকারে আর মওলানা মওদুদির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আদম এবং আদবানি ও এক। 'বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ' এবং 'জামায়েত...' অভিন্ন। এরা একাত্মা, এক দেহে লীন। কারণ, তাদের মৌলিক দর্শন, কর্মপদ্ধতি এবং শেষ লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের মৌলিক দাবী হলো, 'শর্তহীন আনুগত্য:' এই আনুগত্যের অভাবই মানুষের প্রথম 'পাপ'; সুতরাং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা অন্যায়। অন্যায় এবং অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থাটাকেই এরা 'ন্যায়', চিরায়ত' এবং 'শাশ্বত' বলে চালাবার চেষ্টা করে থাকে। ফলত এদের শেষ লক্ষ্য হলো এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা যেখানে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না এবং তাদের প্রতি থাকবে শর্তহীন আনুগত্য, তাই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তারা নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদ-কে পরম গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এই কারণেই বালথ্যাকারে এবং মওলানা মওদুদি একই ভাবায় হিটলার মুসোলিনীর প্রশস্তি গায়। এবং একই রকমভাবে সমাজতন্ত্র-বিরোধী।

এক কথায় বললে বলতেই হবে, ধর্মীয় মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলোকে বিকশিত না-করতে দেবার জন্য। ভলতেয়ার যে কথা বলেছিলেন, 'আমরা জানি ভগবান নেই। কিন্তু জনগণের ভগবানের প্রয়োজন আছে।' অর্থাৎ 'আমাদের জন্য জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয়তাটাকে তৈরি করা এবং বিকাশ করার প্রয়োজন আছে।' (ব্যাখ্যা- আমার)। এই প্রশ্নে মনু, হদিস, হিটলার কিম্বা বালথ্যাকারে, মৌলানা মওদুদি, হিটলার মিলেমিশে গেছে।

অতএব ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে আসলে একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী। তার সংগ্রামের বর্শা ফলকটা থাকে মানুষের বিরুদ্ধে, তার লক্ষ্য—শেষ বিচারে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। সাম্প্রদায়িকতাটি সেখানে একটা উপায় মাত্র। সাম্প্রদায়িকতার ওপর যে-নির্ভর করবেই ব্যাপারটা সেরকম না-ও হতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা হলো একই শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে দুই বা ততোধিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সুবিধা আদায়ের দরকষাকষির জন্ত ধর্মের ব্যবহার। এটার পরিবর্তন হতে পারে। যেমন বদরুদ্দিন উমর দেখিয়েছেন, '৪৭ সালের পরে পাকিস্তান হবার পরে, হিন্দুদের জায়গায় মুসলমানরাই সব কিছু দখল করে নেয়। ফলে মুসলমান শাসক, শোষক এবং মুসলমান শোষিতদের মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেটা আবার '৭১ সালে বাঙালি মুসলমান অবাঙালি মুসলমানের দ্বন্দ্ব হিসাবে সামনে আসে। বর্তমানে সেখানে ধর্মের ব্যবহার হচ্ছে সরাসরি গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কারণ, এখন আর হিন্দুদের কিম্বা অবাঙালিকে দেখানো যাচ্ছে না। অর্থাৎ, শেষবিচারে ধর্মীয়মৌলবাদ তার নখ আর দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের জান-মালের ওপর। তাই মৌল-বাদীরা এক এবং অভিন্ন। কেমন ভাবে সেটা এবার দেখা যাক।

## মতাদর্শের রূপ

'...মার্ক্সবাদীরা সকলকে উদ্ধার করতে চায়, কিন্তু ওরা জানে না ঐ ইহুদী জাতটাকে উদ্ধার করা শিবের-ও অসাধ্য কাজ...ইতিহাসের এক পর্যায় পর্যন্ত আমি ইহুদীদের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করে উঠি...' (আত্মজীবনী থেকে)

'...(মুসলমানদের কাজকর্ম দেখে ২১ সালের পর) ডাক্তারজি (হেড্‌গেওয়ার) অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেন...বিশেষ করে মুসলমানদের বাড়াবাড়ি এবং বেইমানি দেখে...মাপলাদের (এখানে মাপলাকৃষক-বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ মাপলা-বিদ্রোহ ঠেকাতেই আর-এস-এসের জন্ম) বাড়াবাড়ি ...তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কেবলমাত্র হিন্দুরাই পারেন...'

[ আর-এস-এস-এর বিকাশ সম্পর্কে ঐ দলের প্রচারিত পুস্তিকা থেকে... ]

'...আমাদের প্রিয় নবীই দুনিয়ার মানুষের সেরা নেতা, তাঁর পথই শ্রেষ্ঠ পথ,...যাহারা সেই পথ গ্রহণ করে না তাহারা কাফের...কাফের কখনও ভাল হয় না কারণ তাহারা সত্য বলে না...'

[ ইসলাম প্রচার সমিতি ]

মন্তব্য : হিটলারের ইহুদী, আর-এস-এস-এর মুসলমান, জামায়েত-এর কাফের সকলেই মনুষ্যেতর জীব। হিটলার ইহুদী নিধন শুরু করেছিল একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই। এরাও সেটিই করতে চায়।

## মার্কসবাদ ও গণতন্ত্র-সম্পর্ক

'…মার্কসবাদ—অর্থাৎ ইহুদীদের মতবাদ, প্রকৃতির আভিজাত্য তত্ত্ব অস্বীকার করে। তারা বলে শক্তির কথা, সংখ্যাধিক্যের ওপর তারা বিশ্বাস করে এবং জনগণ নামক একটা মৃতের বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়…তারা জাতিকে ব্যক্তির ওপর এবং প্রজাতিকে জাতির ওপরে স্থান দেয়। এটা যদি মানুষ গ্রহণ করে তাহলে সার্বিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ইহুদীরা যদি মার্কসবাদীদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসে ( অর্থাৎ মার্কসবাদীরা যদি…A H ) সেটা হবে মানব জাতির চরম সর্বনাশ…'

[ মেইন ক্যাম্ফ ]

'মার্কসবাদীরা অ-হিন্দু কারণ তাদের উৎস বিদেশী…এখানে থাকতে হলে অ-হিন্দুদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগের এমন-কি নাগরিকত্বের পশ্চিমী-গণতন্ত্র এবং জাতির ধারণা ত্যাগ করতে হবে…' ( গোলওয়ালকার, আমাদের জাতি… ) । 'সমাজতন্ত্রের পত্তন হয়েছে ফাঁকটা হিন্দুত্ব দিয়ে ভরাতে হবে…' [ ঐ ]

'যে ধরনের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অধিকার স্বীকৃত রাজনৈতিক পরিভাষায় তাহাকেই গণতন্ত্র বলে, ইসলামে এবং ইসলামিক রাষ্ট্রনীতিতে তাহার কোনো স্থান নাই…'

[ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলাম প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ]

'মার্কবাদের কবরের ওপরেই ইসলামের বিজয় ধ্বজা উড়বে…' [ ঐ ]

মন্তব্য : সাদৃশ্য পরিষ্কার। লক্ষ্য এক, পথ-ও এক।

## গণহত্যার যুক্তি

'…আমি মনে করি, আজ আমি যা করছি (ইহুদী-নিধন) তা ঠিক করছি। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই করছি। ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমি ভগবানের সৃষ্টিকেই রক্ষা করছি…

…পাঁচশ' জনের (সাংসদ) মতামত নিয়ে দেশ শাসন করতে গিয়ে সরকার নিজেকে ইতরের স্তরে নামিয়ে এনেছিল…[ আত্মজীবনী হিটলার ]

'বাবরি মসজিদ প্রশ্নটা যুক্তির নয়, বিশ্বাসের। রামজির ইচ্ছাতেই ওটা ধ্বংস হয়েছে।…' [ কল্যাণ সিং, বি-জে-পি ]

'এখানে থাকতে গেলে তাদের ( মুসলমানদের ) হিন্দুদের অধীনস্থ থাকতে হবে, এমন কি নাগরিকত্বের অধিকারও চাওয়া চলবে না…' [গোলওয়ালকার]

'কাফের হত্যার মধ্যে পাপ নেই…পরম করুণাময় খোদার সেটা ইচ্ছা…'

[ মওলানা সইদী বাঙলাদেশ ]

মন্তব্য : মানুষ খুন করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা জাগিয়ে তোলা হয়। সেই ফাঁকে চলে রাজনৈতিক ক্ষমতাটা করায়ত্ত করা। হিটলার যেটাকে বলেছে, ফিজিক্যাল অ্যাণ্ড মেন্টাল টেরর ইজ-ড কি টু বিল্ড অ্যান অরগানাই-জেশন।

## হিটলার সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান নেতারা

'হিটলার হচ্ছে আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক…'

[ বাল থ্যাকারে ]

'একটা জাতি এবং সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হিটলার যখন সেমিটিক রক্তের জাতি ইহুদী বিতাড়ন শুরু করে সমগ্র বিশ্ব তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল …কিন্তু মনে রাখতে হবে তার ফলেই সেই সময়ে জার্মানীর জাতীয় গৌরব সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়। জার্মান আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, দু'টো পরস্পর বিরোধী রক্তজাত এবং সম্পূর্ণ বিপরীত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যটা মৌলিক। (উৎসেই কারাক)। তাদের কোনো সময়েই একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুস্থানে আমাদের সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে, এই কর্মকৌশল থেকে ফায়দা ওঠাতে হবে…' [ গোলওয়ালকার, আমাদের জাতি ]

'দুনিয়ায় এই সমস্ত চালাক জাতিগুলোর ( জার্মান, ইতালি ) কাছে থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এবং তাদের এই মতই আমাদের অনুমোদন করতে হবে যে—ভারতবর্ষে যেসমস্ত অ-হিন্দু আছে তাদের অবশ্যই হিন্দু কৃষ্টি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে…[ ঐ ]

## মুসলিম-নেতারা

যে-সমস্ত দল একটা শক্তিশালী আদর্শ এবং চমৎকার দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সব সময়েই তাদের সদস্য-সংখ্যা অল্প থাকে। মুসোলিনির পার্টির সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র চার লাখ, রোমের সড়ক বরাবর তারা যখন অভিযান

চালায় তাতে অংশগ্রহণ করে মাত্র তিন লাখ সদস্য। এই তিন লাখ লোক-ই সাড়ে চার কোটি লোককে কয়েক মাসেই পদানত করে ফেলে…

[ তারকুমার আল-কোরান পত্রিকাতে '৭৫ এর আগস্ট সংখ্যায় জামায়েত নেতা মওলানা মওদুদি ]

## সার সংকলন

তা হলে যেটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে তা হলো, সবধর্মীয় মৌলবাদীই আসলে দখলদারবাদী। রাষ্ট্র ক্ষমতাটা কুক্ষিগত করাটাই তাদের আসল উদ্দেশ্য, ধর্ম সেখানে একটা উপায় মাত্র। মানুষের হতাশা, আস্থার অভাব (যাঁদের ওপর ভরসা ছিল তাঁদের পদস্খলন বা কাজকর্মে), দুর্দশা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর পুঁজি করে এরা ধর্মকে ব্যবহার করছে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে শর্তাধীন করে তোলার জন্য। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ক্ষমতাটা দখলের জন্য জনমানস তৈরি করাই লক্ষ্য। এ-ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ হিটলারের কিংবা মুসোলিনির নেতৃত্বে পরিচালিত জার্মান এবং ইতালি।

কারণ: (১) হিটলার এবং ধর্মীয় মৌলবাদীরা একই রকমভাবে সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করে। হিটলারের কাছে তারা 'মৃতের বোঝা, শুধুই খায়'। গোলওয়ালকার মনে করে, 'জনগণ মানে তো হুকুম তামিলের যন্ত্র' (আমাদের জাতি), মওদুদির ভাষায়, 'তারা পানি নয়, নর্দমার পাঁক!' তাই হিটলার চাইতো, 'অভিজাতের শাসন', গোলওয়ালকার 'ব্রাহ্মণ্য সমাজ', আর মওদুদি চায় 'আমিরদের'।

(২) তিনজনই 'সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ' সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা জাগিয়ে তাদের স-বলে পক্ষে আনতে চায়। হিটলার মনে করতো, 'সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী ইহুদী সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে বিকাশ সম্ভব নয়'। গোলওয়ালকার অ-হিন্দু সংস্কৃতির 'ক্ষতিকারক প্রভাব' রোধ করতে বদ্ধপরিকর। মওদুদি ভাবে, 'অ-মুসলমান সব কিছুই অসভ্য'। কারণ সেটা পয়গম্বরের অনুমোদিত নয়।

(৩) ফলে, এরা প্রত্যেকেই বিরোধী সংস্কৃতির প্রসার এবং প্রভাব সম্পর্কে আতঙ্কিত।

(৪) এই কারণে এরা প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষমতাকে সবদিক থেকে নিষ্কণ্টক করার জন্য 'ব্যাটল অব অ্যাট্রিশন' বা বিরোধী সাংস্কৃতিকে নির্মূল করার নীতিতে বিশ্বাসী।

(৫) এরা প্রত্যেকেই কমিউনিজমের চরম শত্রু। হিটলার এটাকে ইহুদীদের মতবাদ বলে মনে করতো, গোলওয়ালকার মনে করে, 'বিদেশী মতাদর্শ' এটা যদিও হিটলারের-মতবাদ তার পরম আরাধনার বস্তু। মওদুদির কাছে 'খোদার চেয়ে বেশি জনগণের ক্ষমতা। সুতরাং ওটা কাফেরদের দর্শন।

## এটা কি আকস্মিক ?

আশির দশকের প্রথমার্ধের শেষভাগের পূর্বে ধর্মীয় মৌলবাদ বা ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু ৮৫-৮৬ সাল থেকে ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মকে সামনে আনাটা একটা 'মোবাল-ফেনমেনন'হয়ে দাঁড়ায়। শাসক-সম্প্রদায়ের একটা গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা, কিংবা কোনো দেশের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দরকষাকষিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার জন্য 'এইড্স' এবং 'ধর্ম'কে কাজে লাগানো একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে, এই সময়েই মরে-যাওয়া-সমাজতান্ত্রিক মডেলের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটা শুরু হয়ে যায় গর্বাচভ আর দেঙ-সিয়াও-পিঙ-এর নেতৃত্বে। সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং নিজের ভবিষ্যত গড়ার জন্য নিজের হাত ও মস্তিষ্কের ওপর আস্থার মতাদর্শগত ভিত সমাজতান্ত্রিক সংহতি এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের ঔরসে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পরাজিত শ্রেণীগুলোর বংশধরদের গর্ভে অন্ধকারে বেড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রথম সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদে আঘাত হানে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কার্যত জাতীয়তাবাদী দেশে পরিণত হয়। এই জাতীয়তাবাদকে মোকাবিলা করার জন্য এখন তারা ধর্মকে আমদানী করছে। ৮৫-৮৬ সালের বিশ্বধর্ম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 'এক ব্রহ্মাণ্ড, এক মালিক'-এর পার্থিব প্রয়োগ 'এক বিশ্ব, এক প্রভু'-কে কার্যকরী করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক-কেন্দ্র থেকেই এটা চালনা করা হতে থাকে। (কোথাও কোথাও সেটা যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হচ্ছে না, তা-ও নয়)। অর্থাৎ, পুরনো সাম্রাজ্যবাদী এবং উঠতি সাম্রাজ্যবাদী বা প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের মধ্যকার তীব্র প্রতিযোগিতায় বিশ্বকে ভাগ, আবার ভাগ, পুনরায় ভাগ করার রণ-কৌশলে ফ্রন্ট গঠনের কিংবা নিজের বাজার সংহত করার কাজে ধর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্র-

গুলোর ওপর কব্জা মজবুত করাটাই তাদের উদ্দেশ্য। যেটাকে বলা হচ্ছে—'ইউনি-পোলার বিশ্ব'।

## ধর্মীয় মহাসম্মেলন

সবধর্মের মহাসম্মেলন একটা বিচিত্র বস্তু। আজ পর্যন্ত যেসব ধর্মগুলো বাহ্যত পরস্পরকে নির্মূল করার নীতিতে বিশ্বাসী, তারাই কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। সেই বিশেষ সময়টা হলো—কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংকট। দু'টো বিশেষ ধর্ম-মহাসম্মেলন আমরা দেখেছি। (এক) ১৮৯৩ সালে। (দুই) ১৯৮৫-৮৬ সালে। ১৮৭১ সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গ্রান্ট, দক্ষিণের ভূ-স্বামী এবং দাস-মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়ে দক্ষিণের মানুষগুলোকে মজুরদাসে পরিণত করে। যার বর্ণনা, আপ্টেইন সিনক্লেয়ার প্রমুখ লেখকের লেখাতে আমরা পাই। এর ফলে, যে বিশাল পরিমাণ উৎপাদন-শক্তি মুক্তি পায় এবং উৎপাদন বেড়ে যায়, সেটা সমগ্র আমেরিকার ঘাড়ে ডাঃ ফাউস্টাসের শয়তানের মতো চেপে বসে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য উঠতি আমেরিকা বাজারের সন্ধানে এবং বাজারে ঢোকার পথ খুঁজতেই চিকাগো মহা সম্মেলনের আয়োজন করে। এঙ্গেলস-এর ভাষায় 'এই রকম সংকটের সময় বুর্জোয়া ভীষণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। নিজের দেশের ধর্মে না কুলালে, বিদেশের ধর্ম আমদানি করতেও তাঁরা উৎসাহী হয়ে পড়ে'। 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর আমেরিকান মদতের রহস্য এইখানেই। এদের কারুর কারুর ব্রিটিশ বিরোধিতার ইতিহাসটা আসলে আমেরিকান ট্রেড অ্যাম্বাসাডার ইন ইণ্ডিয়া। যেমন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকান ট্রেড-অ্যাম্বাসাডার সেখানে জাতীয় নেতা হয়ে যান।

১৯৮৫-৮৬ সালে সংকটের চরিত্রটা কী? ইউ-এন-ওর হিসাবে প্রযুক্তি এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়েছে যে, যদি মানুষ সমস্ত প্রযুক্তির সমস্ত দক্ষতাকে কাজে লাগায় তা হলে প্রতিদিন মাত্র দু-ঘণ্টা পরিশ্রম করলেই সমগ্র বিশ্ব থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র এবং অনাহার ও মৃত্যুকে তাড়ানো যাবে। অর্থাৎ, 'যদি কাজে লাগায়'। কিন্তু লাগাবেটা কে? প্রযুক্তির বিকাশের মালিকানাটা যাদের তারা যদি উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রটার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে ভোগটা সামাজিক করে দেয় তাহলেই সমস্যাটা মিটে যায়। না, সেটি তারা করতে

পারে না। উলটে, যথেষ্ট মুনাফা শোষ করতে না পারার অপরাধে ১২৮টা দেশের মধ্যে ৯৮টা দেশকে তারা দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে। এমনি ভাবে যাদের প্রয়োজন আছে তারাও বাজার থেকে কিনতে পারছেন না। প্রচুর মাল, ক্রেতা-বাজার সীমিত। মাল-উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তখন তীব্র।

এই প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য ইয়োরোপ তার কনফেডারেশান গঠন করে বাজারে হাজির। জাপানও বাজারে হু-হু করে এগিয়ে আসছে। আমেরিকা-ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে তার নিজস্ব অর্থনীতিকে পণ্য উৎপাদন মুখীন অর্থনীতি-নির্ভরতা থেকে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে সরিয়ে এনে বেনিয়া-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান অর্থনীতি আজ অধঃপতিত হয়েছে 'বেনিয়া-অর্থনীতি'-তে (ট্রেডার্স ইকোনমি)। আর প্রধান মাল হলো সমরাস্ত্র বা ঐ জাতীয় বস্তুগুলো। স্বভাবতই এই 'মাল' বাজারে কাটাতে গেলে তার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতাতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য চাই। এই আধিপত্যের জোরে সেই সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের সাহায্যে প্রতি-যোগীদের (বিভিন্ন আইন, সুযোগ-সুবিধা) ঠেকাতে পারবে। বাঙলা দেশের নির্বাচনে এটাই আমরা দেখেছি। আমেরিকান পুঁজি (তায়া-সৌদি) বনাম জাপানী পুঁজির লড়াই চলছে। অর্থাৎ এই সমস্ত দেশে আমেরিকা এমন একদল শাসক চায়, যারা বাধাহীন ভাবে তার মাল কাটাতে পারবে। জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে। এবং সেই গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলার রণকৌশল হবে 'নিরাপত্তাহীনতা'র প্রশ্নটা (মানবাধিকার)। সোজা কথায়, তথাকথিত গণতান্ত্রিক উপায়ে একটা শক্ত সরকার, যার হাতে একটা সংবিধান বা আইনোর্ধ শক্তি থাকবে; জনগণ নামক মূর্খের বোকাদের ঠাণ্ডা করার জন্য। একমাত্র ধর্মই তার অনুকূলে এই জনগণ গড়ে তুলতে পারে। এখানেই অতীতের ধর্মীয় মৌলবাদ থেকে বর্তমানের মৌলবাদের ফারাক। প্রথমত, এটা একটা আন্তর্জাতিক ফেনমেনন, নয়া-নাৎসিবাদী পুনরুত্থানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। দ্বিতীয়ত, এটা একটা কেন্দ্র থেকেই তার অনুকূলে রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগণের মধ্যে একটা বাতাবরণ তৈরি করার হাতিয়ার। তাই, বর্তমানে কোনো মৌলবাদকেই ছোট করে দেখা যায় না। ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্যে মৌলবাদ খুঁজতে যাওয়ার অর্থ একটা গোপন অভিসন্ধিকে আড়াল করা। বি-জে-পি-র সবর দপ্তরে জমায়েতের নামাজ কিংবা যোশির

ইক্ তারে যাওয়ার ঘটনা, অথবা 'অশোক মিত্রদের বাংলা দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে বসে (মৌলানা আজিজুল হক) বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার দিন ধার্য্য করা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। প্রতিটি মৌলবাদী তত্ত্বকে তাই ধরতে হবে তাদের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে। তারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছা মোতাবেক, তাদের টাকায় ধর্ম থেকে উক্তি দিয়ে কেমন ভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বটা জনগণকে গেলাতে চাইছে সেটিই বড় কথা।

## ইসলামের রাষ্ট্রনীতি

ইসলাম ধর্মীয় এবং ঐশ্বরিকরাষ্ট্রনীতির মূল কথা : আইন রচনা ও বিধান-প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। সমগ্র মুসলমান মিলিত হয়েও এই আইন রচনা করতে পারে না। খোদার দেওয়া আইনের কোনরকম পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকার কারুর নেই। খোদার তরফে তার নবী যে-বিধান পেশ করে থাকে ইসলামি রাষ্ট্রের সেটাই চিরন্তন ভিত্তি। আর কেবলমাত্র এই কারণেই একজন শাসক জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারে। (অর্থাৎ, এটা করলেই সব করা হয়)। সুতরাং ইসলামি-রাষ্ট্রকে কোনমতেই এমন একটা রাষ্ট্র বলা চলে না, যেখানে অনেকের মতামতের ওপর 'আইন' বা বিধান রচনা করা কিম্বা পাল্টে দেওয়া যায়। ফলত ঐশ্বরিক রাষ্ট্র প্রচলিত 'গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র' নয়। মুসলিম মৌলবাদীরা এই 'স্বপ্নে'র রাষ্ট্রটাকেই 'হুকুমাতে ইলাহিয়া' বা খোয়াদী-শাসন বলে থাকে। অনেকটা 'রামরাজ্য' বা 'বেনেভোলেন্ট-অটোক্র্যাসী'র মতো'। এগুলো সবই 'থিওক্র্যাসী' ইয়োরোপে আমরা যে-সমস্ত 'থিওক্র্যাসী'-রাষ্ট্র দেখেছি, সেগুলো ছিল 'যাজক-শাসিত' রাষ্ট্র। 'ইসলামি-থিওক্র্যাসি'তে আইনত সমস্ত মুসলমানরাই (লক্ষ্য করুন, অন্য কেউ নয় ।সেলেওয়ালকারের আমাদের জাতি শীর্ষক পুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন কী অদ্ভুত মিল। আর আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ হিটলারের মেইন ক্যাম্ফে বর্ণিত রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে।) পয়গম্বর বর্ণিত খোদার অনুশাসন কায়েম করতে পারে এমন শাসক নির্বাচিত করতে পারবে। এরই জন্য মৌলবাদীরা এটাকে 'খোদায়ী গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করতেই ভালোবাসে। [হিটলারের সমাজতন্ত্রের আগে, 'ন্যাশানালিস্ট' যোগ করার মতো আর কি।] এর কারণ কি? কারণ তাদের বিশ্বাস তাহলে খোদার সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে 'মুসলমানদের সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব' কায়েম করা যাবে।

## শাসন বিভাগ

শাসকসম্প্রদায় মুসলমান জনসাধারণদের ভোটেই নির্বাচিত হবে এবং মুসলমানরা তাদের পদচ্যুতও করতে পারে। এরা 'শরিয়তে' যে-সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিধান নেই সেগুলো সম্বন্ধে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে, এটাকে 'ইজমা' বলা হয়। সংক্ষেপে, মুসলমানরা মজলিস এবং 'আমির নির্বাচন করবে। 'আমির' খোদায়ী বিধান (যা কিনা কোরাণ, হদিস এবং বিভিন্ন সময়ের 'ইজমা'-তে পাওয়া যায়) অনুসারে শাসন করবে। আমির' 'মজলিস'-এর মতামত নেবে কিন্তু যদি 'আমির'-এর সঙ্গে মজলিসের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে শেষ কথাটা বলবে 'আমির'। 'আমির'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা 'চরম পাপ।'

তবে 'আমির'-কে মনে রাখতে হবে যে সে খোদার বিধানগুলো কার্যকরী করার যন্ত্র মাত্র। এগুলোর মধ্যে আবার কতগুলো আছে 'অলঙ্ঘনীয়' বিধান. বাকি অনেক বিধান-ই 'ইজমা'-দ্বারা সংশোধন করা যায়, এই অলঙ্ঘনীয় বিধান বা 'কোরানেস', অর্থাৎ খোদার বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার অধিকারী কে? অধিকারী 'ইজ্‌তে হাদী'-রা, অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংবিধানের নামে 'মিযান-এর শাসন, অর্থাৎ মোল্লাদের শাসন।

## সাধারণ মানুষের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা

সমস্ত একনায়কতন্ত্রের মতোই ইসলামী-রাষ্ট্রের ধারণার পেছনে আছে জনগণের প্রতি এক সীমাহীন ঘৃণা। জনগণ নিজের ভালো বোঝে না। তারা 'নফসের খাহেস-দাস' অর্থাৎ (রিপুর সেবাদাস), রিপু বা 'নফস' নামক শয়তান দ্বারা চালিত। তাই তাদের একটা সীমা মেনে চলতেই হবে। কী সেই সীমা?

## পারিবারিক জীবনে

হদিস এবং কোরাণ অনুসারে অলঙ্ঘনীয় বিধানগুলোর মধ্যে পড়ে: (ক) পর্দা এবং সংসারে পুরুষের কর্তৃত্ব (খ) পিতামাতার অধিকার (গ) স্ত্রী:ধন এবং সম্পত্তি (ঘ) জেনা বা রকীয়া…ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'তালাক' কিন্তু অলঙ্ঘনীয় বিধানের মধ্যে পড়ে না। কারণ, মুসলমান-বিবাহটা যত-না ধর্মীয় তার থেকে অনেক বেশি আইন-

বিভাগীয়। অনেকটা আধুনিক 'রেজিস্ট্রি' বিবাহের মতো, 'গাওয়া' (সাক্ষী) 'উকিল' (ব্যাপিকা) প্রভৃতি মূর্ত সাক্ষীরাই 'বিবাহে'র যুক্তিসিদ্ধতা অনুমোদন করে। মৌলবী সেখানে ঘোষক এবং খোদার দরবারে 'বিবাহ'-টাকে অনুমোদন করার আর্জি পেশকারী মাত্র। এরই জন্য 'তালাক'-এর প্রশ্নটাকে সামনে এনে মৌলবাদীদের আঘাত করার জায়গাটা গুলিয়ে দেবার চেষ্টা কিন্তু কার্যত মৌলবাদীদেরই হাতকে শক্ত করে। দ্বিতীয়ত, বহুবিবাহ (চার) এবং 'তালাক' ব্যাপক মুসলমানের সমস্যা নয়। 'বাগো প্যাটের চিন্তা নাই, ট্যাহা লইয়া কি করম বুঝতে লারছে. চ্যাটের চিন্তা তাগো-র চিন্তা'। অর্থাৎ, সমস্যাটা 'যোনী'র নয়, জমির।'

মণিশঙ্কর আয়ারকে উদ্ধৃতি করে বলা যায়, '...এই যৌন-ঈর্ষাই বি-জে-পি'র সাধু এবং সাধ্বীদের মুসলমান নিকেশে ঠেলে দেবার অন্যতম কারণ।'

ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো কি? না হলে গোলওয়ালকারের 'জাতি' আর মওলানা মওদুদি'র 'খোদায়ী গণতন্ত্রের' ফারাক একেবারেই নেই। এমন কি 'ব্যক্তি-আইনে'র (পার্সনাল ল') ক্ষেত্রেও না। তারা মুসলমানদের কুৎসিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য যে সব সংস্কারগুলো (কারণ, সংস্কার মানেই 'কু') তুলে ধরে, নিজেদের স্বপ্নের সংবিধানে সেগুলোই দাবি করে। এটা অবশ্যই লক্ষ্য করার বিষয়।

## প্রগতিশীলতার অন্তের বুজরুকি

'বুজরুকি' কথাটা 'নাকি বুজরুগ' অর্থাৎ নিজেকে জ্ঞানী' মনে করা থেকে এসেছে। 'জ্ঞানী'-দের ধাপ্পাবাজিটাই 'বুজরুকি' অর্থে ব্যবহৃত। এই 'বুজরুগ'-রাই ইসলামী রাষ্ট্রে সবচেয়ে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। এবার 'বুজরুকি'টা দেখা যাক:

(১) যে-যে কারণে অনেকে মুসলমান ধর্মকে সাম্যের অনেক কাছাকাছি মনে করেন তার একটা হলো 'স্ত্রীধন বা সম্পত্তি'র অধিকার। পুরুষের 'সীমাহীন এবং প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব'-এর সঙ্গে এই অধিকারকে মিলিয়ে দেখলে কী হয়, সেটা আমরা সায়রের বানু মামলায় দেখেছি। এটা মেয়েদের ঘরে বন্দী করে রেখে যথেচ্ছ ব্যবহার করার (মেয়ে ভোগ করার) একটা ফাঁদ। এটা

যদি 'বিপ্লবী' হয় তো 'লালবাত্তি' এলাকাগামীদের সেখানকার মহিলাদের "টাকা' 'গয়না' দেওয়াটাও 'বিপ্লবী'। দুটোই হলো বাধ্য-বাধকতায় দমবন্ধ করার খাঁচা।

(২) 'পরকীয়া' বা 'জেনা' মুসলমান ধর্মে অর্হিততম পাপ। দর্শনটা কিন্তু আবার সম্মান বা মানসিক ক্ষতিটাকে বিচারে আনে না (যেমন ধর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের বিচার-ব্যবস্থা করে থাকে)। এটা পাপ, কারণ অন্যের ভোক্তা বা সম্ভাব্য ভোক্তাকে তুমি ভোগ করেছ তাই ··। অর্থাৎ, চুরি কিংবা ডাকাতির সমপর্য্যায়ের ব্যাপার। এহ বাহ্য। এই পাপের বিচার করবে কে?

হাদিস বলছে: সেই ব্যক্তিই এই বিচার করতে পারে, যে জীবনে মনে মনেও কোনোদিন জেনা করে নি। (অর্থাৎ, যার 'স্বপ্নদোষ' হয়নি!) এরকম বিচারক তো মেলা ভার। নেই, নেই, নেই, তাহলে কী বিচার হবে না? তা তো হবেই। যার টাকা আছে সে এরকম 'কাজী' খুঁজে পাবে। 'ইজতে-হাদী'রা তাকে অনুমোদন করবে। ব্যস! ব্যাপারটা একেবারে মনুসংহিতার মতোই ঘটবে—ব্রাহ্মণরা যদি এই কাজ (পরগামিতা) করে তাহলে তাকে তার সম্পত্তিসহ নির্বাসন দাও। শূদ্ররা করলে একটা একটা অঙ্গচ্ছেদ করে কোতল করো!

## শেষ কথা

শরিয়তী আইন ধ্বংস হোক, এটা তাই বি-জে-পি চায় না। কারণ, তারা নিজেরাও এই আইনের অনুসারী। জনসাধারণকে ভয় বরাবার, আতঙ্কিত করার এমন সুন্দর ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদও হাত ছাড়া করে না। তাই, এদেশে যারা আর-এস-এস, বাংলা দেশে বা পাকিস্থানে তারাই 'জামায়েত'। একই প্রভু, একই স্বার্থ, একটাই লক্ষ্য: পৃথিবীটাকে একটা মাত্র প্রভুর অধীনে আনা। এটাই মৌলবাদের মৌলিক ধান্দা। বাকি সব কথার কথা।*

---

* লেখক দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ও পুলিশী নির্যাতনে এখন প্রায়-পঙ্গু। সেই অসুস্থ অবস্থায় লিখেছেন তিনি এই নিবন্ধটি। বলাবাহুল্য, সব মতামতই লেখকের নিজস্ব। পাঠকেরাও তাঁদের মতামত জানাতে পারেন, আমরা প্রকাশ করবো।

# মহাকাব্য ও মৌলবাদ

'মিথ্'-এর আভিধানিক অর্থ 'পৌরাণিক কাহিনী'? মানি না। মিথ্ মিথ্যা? না। কোনো সত্যের বীজ 'অতিকথা' হয়ে ক্রমশ বাস্তবের আঙিনা ছাড়িয়ে মিথ্ হয়ে ওঠে। সেখানে সত্য-মিথ্যা মেশামেশি হয়ে যায়। 'রামায়ণ' মহাকাব্যের নায়ক রাম ঐতিহাসিক চরিত্র নন। অথচ তিনি মিথ্ হয়ে গেলেন, অবতার হিসেবে মান্যতা পেলেন। সেটা টেনে বুনে করা। একটা মিথ্যার শিকড় ক্রমশ চারিয়ে গেল একদল মানুষের মধ্যে। এখানে মিথ্ মিথ্যা হলো।

আরেকটি মহাকাব্য 'মহাভারত'। সেখানে ইতিহাসের স্পর্শ কখনো-সখনো পাওয়া যায়। কিন্তু এলোমেলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের যুক্তিতে মেলে না। তবু মিথ্-তত্ত্ব খাটানো যায়। কিন্তু এই তত্ত্ব দিয়ে কৃষ্ণকে অবতার বানানো কতটা যুক্তিগ্রাহ্য সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

একদল হিন্দু মৌলবাদী রাম-কৃষ্ণের নিরাপদ আড়ালে ধর্মরক্ষায় মেতেছেন। মূল হাতিয়ার মহাকাব্য দুটি। কিন্তু সেখানে অনেক অসঙ্গতি, জট। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জট খুলে অসঙ্গতিগুলি দেখাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ' বইতে। এ কথা তো মানতেই হবে যে, মৌলবাদের মূল দাঁড়া রাজনীতি। তা সাধারণত প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রয়োজনে বিষাক্ত নখ-দন্ত প্রকাশ পায়। হিটলারের ইহুদি-বিরোধিতার পিছনে রাজনীতি-নির্ভর ধর্মীয় মৌলবাদ ছিল সক্রিয়। এই মৌলবাদ ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে।

'রামায়ণ'কে কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে ধর্মগ্রন্থে রূপান্তরিত করা হলো। জয়ন্তানুজবাবু যথার্থই লিখেছেন, "ধর্মগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বাসীরা তার একটি কথাকেও কাল্পনিক বলে মনে করতে পারে না।" (পৃ. ৬)। মৌলবাদীদের প্রথম পর্বের জয় এইখানেই। পরবর্তী পর্বে

তাঁরা "বিশ্বাসীদের" একত্রিত করেন বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য। মৌলবাদী নেতৃবৃন্দ সাধারণত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাঁরা "বিশ্বাসী"র ভান করে মৌলবাদ-পোষিত রাজনীতিতে অনড় থাকেন। অস্ত্র হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করেন ধর্মতত্ত্ব ও অবতারবাদকে। কিন্তু রামায়ণের রাম অবতার হলেন কী করে। বাল্মীকি রামায়ণ "থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাম নামক একজন নরপতির উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে, কোন অবতারের বাস্তব ইতিহাসকে নয়।" (পৃ. ৭)। আদি কবি বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে একজন কাল্পনিক "বহুগুণসম্পন্ন নরপতির" ছবিই আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু "এই কাহিনীর অনেক প্রকারভেদ আছে" (পৃ. ৭)। জয়ন্তানুজবাবু নানা রামায়ণের নানা কাহিনীর কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হলে রামকে নিয়ে যে মিথ্-তত্ত্ব দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চলেছে তা সহজেই ফেঁসে যেত। দেখা যেত, আদতে রাম বলে বাস্তবে কেউ ছিলেনই না, নয়ত নানা কাব্যে তাঁর উপস্থিতি বিচিত্র কেন? এ ব্যাপারে সুকুমার সেনের দুটি রচনা—১. 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' (১৯৭৭) এবং ২. "রামকথার তত্ত্ব" ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৭৬-১৩৭৮ ব.)—নতুন আলোর সন্ধান দেয়। রাম-উপাসনা শুরু হওয়ার আগে যে রাম-কথা প্রচলিত ছিল সেটিই তাঁর আলোচ্য বিষয়। "ঋগ্‌বেদে রামকথার পাত্রপাত্রীদের পূর্বাভাস" পাওয়া গেছে এবং কোনো কোনো রামকথায় রাম-সীতা ভাই-বোন এবং রাজা-রাণী। অর্থাৎ, ভাই-বোনে বিয়ে হয়েছিল। বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীতে যে রামকথা পাওয়া যায় তার গল্পে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একটি চীনা অনুবাদে কারো নাম নেই; আবার কোনোটিতে রামের স্ত্রীর কোনো উল্লেখই নেই। জৈন রামকথাও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সেখানে সীতা রাবণ-মন্দোদরীর মেয়ে। দশরথ যুদ্ধে হেরে গেলে কৈকেয়ী নিজে যুদ্ধ করে দশরথের রাজ্য উদ্ধার করে বর পান এবং রামকে বনবাসে পাঠান। রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভরত রামকে বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। রাবণকে বধ করেছিলেন লক্ষ্মণ, রাম নয়। দেশ-বিদেশের অনেক কাহিনী বিশ্লেষণ করে সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, সেগুলিতে রামকথার উড়ো বীজ কখনো অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়েছে বা হয়নি। কিন্তু বীজ থেকে গেছেই। কোনো ক্ষেত্রেই এই গল্পগুলি ধর্মীয় স্পর্শ পায়নি।

জয়ন্তানুজবাবু বাল্মীকি-রামায়ণ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন, রামায়ণ হচ্ছে "উচ্চস্তরের কল্পিত উপাখ্যান এবং মহাকাব্য, সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ, কিন্তু বাস্তব ইতিহাস নয়।" (পৃ. ১০)। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, রামের জন্মস্থান কবির মনোভূমিতে। কিন্তু কালে-কালান্তরে মূল রামায়ণের উপর নানা কাহিনীর প্রক্ষেপণ মহাকাব্যটিকে ভক্তি-রসাশ্রিত ধর্মীয় গ্রন্থে রূপান্তরিত করেছে। এই রূপান্তর ঘটেছে তুলসীদাস-কৃত্তিবাসের হাতে। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে এঁদের রামায়ণ অনেকটাই আলাদা। "প্রকৃতপক্ষে তুলসী-রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের ফলশ্রুতি। রামের অবতারত্বকে ভিত্তি করে এবং ভক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রধানত ভক্তি-সাহিত্য হিসেবেই রামায়ণের এই দুই সংস্করণ রচিত হয়েছিল। তুলসী-রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ইতিহাসও নয়, মহাকাব্যও নয়, ভক্তিকাব্য মাত্র।" (পৃ. ১৮)। ফলে, রাম হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের অবতার। তার উপর আরোপ করা হলো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে নিয়ে মিথ্ তৈরি হলো। কিন্তু তা মিথ্যা। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি জে. এল. ব্রকিংটন তাঁর 'Righteous Rama : The Evolution of an Epic' (Delhi, 1984) বইতে দেখিয়েছেন, কি ভাবে রামায়ণের কাহিনী ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আগেই বলেছি, সুকুমার সেন দেশি-বিদেশি অনেক কাহিনীতে রামকথার বীজের সন্ধান পেয়েছেন, যোগসূত্রের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধানী দৃষ্টি আরো প্রসারিত আর্থার লিলি, আলব্রেখট্ ওয়েবার এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। তাঁরা হোমারের ইলিয়াড-ওডিসির সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অবশ্য সম্ভব হয় নি। তবে জয়ন্তানুজবাবুর মতে, "এমনও হতে পারে যে রামায়ণ ও ইলিয়াড এই দুই মহাকাব্যই আরও প্রাচীন কোনও উৎস থেকে এসেছে।" (পৃ. ১৭)। এই মতের সমর্থন গবেষক-পণ্ডিতদের রচনায় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, হোমারের রচনায় মহাকাব্যিক মর্যাদা অটুট রইল, ক্ষুণ্ণ হলো রামায়ণ ভক্তিবাদীদের দৌরাত্ম্যে। হোমারের কাব্যের কোনো চরিত্রে অবতারত্ব আরোপিত হয়নি, যেমন হয়েছে রামায়ণে।

অবতারত্ব ও ধর্মীয়তাব প্রসঙ্গ সরিয়ে রাখলে, রামায়ণ বিভিন্ন সময়ের যে সামাজিক-বার্তা বহন করে চলেছে তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সময়ের বলছি

এই কারণে যে, বিভিন্ন সময়ে রামায়ণে যে প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়েছে তাতে সেই সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থাই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। রামায়ণ থেকে আর্থ-সামাজিক সত্যানুসন্ধানের সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ, "রামায়ণের সর্বত্র অসংখ্য অলৌকিক এবং অসম্ভব ঘটনা ছড়িয়ে আছে, যা বাস্তবতার নিরিখে মিথ্যা।" (পৃ. ৫৮)। অবশ্য "তৎকালীন সাহিত্যিক বিচারে মহাকাব্যের লেখকদের...অলৌকিক ও অবাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে কাহিনী রচনা করার অধিকার ছিল।...বাস্তবতা অর্থে সত্যকে রামায়ণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।" (পৃ. ৫৯)। তাই রামায়ণের সত্যাদর্শের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। রাম পিতৃসত্য রক্ষায় তাগিদে বনে গিয়েছিলেন। তাতে দশরথের সত্য রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু দশরথ "রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত" করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সহজেই ভঙ্গ করেন। কামাসক্ত দশরথ তার পূর্বশর্ত পালন না করে সত্যকে দমন করেছেন। "লক্ষ্মণ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে রামকে বোঝালেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে রামেরই যৌবরাজ্যে অধিকার, তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার নিজ শপথ ভঙ্গ করে কামাসক্ত বৃদ্ধরাজা কৈকেয়ীকে যে বর দিয়েছেন তা অন্যায় এবং মূল্যহীন।" (পৃ. ৬৪)। রামও বনবাসে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে, এবং অযোধ্যায় ফিরে এসে সীতার সঙ্গে ব্যবহারে ন্যায়ধর্মের অপলাপ করেছেন। ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে সমস্ত কীর্তিকলাপ করেছেন তাতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের শ্রেণীস্বার্থই শুধু রক্ষা পেয়েছে। আর, সেই ধর্মীয় অনুশাসনই ন্যায় ও সত্য বলে প্রচারিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা যে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন তাতে বৃহত্তর অর্থে মানুষের কোনো স্থান ছিল না। শূদ্রদের রাখা হয়েছিল ব্রাত্য করে। উচ্চবর্গের মানুষ "ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, জাগতিক ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দের একচ্ছত্র এবং নির্বিরোধ আধিপত্য, আর শূদ্রের নারকীয় দুর্দশাকে চিরায়ত করার চেষ্টা করে।" (পৃ. ৬৯)। কিন্তু শূদ্ররাই তো সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। গোটা সমাজই তাঁদের উৎপাদনের উপর দাঁড়িয়ে। পল্লবিত রামায়ণের ধর্ম-সত্য-ন্যায়নীতি শূদ্রদের কাছে কোনো উপহারই আনে না।

সমাজে শূদ্রদের দুরবস্থার পাশাপাশি নারীর স্থান ছিল নিচে। তাঁরা সামাজিক অনুশাসনে শৃংখলিত। "মনুস্মৃতি নির্দেশিত নারীর পারিবারিক এবং সামাজিক হীনস্থান, তাঁর আজীবন অসহায় পরাধীনতা, আর নারীকে

পুরুষ কর্তৃক যদৃচ্ছা লোষ্ট্রবৎ গ্রহণ কিংবা ত্যাগ করার অধিকারও রামায়ণে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত এবং সমর্থিত।" (পৃ. ১০)। সীতার যৌন একনিষ্ঠতা ও সতীত্বের আদর্শ রামায়ণে নারীচরিত্রের প্রতীক হিসেবে বর্ণিত; কিন্তু দশরথের বহুপত্নী, রামচন্দ্রকে সুন্দরী যুবতীদের দ্বারা পরিচর্যা প্রভৃতি পুরুষদের অবাধ যৌন অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু তাই নয়, "লংকায় বাসকালে সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে রাম অকারণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং সর্বসমক্ষে সীতার প্রতি অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেছেন।" (পৃ. ১১)। ভগবানের অবতার রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষায় বাধ্য করেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও বনবাসে পাঠিয়েছেন এবং সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর কোনো খবরই নেন নি। এই বীরপুরুষ অবতারটি ধর্ম-সত্য-ন্যায়নীতিকে দলিতই করেছেন। রামায়ণে সত্য দলনের রূপটি জয়ন্তানুজবাবুর কলমের খাঁচড়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, এই রামচন্দ্রই মৌলবাদীদের আন্দোলনের হাতিয়ার। আর এই হাতিয়ারই নাকি তাঁদের এনে দেবে জয়; যে-জয়ধ্বজা উড়বে তাঁদের কল্পিত রাম রাজত্বে। অর্থাৎ, মহাকাব্যের নায়ক রাম হয়ে গেলেন রাম-অবতার। বাল্মীকি নয়, তুলসী দাস-কাশীরাম দাসের সৃষ্টি একালের মৌল-বাদী রাজনীতিকদের অস্ত্র।

ইতিহাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য যুক্তি-নির্ভর। কোনো অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস মানে না। অলৌকিকতার উপর নির্ভর করে "আমজনতা"র জন্য "মহাকাব্য এবং পুরাণ কাহিনী রচনার মাধ্যমে দুটি লোকপ্রিয় ঐতিহ্য সৃষ্টির" (পৃ. ২৩) প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই রামায়ণের মতো মহাভারতও ঐতিহাসিক সত্য নয়। এটি শুধুই মহাকাব্য। ইতিহাসের স্পর্শ কখনো-কখনো পাওয়া গেলেও তা কাব্য-কল্পনার তোড়ে ভেসে গেছে। "বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের"ও তাই মত। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত, অতিপ্রাকৃত ও মিথ্যা অংশ ত্যাগ করে প্রকৃত ইতিহাসের অনুসন্ধান করে কৃষ্ণচরিত্র উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাংও মনে করেন, "মহাভারত মূলত একটি দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা, যুদ্ধ, রাজনীতি এবং সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিচায়ক মহাকাব্য।" (পৃ. ২১)। সেখানে মহাভারতের কাহিনী-গুলিকে ঐতিহাসিক ধ্রুব সত্য মনে করার তেমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কতটা ঐতিহাসিক সে বিষয়েও ঘোরতর

সন্দেহ আছে। হয়তো "দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে যুদ্ধকে ধর্মতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে কাল্পনিক কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।" (পৃ. ৩০)। ইতিহাস পাণ্ডবদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। কবিকল্পনায় তাঁদের স্থিতি, পরবর্তীকালে তা নানা পথে বাহিত হয়ে স্থান পেয়েছে জনমানসে। বিকল্পপিতার ঔরসজাত পাণ্ডবদের নাম মহাভারতের সমকালীন অন্যান্য বইতে মেলে না। পাঞ্চালদের পরিচয় পাওয়া যায়। "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কৌরব ও পাঞ্চালদের মধ্যে হয়েছিল, কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে নয়।" (পৃ. ৩০)। পরিবর্তিত মহাভারতে সম্ভবত পাণ্ডবেরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং কালক্রমে এই মহাকাব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর কৃষ্ণ পরিচিত হয়েছেন ভগবানের অবতার হিসেবে। অবতার তৈরি করার জন্য কিছু কিছু অলৌকিকত্ব চাপানো হয়েছে তাঁর উপর। পণ্ডিতেরা মনে করেন, "মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক।" (পৃ. ৩৪)। কৃষ্ণের অলৌকিকত্বের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মহাকাব্যে বর্ণিত কৃষ্ণ তাঁর গোটা "জীবনে চারবার বিশ্বরূপ প্রদর্শন সহ অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন।" (পৃ. ৩৮)। ন্যায়-নীতির রক্ষক হিসেবে যাঁকে মনে করা হয়েছে, তিনিই নানান ফন্দি-ফিকিরে সত্য-ধর্মকে দলিত করেছেন। আবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ধর্মীয় তাৎপর্য তাঁর দার্শনিক চিন্তনেরই ফসল—এ মতও বেশ চালু আছে। গীতায় প্রতিফলিত দর্শন তো ব্রাহ্মণ্য সমাজশাসিত সমাজের উপরিকাঠামোর অনুশাসন ভিত্তিক বক্তব্য। ব্রাহ্মণদের দোসর ছিল ক্ষত্রিয়রা। গোটা সমাজকে রক্ষা করার জন্য অবতারত্বের মিথ তৈরির প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেছেন। এদিক থেকে কৃষ্ণ হলেন মিথ, তাঁকে বানানো হলো অবতার। এই চরিত্রটির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকায় 'মিথ'টি মিথ্যায় পর্যবসিত হলো। আর, এই মিথ্যা-মিথ-কেন্দ্রিক অলৌকিক অবতারত্বের পিছনে স্বাভাবিক কারণেই ইতিহাসের সমর্থন না থাকায় কৃষ্ণ অবতার হিসেবে আমাদের মান্যতা পান না। সেকালের সমাজ কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশেষ প্রয়োজনে। জয়ন্তানুজবাবু লিখছেন, "যে সময় গীতা রচিত হয় তা ছিল হিন্দুধর্মের দুঃসময়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক প্রসার হিন্দুধর্মকে অনেকখানি কোণঠাসা করে ফেলেছিল। বৌদ্ধধর্মের এই সফল চ্যালেঞ্জের মূলে ছিল একদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং আচার-অনুষ্ঠানের শিলীভূত ঐতিহ্য আর অর্থহীন আতিশয্য, আর অন্যদিকে বংশানুক্রমিক বর্ণ-

ভেদজনিত অমানবিকতা আর সামাজিক অবক্ষয়। এই দুই বাধাকে উত্তরণ করে এক নূতন অবতারতত্ত্ব এবং ভক্তিবাদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা এবং হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটানোই ছিল গীতার প্রধান উদ্দেশ্য।" (পৃ. ৪৫)।

দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণ নাকি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রজাহিতকর মঙ্গলময় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলাই যদি ধর্মরাজ্যের সংজ্ঞা হয়, তবে পরবর্তি রামায়ণের রামরাজ্য অনেক ত্রুটি ও বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কিছুটা বাস্তবায়নের মুখোমুখি হয়েছিল; কিন্তু "কোনো প্রজাহিতকর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা মহাভারতে নেই।…চতুর্দিকে চলতে লাগল শুধু বিশৃংখলা, মৃত্যু আর ধ্বংসের অব্যাহত অভিযান।" (পৃ. ৪৭-৪৮)। এ সমস্তের মূলে যে-কৃষ্ণ, তিনি ভগবানের অবতার হন কিভাবে? আসলে তিনি "ক্ষত্রিয়দের আনুকূল্যে মানব সমাজে বেদ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা" (পৃ. ৫০) করতে চেয়েছিলেন, ধর্মরাজ্য নয়। কৃষ্ণের উপর বিষ্ণুর অলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠা "মৌলবাদের দুর্বার বিষবৃক্ষ" (পৃ. ৫৪) রোপণের ইঙ্গিতবাহী।

পরবর্তি অলৌকিক কাহিনী-ভিত্তিক মহাকাব্য দুটিকে মৌলবাদীরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন, এই সত্য জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান। তথাকথিত ন্যায় ও আদর্শবাদী চরিত্রগুলি নিজেদের প্রয়োজনে মিথ্যা-ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন, তাও তিনি দেখিয়েছেন। বিশ্লেষণ করেছেন ধর্ম ও খাদ্য বিষয়টিও। কারণ, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মৌলবাদীরা সংঘাত সৃষ্টিতে তৎপর। আর এই সংঘাত সৃষ্টির মূলে রয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা।

মহাকাব্যের নায়কদের জন্ম কবির কল্পনায়, মানসলোকে। ঈশ্বরের অবতার হিসেবে তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব অলীক ভাবনা। পৃথিবীর অন্যান্য মহাকাব্যে বহু চরিত্র অলৌকিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হলেও তাঁরা কখনোই অবতার হয়ে ওঠেননি। কাব্যের আঙিনায় তাঁদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তি কাল্পনিক কাহিনীতে বিশ্বাস জন্মানোর ফলেই রামের জন্মভূমি নিয়ে বিতর্ক; আর এই বিশ্বাস তৈরির পিছনে রয়েছে অশুভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। মৌলবাদীদের অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন জয়ন্তবাবু। এই সময়ে তাঁর 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ' বইটি অত্যন্ত জরুরি।*

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

---

* মহাকাব্য ও মৌলবাদ। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা। দাম: পঁয়ত্রিশ টাকা।

# বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনাপর্বের ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশে কমিউনিজমের আদর্শ এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের সক্রিয়তা সাত দশক কাল অতিক্রম করেছে নানা ঘাতও-প্রতিঘাত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রকৃত অর্থে মার্কসবাদী সংগঠন সমূহের ভূমিকা যে একটি বিশিষ্ট মাত্রা সংযোজন করেছিল, তা-ও আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। সে-কারণেই বলা যায়, এই সত্যটিকে নানাদিক থেকে বিচার এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনও এখন তীব্রভাবেই অনুভূত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় একটি বড় অংশই তাই হচ্ছে প্রদেশের বামপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষিত, পরিসর এবং সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে।

বলাবাহুল্য বিষয়টি ব্যাপক এবং গভীর বলেই এ-সংক্রান্ত গবেষণা কর্মকেও একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক চিন্তনক্রিয়া হয়ে উঠতে হয়, যেখানে ইতিহাস-অর্থনীতি-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ সবকিছুই এক অন্তরঙ্গ বুনটে নিবিড় হয়ে থাকে। অবশ্যই তার অর্থ এই নয় যে, প্রদেশের বামপন্থী আন্দোলনের কোনো বিশেষ দিক নিয়ে গভীর আলোচনা সম্ভব নয়। খুবই সম্ভব। সেখানে কোনো একটি বিশেষ উপাদান বা অংশ বিশেষভাবে আলোকিত হতেই পারে।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি, শ্রীঅমিতাভ চন্দ্র-র 'অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনাপর্ব', একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিসরে এবং নির্দিষ্ট কালসীমায় কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপের সৃষ্টি ও পুষ্টি বিষয়ে আলোকপাত করেছে। সাধারণভাবে সূচীপত্র অনুযায়ী আলোচনার কালসীমা ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫ হলেও, লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি-সম্পর্কিত আলোচনায় ১৯৪১ সালেই ছেদ টানা হয়েছে।

বইটির আলোচনা মূল তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূচনাকাল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে লেখক ১৯২৮ সাল থেকেই মূলত আলোচনা শুরু করেছেন। এই পর্বের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে এসেই। এই অধ্যায়ে লেখক যে খুব নতুন কোনো তথ্য পরিবেশন করেছেন এমন বলা যাবে না। এযাবৎ এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত-যেসব গবেষণামূলক কাজ হয়েছে, তারই ভিত্তিতে

একটি সামগ্রিক রূপরেখা আঁকার চেষ্টাই লেখক করেছেন এই অধ্যায়ে। তবে অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হিসাবে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে লেখকের মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন, তিরিশের দশকে গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত আইন-অমান্য আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "কমিউনিস্ট পার্টি এই গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব-প্রদানের সঠিক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে গেল কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের হাতে এবং তাঁরাও তাঁদের প্রয়োজন মতো এই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে সমর্থ হলেন।" এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সদলে সক্রিয়ভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলেও কি তাদের পক্ষে নেতৃত্বের স্তরে যাওয়া সম্ভব হতো? সি. পি. আই তখন তো নিতান্তই সদ্যোজাত। তাই এই অর্থে ব্যর্থতার প্রশ্ন অবান্তর। আরেকটি প্রসঙ্গেরও অবতারণা করা যায়। সেটি হলো: এই প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকে লেখক বলেছেন, "The Proletarian Path, দলিলের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার কথাও বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছে।...কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই রয়ে গেল তত্ত্বের স্তরে সীমাবদ্ধ, বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ আর হল না।" কেন হলো না-এর জবাব খুঁজতে গিয়ে লেখক একদিকে কংগ্রেস সংগঠন সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের আস্থা এবং অন্যদিকে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সম্পর্কে তাদের 'অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী'কেই মূলত দায়ী করেছেন। এও বলেছেন যে, 'অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যাজনিত শক্তির অভাবকেও এর সঙ্গে যোগ করা দরকার।' কিন্তু এই পর্বে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও সংকটের মূল্যায়নও যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তার আভাস লেখকের বক্তব্যে পাই না। কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক বক্তব্যের প্রায়োগিক ব্যর্থতা কোনো সরলরৈখিক বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ধরা পড়বে না বলেই আমার মনে হয়। তদুপরি, এই অধ্যায়ে লেখক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার কমিউনিস্ট কর্মীদের কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে কাজ করার ব্যাপারে সময় বিশেষে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন, তারও নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা জরুরী ছিল। একথা এখন আমাদের জানা হয়েছে যে, গান্ধী নেতৃত্বের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে

ব্যক্ত হয়েছিল—নেতৃত্বের নানা স্তরে এবং তৃণমূলেও। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসী রাজনীতির শ্রেণীগত সমঝোতা আর বিন্যাসও সর্বত্র সমান ছিল না। এই প্রেক্ষিতে বাংলায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে বহুধাদীর্ণ কংগ্রেসী নেতৃত্ব ও রাজনীতির প্রকৃত সম্পর্কটি কেমন ছিল, তার আলোচনাটিও প্রাসঙ্গিক। এই আলোচনা না করলে বাংলায় গণরাজনীতির পরিমণ্ডলে উদীয়মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যাই হোক, এরকম কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও লেখক ওই বিশেষ কালপর্বে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয়তার যে-রূপরেখা এঁকেছেন তাতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার একটি সুস্পষ্ট ছবি আছে।

এই বইয়ের সব থেকে মূল্যবান অংশ হলো এর পরবর্তী দুটি অধ্যায়। 'জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম'-শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে অনেক হারিয়ে যাওয়া নাম ও তথ্য পুনরুদ্ধার করেছেন। বস্তুতই 'কিভাবে একের পর এক কমিউনিস্ট গ্রুপ নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মূল কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ক'রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই মূল ধারাটিকে শক্তিশালী করে তুলেছিল' লেখক তার তথ্যসমৃদ্ধ সনিষ্ঠ প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এদেশের বামপন্থী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব যে কোনো বিদেশী অঙ্গুলি চালনায় হয়নি, তার প্রতিবাদী-প্রমাণ অমিতাভ চন্দ্র-র এই বইটিতে প্রভূত পরিমাণে আছে। এদেশের জল-হাওয়া আর মাটির রসের মধ্যেই বামপন্থার মূলটি যে দৃঢ় ছিল, একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ-পরিক্রমার মধ্যে দিয়েই যে তার শ্রীবৃদ্ধি, অমিতাভ চন্দ্র তারই উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন।

'বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে সহযাত্রী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। এমনকি এইসব সহযাত্রী বামপন্থী সংগঠনগুলির অভ্যন্তরেও কমিউনিস্ট পার্টির সুহৃদদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধীদের দ্বন্দ্বের বিবরণও শ্রীচন্দ্র তথ্যসহযোগে তুলে ধরেছেন। প্রকৃত অর্থে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আন্দোলন যে বহু সংগ্রাম এবং উদ্যমের মিলিত পূর্ণ প্রবাহ, সেই ঐতিহাসিক সত্যটিও এই বইতে পরিস্ফুট হয়েছে।

এছাড়া এই বইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে গবেষক অমিতাভ চন্দ্র-র উদ্যোগী

অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসনিষ্ঠ মনের পরিচয়ও। তবে বইটি মূলত পৃথক কিছু প্রবন্ধের একত্রীকরণ বলে অনেক জায়গাতেই বিবরণে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় পরিমার্জনা আরো কঠোর হলে ভালো হতো। অধ্যায়গুলির মধ্যে বিভিন্ন উপশিরোনামের ব্যবহার যথাযথ হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে 'পূর্বকথা' ও 'মূল্যায়ন' কিছুটা অপরিণত আত্মিক-ভাবনা বলে মনে হয়েছে। এসব সত্ত্বেও বইটি বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আশা রাখি। বিশেষ করে আন্দোলনের সূচনাপর্বে তৃণমূল স্তরে কীভাবে উদ্দীপনা ও সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে বাংলার বামপন্থী চেতনার ধারকরা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সামিল হওয়ার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টের আন্দোলনে এসে মিলেছিলেন, তার ঐতিহাসিক প্রতিবেদন লেখক নিষ্ঠাভরে রচনা করেছেন। অমিয় ভট্টাচার্য কৃত বইয়ের প্রচ্ছদটিও সুন্দর। এদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক সংকটকালে দাঁড়িয়ে শিকড়-সন্ধানী এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতেই হয়।*

অজেয়া সরকার

* অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনাপর্ব। অমিতাভ চন্দ্র, পুস্তক-বিপণি। দাম : ৪০ টাকা।

## রাতের চেয়েও কালো এই কয়েদখানা

জেলখানা ও জেলখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলায় কিছু বই লেখা হয়েছে, তার বেশির ভাগ-ই লিখেছেন রাজবন্দীরা, আর সে-লেখায় রাজবন্দী জীবনের কাহিনী মুখ্য হয়, অর্থাৎ রাজবন্দীদের সমস্যা জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে মতবাদ নিয়ে তর্ক বিতর্ক ইত্যাদি এবং আরও আনুষঙ্গিক কথা। কিন্তু ঐসব লেখায় জেলখানার মধ্যে অন্যান্য অধিবাসীদের কথা (যেমন সামান্য অসামান্য অপরাধী বিনা কারণে বন্দী অপরাধী) পাওয়া যায় না। রাজবন্দীরা অন্য অপরাধী বা নির্দোষীদের সঙ্গে জেলখানায় সুযোগ

পান না বলে হয়ত তাদের কথা উহ্য থেকে যায়। রাজবন্দী এবং চোরডাকাত খুনে কিংবা পাগল বন্দীদের মধ্যে বিভেদ বেশ স্পষ্ট, তাদের মধ্যে বার্তা বিনিময় দূরের কথা দেখাশোনাও কদাচিৎ হয়, এটা শাসকদেরই একটা কৌশল। রাজবন্দীরা অনেক সুযোগ পান, যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত অধিকাংশ জেলবন্দী। এই অধিকাংশ নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবনা চিন্তা থাকে না। কারণ এদের বেশির ভাগই নিরক্ষর এবং এমন সব অপরাধে অভিযুক্ত সমাজ যে অপরাধকে হেয়, ঘৃণ্য, বিগর্হিত মনে করে। ফলে এদের উপর দারুণ অত্যাচার হলে কিংবা অত্যাচারের ফলে এদের মৃত্যু ঘটলেও কর্তৃপক্ষের কিছু এসে যায় না—কারণ এরা লিখতে পারে না বা গুছিয়ে বিবৃতি দিতে। আর তা পারলেই কি এদের লেখা বা বিবৃতি ছাপা হতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায়?

সুখের কথা এইসব অনাদৃত বন্দীদের (পুরুষ মহিলা) কথা অধুনা জানা যাচ্ছে দু-একজনের লেখায়, এর মধ্যে জয়া মিত্র ও মীনাক্ষী সেনের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। ভাবতে অবাক লাগে, এ-ব্যাপারে তেমন উল্লেখ্য অবদান রাখেন নি কোন পুরুষ রাজবন্দী। অন্যের দুঃখ দুর্দশা দেখে একজন মহিলা যত ব্যথিত হন, একজন পুরুষ হয়ত তেমনভাবে আলোড়িত হন না বা তাঁরা নিজেকে নিয়ে এমন ব্যাপৃত থাকেন যে অন্য কিছু দেখার অবকাশ পান না, বা এও হতে পারে তাঁরা এদের নিয়ে লেখা তেমন জরুরি মনে করেন না। কারণ যাইহোক, দুজন লেখিকা কিন্তু আমাদের এবিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে।

জয়া মিত্রর লেখা গ্রন্থাকারে আগে বের হলেও, মীনাক্ষী সেন ১৯৮০ সাল থেকে স্পন্দন সাহিত্য পত্রে নানা নামে লিখে চলেন তাঁর অভিজ্ঞতা, যে সব অপরাধীদের তিনি চিনেছেন তাদের কথাই লিখেছেন, "যে অপরাধীরা দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিলো, তাদের কথা লেখা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" আর তাঁর দেখাশোনার কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখে ফেলেন বিনা অপরাধে বন্দিনীদের কথা, কারণ "কোনো জেলে বন্দিনীদের শতকরা ষাট জন যদি হয় নিরপরাধ" লেখিকা কি করতে পারেন তবে?

"আসলে-নিরপরাধ কিন্তু বিচারাধীন বন্দিনী, কিংবা বিচারের ভুলে দোষ না করেও শাস্তি পাওয়া বন্দিনীরাই নয়, যারা আইন-আদালত, সমাজ-সরকার কারো কাছেই ঘোষিত অপরাধী নয়—সেই নিরপরাধ অনাভিযুক্ত মানুষদের

ঘৃণ্যতম অপরাধীর মতো কারাবাস করতে যেথার পর" লেখিকার মনে এদের কথাই স্বাভাবিক ভাবে জেগে ওঠে, এই ভাবে এদের নিয়েই একের পর এক লেখা হয় "জেলের ভেতর জেল" ( পাগলবাড়ি পর্ব ) বইটি। "পাগল ব'লে চিকিৎসার জন্য যেদিন জেলে পাঠানো হয়েছিল—সেদিনই তো নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল তার ভাগ্য।" সেই ভাগ্যে লেখা ছিল দারুণ শারীরিক নির্যাতন সহ অনাহার কু-আহারের প্রচণ্ড প্রহার, "তাই মৃত্যু, আধা মৃত্যু, উন্মাদ, বদ্ধ-উন্মাদ—যে কেউই মারা গিয়ে থাক—তার শরীরে অবশিষ্ট আছে শুধু হাড় আর চামড়া। যেন কোনো রক্তচোষক শুষে খেয়েছে তার শরীরের সব রক্ত, এমন কি মাংসও।",

পুরুষ-শাসিত সমাজে জেলখানার বাইরে যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে এই বন্দিনীরা, তারা জেলখানার ভিতরে তার চেয়েও নির্মম যন্ত্রণা পাবে—এতো জানা কথা। কিন্তু সে যন্ত্রণা যে কি ভয়াবহ তা "জেলের ভেতর জেল" না পড়লে জানা যেত না। সামান্য রোদ্দুর পেলে বেঁচে যেত, যে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—তোমরা ভালো আছো ?, তারা কি অপরাধ করেছিল—সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি না, মীনাক্ষী আমাদের জানিয়েছেন—কি হয় তাতে ?

মীনাক্ষী খুব দরদ দিয়ে এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখেছেন বলে তাঁর লেখা এত আন্তরিক হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হয়, হয়ত এক এক সময় থামতে উঠতে হবে পাঠককে দুঃসহ নির্যাতনের কথা পড়ে। মীনাক্ষী সেনের বলার ভঙ্গিটি বেশ ঘরোয়া, গভীর ও সাবলীল, তাই "জেলের ভেতর জেল" এক অনন্য গ্রন্থ হয়ে ওঠে। আমরা আশা করবো, মীনাক্ষী "জেলের ভেতর জেল"-এর অন্যান্য পর্ব লিখে ফেলবেন, কারণ তা লেখা জরুরি—এসব কথা, অভিজ্ঞতা মানুষকে জানানো দরকার। মানুষ সচেতন হলে চাপ সৃষ্টি হবে, তখন জেলের চেহারা পালটাবে আশা করি।*

* জেলের ভেতর জেল। পাগলবাড়ি পর্ব। মীনাক্ষী সেন, প্রতিক্ষণ, কলকাতা ৭৩। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

কার্তিক লাহিড়ী

# সমুদ্রে যাবার আকুলতা

শুধু সমালোচকদেরই নয়, কবিদেরও কবিতা সম্পর্কে নানা ধারণা থাকে। তবে একটি বিশেষ ধারণাকে আঁকড়ে ধরেই তাঁরা সাধারণত কবিতা রচনায় হাত দেন। কবি বিশ্বনাথ কয়াল ও তাঁর 'অনন্ত কল্লোলের মুখে' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে কবিতা সম্পর্কে প্রথমেই নানা প্রশ্ন তোলেন। এতেই বোঝা যায় তিনি সংকীর্ণ নন, অনেক উদার দৃষ্টিতে কবিতাকে দেখবার চোখ তাঁর আছে। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসও সেক্ষেত্রে তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। অবশ্য কাব্যসৃষ্টিতে ব্যক্তিহৃদয়ের ভূমিকাকেই অস্বীকার করবার উপায় নেই. এই কবি তা করেনও নি। বরং ভূমিকাতেই বলে নিয়েছেন যে 'ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপোড়েন ও বাঁকের ভিতর লেখা কবিতাগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেই প্রকাশ করা হল।' এটাই আসল কথা। মানুষের মনের নানা ওঠাপড়া অথবা আকস্মিক বক্রগতিই শেষ পর্যন্ত কবিতার জন্ম দেয়। এবং তাই চিরকাল দিয়ে এসেছে, বিশ্বনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর কবিতার অনেক বিষয়, কিন্তু এই ছড়ানো-ছিটোনো বিষয়গুলি যেন এক অদেখা সুতোয় বাঁধা রয়েছে। তা হচ্ছে কবির গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতি। এই অনুভূতিই ভালোবাসা, ঘৃণা, ক্রোধ অথবা প্রতিবাদের মাধ্যমে নানাভাবে প্রচারিত। তবে প্রেমের কবিতাই বোধ হয় বেশি, যথারীতি ভালোবাসার পাশাপাশি আসে হারানোর যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আসল পথই হল প্রেমিকাকে দূরে রেখে ভালোবাসাটিকে হৃদয়ে নিয়ে নেওয়া—

> তার চেয়ে ঈশ্বরের মতো দূরে রাখি তোমার ঈশ্বরী
> সব অভিসার আয়োজন প্রকম্প চেতনা ঘিরে
> ভয় হয় যদি কোনোদিন মনে হয় পর্যাপ্ত বিকেলে
> ভালোবাসি তোমারই ছায়া, বিম্বিত করে তা আমারই দর্পণে।
>
> (প্রতিবিম্ব)

প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব একটা অনুসন্ধান থাকে, থাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার আকুলতা। সেখানে যে সবসময় পৌঁছোনো যায় তাও নয়। পৌঁছোনোর আগ্রহটাই হল আসল কথা। আর চলার সঠিক পথটিকে খুঁজে পাওয়া দরকার। এই যে খোঁজা এবং আকুলতা এটাই বিষণ্ণতা ও ও যন্ত্রণার পর্বে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। তাই কবিকে এই সঞ্জীবনীয় অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতেই হয়—

> আমিও আকাশে তারাগুলো দেখি
> এবং সঞ্জীবনী খুঁজি।

বন্যার মতো অন্ধকার আমাকে ঘিরে আছে

কোথায় আশ্রয় পাবো এবং সঞ্জীবনী মুখ। ( বন্ধুরা সব চলে গেলে )

মানবহৃদয়ে সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দবেদনায় এক মিলিত ধ্বনি জন্ম নেয়। এই ধ্বনি যুগকাল অথবা ব্যক্তির সীমারেখাকে অতিক্রম করে চলে যায়। আর এর অনুরণন যার মনে একবারও হয়েছে সে সর্বদাই এর বৈচিত্র্যে এবং গভীরতায় মুগ্ধ। এই মুগ্ধতায় গান না গেয়ে কোন কবির উপায় নেই—

এই ধ্বনি কৈশোর যৌবন পার হয়ে

প্রকার প্রজন্ম নদীর মতন চিরকাল বয়ে যায়,

আশেপাশে চর তোলে, গেয়ে ওঠে শ্যামল বাতাস

অথবা বেসুরো হলে, তুফানে ঘূর্ণিঝড়ে

ভেসে যায় জেলেদের চাষাদের গ্রাম। ( এই ধ্বনি )

এই সব জায়গায় মেনে নিতেই হয় যে কবিতার ভাষা বিশ্বনাথ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু যে ভাষা তাঁর নিজেরই একটা আয়ত্ত তাকে তিনি কতটা মেনে নিয়েছেন সে প্রশ্নও থেকে যায়। কেন না থেকে থেকে তিনি কঠোর এবং তীক্ষ্ণ কাব্যভাষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তোলেন। অন্তত ভয় ত্রাসে কাতর মানুষগুলিকে ভালোবাসা বা হৃদয়ের ধ্বনির কথা না শুনিয়ে একটু অন্য ধরণের কথা শোনাতে তিনি চেয়েছিলেন, "এমন কথা তেমন কথা / শক্ত কাঠে মুগুর হোতো ( নজরুল )," গদ্যের কড়া হাতুড়ির কথা অবশ্য সুকান্ত আমাদের অনেকদিন আগেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এর প্রয়োজনীয়তা কখনো কখনো থেকে যায়। কিন্তু প্রয়োজন মিটে গেলে পড়ে থাকে বদ্ধ জলাশয়। এই জলাশয়ে আবদ্ধ থেকে সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন যে কবি, তাঁর প্রতি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা থেকেই যায়। মোহানায় আবদ্ধ থাকার জন্য তাঁর মনে বেদনা আছে, "অনেক খালবিল শেষে মোহনায় থমকে আছি", আর তারপরেই কাঠ থেকে চকিতে বেরিয়ে এসেছে পরম মুক্তির অভীপ্সা 'আমি কি কখনো সমুদ্রে যাবো না?' পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এই উত্তরণের পালার দেখা পাওয়া যাবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

অনন্ত কল্লোলের মুখে। বিশ্বনাথ কয়াল। পত্রলেখা। বার টাকা

## বাংলা আকাদেমি-র আলোচনা সভা
## একটি শতকের প্রেক্ষিতে বাংলা ও বাঙালী

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সপ্তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় শিশির মঞ্চ সভাগৃহে গত ২০ ও ২১ মে দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রারম্ভে সাম্প্রতিককালে প্রয়াত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, লীলা রায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নলিনী দাশ, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অজিতকৃষ্ণ বসু প্রমুখের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোক-প্রস্তাব পঠিত হয়। এরপরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সদস্য-সচিব সনৎ চট্টোপাধ্যায় আকাদেমির কাজকর্মের পরিধি-সংক্রান্ত একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়, আকাদেমি ইদানীং বাংলা বানান অভিধান, কিশোর অভিধান এবং বাংলা গ্রন্থের পঞ্জী প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং আকাদেমি পত্রিকা প্রকাশ এবং অন্যান্য গ্রন্থমালার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে কাজও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সদস্য-সচিব প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, সাহিত্য পরিষদ এবং বাংলা আকাদেমি পরস্পর পরিপূরক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন উদ্যোগে কর্তৃপক্ষ এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ঢাকার বাংলা আকাদেমি-র সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই কাজ করছে।

প্রথম দিনের মুখ্য বক্তা ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ অশোক মিত্র। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল: 'শতাব্দী ও সাহিত্য'। বক্তা সূচনায় বিষয়টির ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিষয়ে নিজের দখল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও তাঁর কথায় টানে খুলে যায় ভাবনা-প্রবাহের একটি বিশেষ অনালোচিত দিক।

ডঃ অশোক মিত্র বলেন যে, একটি নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আজ স্বভাব-উৎসাহী বাঙালী জাতি বিগত শতকের অভিভূত তর্পণে মগ্ন। ফেলে আসা দিনগুলির আলো-আঁধারে বাঙালীর আত্মানুসন্ধান যেন অক্লান্ত এক

পরিক্রমা। কিন্তু পনের শ' শতকে বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি কেমন চেহারা নেবে, তা নিয়ে এখনও কোনো তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধান চোখে পড়ছে না। এমনকি বর্তমান নিয়েও যে খুব ভাবনাচিন্তা আছে, তা-ও নয়। একে ইতিহাস-চেতনা না বলে, ইতিহাস-সর্বস্বতা বলাই উচিত। অথচ, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কবিতার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর একশ বছর পরের পাঠকের দরবারে।

আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, সহিত থেকে সাহিত্য। মানুষ সমাজের হাতে গড়া বলেই, ডঃ মিত্র বলেন, সাহিত্যেও সমাজেরই ছায়া। সমাজের মতোই সাহিত্য তাই কখনো গতিময়, কখনো স্থবিরতায় আচ্ছন্ন। পনের শ' বঙ্গাব্দের সাহিত্য নিয়ে এখনকার বাঙালীর আগ্রহ কম, কারণ সেদিনের সমাজ কেমন হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা কোনো প্রত্যয় আজ বাঙালীর সামনে নেই। যা চলছে, অশোক মিত্রের ভাষায় তা নেহাৎ-ই চর্বিতচর্বণ।

আসলে বাংলাভাষাই যদি ভারতবর্ষ নামক এই রাজনৈতিক বিস্তারে বেঁচে-বর্তে না থাকে তবে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় বড় চেতাবণী, ডঃ মিত্র মনে করেন, হাস্যকর। তিনি বলেন, প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হতে পারে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প। একসময় এই উপমহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা আজ হিন্দি চলচ্চিত্রের 'সর্বভারতীয়' 'দো-আঁশলা' চরিত্রের আক্রমণে বিপর্যস্ত। বেতার-দূরদর্শনের কথাও এই প্রসঙ্গে বাদ দেওয়া যাবে না। সাক্ষরতার হার যে-দেশে এত কম সেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ বেতার ও দূরদর্শনের প্রভাবের আওতার মধ্যে পড়ছে। লেখ্য ভাষার গুরুত্ব যাচ্ছে কমে। যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের কাছেও হালকা ইংরিজি ম্যাগাজিনের আকর্ষণ প্রভূত। আর এ সবের মধ্যে দিয়েই, ডঃ মিত্র বলেন, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নস্যাৎ করে গড়ে তোলা হচ্ছে স্টিম রোলারের চাপে দোআঁশলা মার্কিনী ধাঁচের সর্বভারতীয় সংস্কৃতি।

আসলে রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্য একসূত্রে বাঁধা। দেশের রাজনীতির রকমসকম একই থাকলে, অর্থাৎ উচ্চবিত্ত মানুষই সমাজের নিয়ামক হলে, এ অধঃপতন রোধ করা যাবে না। ভাষাতেও, সংস্কৃতিতেও।

অশোক মিত্র-র আলোচনায় স্বভাবতই বাংলাদেশের কথাও আসে। তিনি মনে করেন, প্রতিবেশী বাংলাদেশের হালচাল বেশ অন্যরকম। বাংলা-

ভাষা সেখানে স্বাজাত্যাভিমানের অংশ। ভাষা ও ভালোবাসা প্রায় হাত ধরাধরি করে সেখানে পথ চলে। তবে সদ্যস্বাধীন নদীতে ছাওয়া সেই দেশের নতুন পথের অভিজ্ঞতা তেমন গভীর এখনও হয়নি বলেই, তার সাহিত্যে স্রোতের তরলতা যতটা প্রবল অনুভব ও অভিজ্ঞতার কোন সুমহৎ প্রকাশ ততটা দৃশ্যমান নয়। তবে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আগামী একশ বছরে বাংলাদেশে বাংলা ভাষাচর্চায় বহু নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে।

ডঃ মিত্র অবশ্য একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, এপার বাংলায় যেসব মানুষ আজ সে কারণেই ওপার বাংলায় বাংলাভাষার প্রাধান্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, তাঁদেরও বোঝা উচিত—এই মনোভাব কোনো সফল সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন ভবিষ্যৎ গড়তে পারে না। আবার, এপার বাংলার নাক উঁচুদেরও ওপার বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সবল অকুণ্ঠিত প্রবাহকে প্রসারিত ঔদার্যের সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত।

এপারের হাল হকিকৎ নিয়ে শেষবিচারে ডঃ মিত্র এটুকুই মনে করেন যে, সমাজের শ্রেণীগত ভারসাম্যের কোনো বৈপ্লবিক বদল না হলে বাংলা সাহিত্যে সংকট অনিবার্য। কারণ, শোষিত নিম্নবর্গের মানুষ এই স্থবির সমাজে উচ্চবর্গের দোআঁশলা সংস্কৃতির প্রভাবকে এড়াতে না পেরে সেকেন্ডহ্যান্ড নকল করবে।

ডঃ মিত্র অবশ্য আশা রাখেন, যদি দিনবদল সত্যিই সম্ভব হয়, তবে সেদিন এতকালের শোষিত নিম্নবর্গের মানুষ তাদের সহজ ভাষায় অনুভব ও অভিজ্ঞতার গভীরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। সেই লোকায়ত-সংস্কৃতির গণঅভ্যুদয়ই আসলে ভবিষ্যতের নিদান। বাংলা ভাষাতেও। এবং সারা ভারতবর্ষেও। কিন্তু এই যে ক্রান্তির কথা, এতো বিশ্বাসের কথা। নচেৎ পূর্বোল্লিখিত অন্ধকারের দিকেই তো ফিরে যাওয়া। কিন্তু ডঃ মিত্র-র ভাষায়, যুক্তি-ও তো শেষ পর্যন্ত আবেগের সুতো ধরেই এগোয়। যদি আগামী একশ বছরে এপার বাংলার সহজিয়া সংস্কৃতি ওপার বাংলাকেও প্রভাবিত করে তবে বাংলা ভাষার নতুন জীবন লাভ ঘটবে। মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো যে পাপ! প্রথম দিনের অনুষ্ঠান এরপর শেষ হয় সুবিনয় রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ডঃ আহমদ শরীফ। সূচনায় ডঃ শরীফকে আহ্বান জানাতে গিয়ে ডঃ পবিত্র সরকার বলেন যে, এই প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষটি আজ ওপার বাংলার বুদ্ধিজীবীদের অভিভাবকের

স্থান নিয়েছেন। তিনি বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্য যেভাবে তন্ন তন্ন করে অনুশীলন করেছেন তা তুলনারহিত। ডঃ শরীফের জন্ম ১৯২১-এ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন ১৯৮৪ তে। তাঁর স্বরচিত বইয়ের সংখ্যা ২৭ এবং ৪০টি বই তিনি সম্পাদনা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফের সেদিনের বিষয় ছিল 'বাঙালীর জাতিস্বরূপ'। ডঃ শরীফ বলেন, মানুষ তার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সদা ব্যস্ত। কিন্তু সংকীর্ণ আত্মচেতনা তাকে আত্মরতীর করে। তার বুদ্ধি ও মনন সেক্ষেত্রে আবিষ্কারে সাধারণত অনগ্রসর। ফলত, অতীতের বহু অজ্ঞতা, বহু কুসংস্কারকেও তারা ঐতিহ্য আখ্যা দিতে চায়। প্রাচীনকালে ক্ষুধার অন্ন এবং যৌনবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষাই ছিল মুখ্য। বহু ক্ষেত্রেই এখনও এর রেশ বর্তমান। মানুষ এখনও জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো নানা ব্যবহারিক প্রয়োজনের ধান্দায় ঘোরে। তৃতীয় বিশ্বের যে-দেশগুলি আত্মআবিষ্কারের নামে অতীতমুখী মননে আবদ্ধ, আসলে তা একধরনের হীনমন্যতা থেকে জন্মায়। এর থেকে আসে মৌলবাদ। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বৈষয়িক জীবনে আধুনিকতা থাকলেও মানসিকভাবে তারা হাজার বছর পিছনের বাসিন্দা।

ডঃ শরীফ বলেন, ব্যক্তির পরিচয়-জিজ্ঞাসায় মূলত তিনটি প্রশ্ন সর্বাগ্রে আসে—কি নাম? কি করে? কোথায় থাকে? বলতে পারি যে, আমরা বঙ্গজ বাঙালী, আমাদের সংহতির বন্ধন হল বাংলাভাষা। একসময় এভাবে সংস্কৃত ভাষা এক করেছিল ভারতবর্ষকে, ল্যাটিন ভাষা করেছিল ইউরোপকে। কিন্তু আমরা এ-ও জানি যে, ডঃ শরীফ বিশ্লেষণ করেন, বাঙালী সংকর জাতি। তবু লেখ্য ভাষা গ্রহণ করে আমরা জাতিত্বে উন্নীত হয়েছি। কিন্তু বহু উপ-ভাষাই ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে অবোধ্য থাকত।

ডঃ শরীফ মনে করেন যে, এই উপমহাদেশের মানুষ বহু শাসকের অধীনে থাকলেও এক ধরনের সংহতি রক্ষা করে আসছে। মানুষ ছাঁচে তৈরি যন্ত্র নয়, সংযমে ও সহিষ্ণুতায় সয়ে যেতে হয়। ডঃ শরীফ মন্তব্য করেন, মানুষ প্রকৃতি-প্রবৃত্তির বলে অনেকে মনে করেন যে, তার ক্রোধ-ক্ষোভ বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ জীবন-জীবিকার সন্ধানেই ব্যস্ত থাকে। শাস্ত্র বিষয়ে তাদের জ্ঞান খণ্ডিত। এই মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়। এ-বিচার আপেক্ষিক, বদলায়। কারণ এসবেও মানুষ পরনির্ভরশীল, সমাজ-জীবনে দুঃখে-সুখে লাভে-লোকসানে বাঁচে। তার জিগিষা বাধাপ্রাপ্ত হলেই

মানুষ দিশাহারা হয়—ইতিহাসে পররাজ্যলোভী রাজারাই তার উদাহরণ। এটা চলেই আসছে। এরাই আধুনিককালে দাঙ্গা বাধায়, পারমাণবিক যুদ্ধ ঘটায়। তবু এর মধ্যেই সাধারণ মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য মেনে সহাবস্থান করেছে।

ডঃ শরীফ মনে করেন, বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব—এই বোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজ এদের সংকট মানবজাতিকে সংকটে ফেলেছে। মহৎ বাক্য আড্ডায়-সভায়-লেখায় উচ্চারিত হলেও জীবনে এর প্রয়োগ সীমিত। অন্যদিকে ঘরের বেড়া ভেঙে পৃথিবী ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে—হাটবাজার, প্রযুক্তি আজ যেন প্রায় আন্তর্জাতিক। কালের দাবিতে সাড়া দেওয়া তাই এখন সহজ।

ডঃ শরীফের মতে, সমকালের দাবিকে গুরুত্ব না দেওয়া অবক্ষয় আর, জীর্ণতার লক্ষণ। আমাদের বহু উপভাষা, শাস্ত্রও বিভিন্ন, রক্তে নেই অবিমিশ্রতার টান, রাষ্ট্রও দুটি—তবু আমরা বাংলা ভাষার কারণে অভিন্নতার প্রয়াসী। যেটুকু প্রভেদ রয়ে গেছে তা কালের যাত্রায় একদিন বাতিল হয়ে যাবে।

এটা ঠিক, কারুর একক চেষ্টায় পৃথিবী বদলায় না। এরই মধ্যে বাংলা ভাষার লেখ্যরূপ অক্ষুণ্ণ এবং অভিন্ন রেখে আমাদের এগোতে হবে বলে ডঃ শরীফ জোর দেন। বৈজ্ঞানিক সত্যে আস্থা রেখে, সমকালের দাবিকে মেনে এগোনই এখন আমাদের দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন।

দু-দিনই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায় আমন্ত্রিত বক্তাদের বক্তব্যের উপরে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের শেষপর্বে দুটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়—একটি সনৎ দাশগুপ্তের 'জীবনানন্দ', অন্যটি সত্যজিৎ রায়ের 'সুকুমার রায়'।

অজেয়া সরকার

## মুদ্রণ-প্রমাদ প্রসঙ্গে

আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, 'পরিচয়'-এর মতো ঐতিহ্যশালী পত্রিকায় ক্রমবর্ধমান মুদ্রণ-প্রমাদ আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ-সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলী সজাগ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক কারণেই যোগ্যতর প্রুফ-রীডার-এর সহায়তা যেমন গ্রহণ করতে পারছে না, তেমনি ঐ একই কারণে ছোটখাটো সেটায় প্রেস ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্বশীল বড় প্রেসে পত্রিকা-ছাপতে দিতেও সাহসী হচ্ছে না। ফলে, ভ্রম-সংশোধনেরও ভ্রম সংশোধন করা কোনো কোনো সময় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা জানি, আমাদের লেখক ও পাঠকেরা আমাদের এইসব ত্রুটির প্রতি যথেষ্ট ক্ষমাপ্রবণ এবং ধৈর্যশীল। তবু সম্পাদকমণ্ডলী বিনীতভাবেই তাঁদের দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করছে এবং ভবিষ্যতে এ-সম্পর্কে সজাগ থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সংখ্যায় নিম্নলিখিত মুদ্রণ-প্রমাদগুলিকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করার জন্য পাঠকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে :

| পৃষ্ঠা ও পংক্তি | আছে | হবে |
|---|---|---|
| পৃ. ৫৫, পং ২৩ | দেহপঠ | দেহপট |
| পৃ. ঐ, পং ২৫ | কবলে | ফলে |
| পৃ. ৫৬, পং ২ | এতটা | একটা |
| পৃ. ঐ, পং ১৫ | মোটামুঠি | মোটামুটি |
| পৃ. ঐ, পং ২৩ | সংগ্রহ শালায় | সংগ্রহশালায় |
| পৃ. ঐ, পং ২৪ | Bengalec | Bengalee |
| পৃ. ঐ, পং ২৬ | দিতে | দিয়ে |
| পৃ. ঐ, পং ২৯ | আমায় | মাথায় |
| পৃ. ৫৭, পং ১৩ | সত্তি | সত্তি |
| পৃ. ঐ, পং ২০ | আয়োবায় | অয়োয়ায় |
| পৃ. ৫৮, পং ১২ | সেখামে | সেখানে |
| পৃ. ৫৯, পং ৬ | এতটি | একটি |
| পৃ. ঐ, পং ১২ | তাত্বিকদের | তাত্ত্বিকদের |
| পৃ. ঐ, পং ২৬ | দুর্বত্লাগুলির | দুর্বলতাগুলির |
| পৃ. ৬০, পং ১৫ | স্পষ্ট | স্পষ্ট |

| পৃষ্ঠা ও পংক্তি | আছে | হবে |
| --- | --- | --- |
| পৃ. ৬০, পং ১৬ | শব্দানুষঙ্গ | শব্দানুষঙ্গ |
| পৃ. ঐ, পং ২৮ | পূর্ববঙ্গীয় | পূর্ববঙ্গীয় |
| পৃ. ঐ, পং ৩০ | অন্তঃসত্বা | অন্তঃসত্বা |
| পৃ. ৬১ পং ১৫ | অতুল | প্রতুল |
| পৃ. ঐ, পং ১৬ | আছে তিনি, | আছে, তিনি |
| পৃ. ঐ, পং ২০ | খ্রিষ্টীয় | খ্রিষ্টীয় |
| পৃ ঐ, পং ২৫ | সহভাবে | সহকারে |
| পৃ. ৬২, পং ৯ | বঙ্গভাবা | বঙ্গভাষা |
| পৃ. ঐ, পং ২৫ | আর্থ-সামাজিক | আর্থ-সামাজিক |
| পৃ. ৬৩, পং ১ | কথা ভেবে | কথা ভেবে |
| পৃ. ঐ, পং ৭ | মুখছবি | মুখচ্ছবি |
| পৃ. ঐ, পং ৮ | তাত্বিক | তাত্ত্বিক |
| পৃ. ঐ, পং ১০ | করার | করা |
| পৃ. ৬৪, পং ২০ | এমন | এখন |
| পৃ. ৬৫, পং ৬ | কাছে | কাজে |
| পৃ. ঐ, পং ২৮ | আশাব্যঞ্জক | আশাব্যঞ্জক |
| পৃ. ৬৭, পং ৬ | যে যুগের | সে যুগের |
| পৃ. ৬৯, পং ৪ | উচ্চশিলায় | উচ্চশিক্ষায় |
| পৃ. ঐ, পং ১০ | মনে | হলে |
| পৃ. ঐ, পং ২৩ | লেনিনপ্রাদ | লেনিনগ্রাদ |
| পৃ. ৭০, পং ২১ | ১৮৫৬ | ১৯৫৬ |
| পৃ. ঐ, পং ২৭ | যেদিন | সেদিন |
| পৃ. ৭১, পং ৬ | পৃষ্ঠায়, গোষ্টির | পৃষ্ঠায়, গোষ্ঠীর |
| পৃ. ৭২, পং ৯ | সাংবাদিকদেরে | সাংবাদিকদের |

এই সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি মাত্র প্রবন্ধ থেকেই আমরা যে-ভুলগুলি সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন তাই-ই শুধু সংশোধন করে দিলাম। অন্যান্য বানান ভুল পাঠকেরা সহজেই সংশোধিত আকারে গ্রহণ করতে পারবেন বলে আমরা আশা করছি।

—সম্পাদকমণ্ডলী

## ভ্রম সংশোধন

১৯৯২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যাটি ভ্রমক্রমে ১—৩ সংখ্যারূপে ছাপা হয়েছে। পরিচয়-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা হবে ৪—৫ সংখ্যা। জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত সংশোধনীটিতেও ভুল থেকে গিয়েছে। এই মুদ্রণ-প্রমাদে আমরা দুঃখিত।

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
পরিচয়

PARICHAYA APRIL—JULY 1993 Reg. No. 13732
WB/EC—265

"মে দিবস

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার

পবিত্র দিবস"
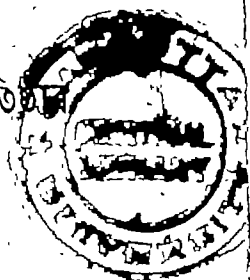
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—১৯৪৫

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : বার টাকা